মাওলানা মওদূদীর

যুগজিজ্ঞাসার জবাব

২য় খন্ড

মাওলানা মওদূদীর যুগ জিজ্ঞাসার জবাব

২য় খন্ড

অনুবাদ

আবদুস শহীদ নাসিম
মুহাম্মদ ওয়ারেসুল হক
মুনিরউদ্দীন আহমদ
মুহাম্মদ ওবায়দুল হক

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা-চট্টগ্রাম-খুলনা

প্রকাশনায়
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০
ফোন-২৫ ১৭ ৩১

আঃ প্রঃ ২০৯

প্রথম সংস্করণ

জিলহজ্জ	১৪১৫
জ্যৈষ্ঠ	১৪০২
মে	১৯৯৫

বিনিময় ঃ ৯০ .০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

استفسارات -এর বাংলা অনুবাদ

MAULANA MAUDOODIR JUG JIGGASAR JABAB. Published by Adhunik Prokashani. 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

গ্রন্থটি সম্পর্কে দু'টি জরুরী কথা

গ্রন্থটি সম্পর্কে ক'টি কথা বলে নেয়া জরুরী মনে করছি। মাওলানা মওদূদী এবং তাঁর চিন্তাধারাকে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। তাঁর গ্রন্থাবলী বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে জাতিসমূহের নিকট পৌঁছেছে এবং সেগুলো তাদের মধ্যে মানসিক ও সামাজিক বিপ্লব সৃষ্টি করছে। তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতাসমূহ এমনকি তাঁর লিখিত চিঠিপত্র পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়ে দেশে দেশে পৌঁছেছে। তাঁর সংগীসাথীরা অডিও ক্যাসেট এবং পত্রপত্রিকা থেকেও তাঁর বাণী বক্তব্যসমূহ সংগ্রহ করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করছেন। যতোই দিন যাচ্ছে, ততোই বিশ্বের মুসলমানদের নিকট তাঁর অবদান বড় হয়ে ধরা পড়ছে। তাঁর প্রতিটি বাণী ও বক্তব্যই যে কুরআন সুন্নাহ থেকে নিংড়ানো নির্যাস এবং সেগুলো যে মুসলমানদের ব্যক্তি ও সমাজ গঠনে আর আল্লাহর কালেমাকে বিজয়ী করার কাজে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা আজ সূর্যালোকের মতোই সুস্পষ্ট।

তাঁর চিন্তাধারা যেনো একটি সুগ্রথিত কড়ির মালা, আর বর্তমান গ্রন্থটি সে মালারই একটি কড়ি। এটি তাঁর নিজ হাতে লেখা কোনো গ্রন্থ নয়। বরঞ্চ বিভিন্ন সময় প্রদত্ত দারসে কুরআন, দারসে হাদীস এবং বক্তৃতা ও বক্তব্যের পর উপস্থিত শ্রোতাদের পক্ষ থেকে তাঁকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং সেসব প্রশ্নের তিনি যে জবাব প্রদান করেছিলেন, সেসব প্রশ্নোত্তরেরই সংকলন। পত্রিকার রিপোর্টারগণ তাদের কলম এবং টেপরেকর্ডারের সাহায্যে এগুলোকে ধরে রাখতেন এবং পত্রিকায় প্রকাশ করতেন। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক দু'টি সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনের বিশেষ কলামে এ প্রশ্নোত্তরগুলো প্রকাশিত হতো। এর একটি হলো সাপ্তাহিক 'এশিয়া' এবং অপরটি 'আইন'।

মধুমাছি যেমন ফুল থেকে মধু আহরণ করে, তেমনি পত্রিকার পাতায় পাতায় চোখ বসিয়ে বসিয়ে এই অনুপম প্রশ্নোত্তরগুলো সংগ্রহ করেছেন জনাব আখতার হিজাযী। এই বিরাট কাজটি যে তাঁকে অত্যন্ত খাঁটুনি খেটে এবং ধৈর্যসহকারে করতে হয়েছে, তা আর বলারই অপেক্ষা রাখে না। প্রশ্নোত্তরগুলো সংগৃহীত হবার পর মাওলানার দীর্ঘদিনের সাথী মরহুম ডঃ আসআদ গিলানী অত্যন্ত যত্নসহকারে সেগুলো পর্যালোচনা ও সম্পাদনা করে দেন। তারপরও এতোটুকু কথা থেকেই যায় যে, এগুলো সরাসরি মাওলানার নিজের হাতে লিপিবদ্ধ হয়নি এবং তাঁর

জীবদ্দশায় সংকলিত হয়নি। তবে গ্রন্থে মাওলানার মুখনিসৃত ভাষা হুবহু রক্ষিত না হলেও এতে তাঁর বক্তব্য বিষয় পাঠকদের সামনে এসেছে। আর এখন যেহেতু গ্রন্থটির অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, তখন একথাতো সকলের কাছেই পরিষ্কার যে, অনুবাদে গ্রন্থকারের বক্তব্যই প্রকাশ পায়, ভাষা নয়।

সর্বশেষে বলতে চাই, এ গ্রন্থে পাঠকগণ এমন অনেক প্রশ্নের সহজ সুন্দর ও বাস্তব ধর্মী জবাব পেয়ে যাবেন যেসব প্রশ্নের জবাব অনেক বড় বড় গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেও বের করা কষ্টকর হতো। মাওলানা মওদূদীর বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, প্রশ্নকর্তারা তাঁর নিকট থেকে যে কোনো প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব পেয়ে যেতেন। তাঁর জবাবে তাঁদের মন নিশ্চিন্ত হতো।

ইতোপূর্বে গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এবার এর দ্বিতীয় খণ্ড পাঠকগণের সামনে হাযির করতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি।

আমরা আশা করি এ গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকগণ সহজ সুন্দরভাবে ইসলামের যুগোপযোগিতা এবং বাস্তবধর্মীতা বুঝতে সক্ষম হবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবার তৌফিক দিন। আমীন

আবদুস শহীদ নাসিম

২০ অক্টোবর ১৯৯৩

সূচীপত্র

দাওয়াত ও আন্দোলন
সংক্রান্ত বৈঠকাদি

আমার দ্বীনী ভায়েরা আমার কথা শুনবে কি শুনবে না, সে পরোয়া আমি করি না। আমি কিন্তু তাদের বলেই যাবো : প্রকৃত মুসলমান হোন এবং মুসলমান হবার কারণে আপনাদের উপর যেসব দায়িত্ব কর্তব্য বর্তায়, সেগুলো যথাযথ পালন করুন, এছাড়া অন্যকিছুতেই আপনাদের কোনো কল্যাণ নেই।

১. রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রসংগ

ধর্মীয় রাষ্ট্র

প্রশ্ন ঃ ধর্মীয় রাষ্ট্র সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তর ঃ এটা অত্যন্ত পরিষ্কার, যখন একজন মুসলমান 'ধর্ম' শব্দটি উচ্চারণ করে, তখন তার মনে এর অর্থ 'ইসলাম'ই হয়ে থাকে। আমি যখন বলি, আমাদের দেশ একটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হওয়া উচিত, তখন এর দ্বারা আমি বুঝিয়ে থাকি, এটি একটি ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া উচিত। অর্থাৎ, এমন একটি রাষ্ট্র, যার নৈতিক চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সমাজ, পারস্পরিক সম্পর্ক, আইন-বিধান, রাজনীতি এবং অর্থনীতি ঐসব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, যা ইসলাম আমাদের প্রদান করেছে।

শ্রেণী সংঘাত অনৈসলামী প্রভাবের ফল

প্রশ্ন ঃ আপনি ধর্মীয় রাষ্ট্রের যে ধারণা দিলেন, তা থেকে বুঝা গেল, সেই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব থাকবে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের একটি বিশেষ শ্রেণীর হাতে। তাদের কাজ হবে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত ইসলামের বিষয়সমূহকে গবেষণা ও বিশ্লেষণ করে রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানসমূহ প্রণয়ন করা এবং শরয়ী বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রতিটি রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করা। এখন প্রশ্ন হলো, ঐ বিশেষ লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে কারা? আপনি তো জানেন, অর্থনৈতিক দিক থেকে আমাদের সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রত্যেক শ্রেণীই স্বীয় উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ধর্মীয় বৈধতা অন্বেষণ এবং ধর্মীয় শ্লোগান ব্যবহারের চেষ্টা করছে। ধর্মীয় বিশেষজ্ঞগণ এই শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে মুক্ত ও সম্পর্কহীন থাকতে পারে না। তাদের দায়িত্ব হলো, হয় তারা জনগণের সমর্থনকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করবে, কিংবা নিজেদের পুঁজিপতি ও জমিদারদের সাথে সম্পর্কিত করে নেবে। এমতাবস্থায় কুরআনী মূলনীতিসমূহের যে ব্যাখ্যাই পেশ করা হবে, তা হবে তাদের রাজনৈতিক মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ। বিভিন্ন রাজনৈতিক ধ্যানধারণার অধিকারী মুফাস্সিরদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারসমূহে চরম ধরনের মতভেদ সৃষ্টি হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক সংঘাত একটি সীমাহীন ফিকহী

বাহাছের রূপ ধারণ করবে এবং যেসব বিষয়ে উপযুক্ত সমাধান খুঁজে বের করা এ সময়ে সবচাইতে বেশী জরুরী, সেগুলোর কোনো সুরাহাই হবে না।

উত্তর : আপনি যে শ্রেণী সংঘাতের প্রতি ইংগিত করেছেন, প্রকৃতপক্ষে তা সৃষ্টিই হয়েছে এই জন্য যে, দীর্ঘদিন ধরে অনৈসলামিক পরিবেশের অধীনে থাকতে থাকতে আমাদের সমাজ সেই নৈতিক প্রাণসত্তা এবং সুবিচারের আদর্শ থেকে বঞ্চিত হয়ে আছে, যা ইসলাম আমাদেরকে প্রদান করেছে। যে বস্তুপূজা বিশ্বের অন্যান্য সমাজকে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করেছে এবং তাদের মধ্যে স্বার্থগত দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সৃষ্টি করেছে, সেটাই দুর্ভাগ্যবশত আমাদের সমাজকে ছিন্নভিন্ন করার এবং পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মুখে ঠেলে দেবার হুমকি প্রদান করছে। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে আমরা উপদলীয় কোন্দলের ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করেছি। সে আঘাতের ক্ষত এখনো শুকায়নি। এখন আমরা এজন্য প্রস্তুত নই যে, আমরা নিজেদেরকে সেই সামাজিক দর্শনের হাতে ন্যস্ত করে দেবো, যা আমাদের মধ্যে আরেকটি শ্রেণীযুদ্ধ সংঘটিত করবে এবং আমাদেরকে ততোক্ষণ পর্যন্ত কোন নিরাপত্তার পরিবেশ অবলোকন করতে দেবে না, যতোক্ষণ না আমাদের একটি শ্রেণী অন্যান্য শ্রেণীকে নির্মূল করে দেবে। অন্যান্য জাতি এই সামাজিক দর্শনকে সম্ভবত এই উদ্দেশ্যে গ্রহণ করেছে, যেহেতু তাদের নিকট সেই নৈতিক ও সুবিচারপূর্ণ আদর্শ ও মূলনীতি বর্তমান ছিল না, যা শ্রেণী স্বার্থের বিকাশকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদেরকে একটি সুবিচারপূর্ণ ভ্রাতৃত্ববন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আমরা এমন একটি জীবন ব্যবস্থার অধিকারী, যা আমাদেরকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে। প্রয়োজন শুধু নিজেদের মধ্য থেকে ঐ সমস্ত লোকদেরকে সামনে এগিয়ে দেয়া, যারা ইসলামের সঠিক প্রাণসত্তার জ্ঞান রাখে এবং শ্রেণীবিদ্বেষ থেকে মুক্ত থেকে ইসলামের নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা প্রদান করে। অতপর এই সমস্ত লোক সর্বসম্মতভাবে কিংবা অধিকাংশ ব্যক্তি একমত হয়ে আমাদের সামনে যে ব্যাখ্যাই উপস্থাপন করবে, আমরা সবাই তা মেনে নেবো এবং আমাদের মধ্যকার দ্বিতীয় কোন শ্রেণী নিজেদের মনমত ব্যাখ্যা গ্রহণের জন্যে বাড়াবাড়ি করবো না। গোটা জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে এই ধরনের লোকদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে, বিশেষ কোন শ্রেণী বা কতিপয় শ্রেণীকে নয়। আমাদেরকে তাদের নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র এই মানদন্ডের প্রতিই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তারা নির্ভরযোগ্য চরিত্রের অধিকারী এবং ইসলামের যথার্থ ব্যাখ্যাদানের যোগ্য কিনা?

দীনী ও বৈষয়িক জ্ঞানের অধিকারীরাই নেতৃত্বের যোগ্য

প্রশ্ন : আমার তুচ্ছজ্ঞানে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিন্যাস ও সম্পাদনার কাজ শুধুমাত্র আন্তরিকতা আর বিশ্বস্ততা দিয়ে হতে পারে না। এখন আমাদের সামনে অনেক জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা রয়েছে। এগুলো সম্পর্কে অত্যন্ত বিচক্ষণ এবং গভীর চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন রয়েছে। যেমন, উৎপাদন মাধ্যমগুলোকে জাতীয় মালিকানায় রাখা হবে, নাকি ব্যক্তি মালিকানায়? রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি দলই যথেষ্ট, না গণতন্ত্রের জন্যে একাধিক দল থাকা প্রয়োজন? শ্রমিকদের হরতাল করার অধিকার থাকবে, না থাকবে না? এ রকম আরো অনেক প্রশ্ন। আপনি এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের দায়িত্ব ধর্মীয় নেতাদের উপর ছেড়ে দিন, দেখবেন তারা কোন সিদ্ধান্তকারী সমাধানে পৌছুতে সক্ষম হবে না। কারণ রাষ্ট্রগঠন ও পরিচালনায় ফকীহ সুলভ বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান এবং ধর্মীয় কিতাবের মন্থনের পরিবর্তে প্রয়োজন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহাসিক চেতনাবোধের। এ প্রসংগে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের তুলনায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞরাই আমাদের অধিকতর সুন্দরভাবে পথ দেখাতে পারে।

উত্তর : আপনি যখন 'দীনী' শব্দটি ব্যবহার করেন, তখন সম্ভবত 'দুনিয়াবী কাজকে' তা থেকে পৃথক করে দেন। এজন্য আপনার মনে বাস্তবেও এ সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে যে, যদি আমরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি সমাধানের দায়িত্ব ধর্মীয় নেতাদের উপর ন্যস্ত করি, যারা বস্তুগত বিদ্যায় একেবারেই অজ্ঞ, তাহলে আমাদের সমস্যার কোনই সমাধান হবে না। কিন্তু আপনি একটু এই দিকটির প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। আমরা যদি আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদির দায়িত্ব সেইসব বৈষয়িক বিশেষজ্ঞদের উপর ছেড়ে দেই, যারা পাশ্চাত্য দৃষ্টিভংগি ও কার্যধারা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে বটে, অথচ ইসলামী শিক্ষার সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে আমরা কোথায় গিয়ে পৌছুবো? আপনি বলেছেন, তারা ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের তুলনায় আমাদেরকে অনেক ভালোভাবে পথপ্রদর্শন করতে সক্ষম হবে। কিন্তু আমার আশংকা হয়, তাদের পথ প্রদর্শন আমাদেরকে এমন এক গন্তব্যে নিয়ে পৌছে দেবে, পৃথিবীর বড় বড় জাতি বর্তমানে যেখানে গিয়ে পৌছেছে। অর্থাৎ নিজেদের দেশেই স্বার্থান্বেষী শ্রেণীসমূহের মধ্যে সংঘাত এবং দেশের বাইরে আন্তর্জাতিক স্বার্থবাদীদের দ্বন্দ্ব। তার চেয়ে এটা উত্তম নয় কি যে, আমরা আমাদের জাতির মধ্য থেকেই এমন লোকদের অন্বেষণ করবো, যারা দীন এবং দুনিয়া উভয় বিষয়ে পারদর্শী।

যাদের দৃষ্টি সমভাবে কুরআন-হাদীস এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদির প্রতি নিবদ্ধ। যারা ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে আমাদের সমস্যাবলীর এমন সমাধান পেশ করবে, যা আমাদের জাতীয় জীবনকে সারা বিশ্বের জন্য অনুকরণীয় আদর্শে পরিণত করবে?

বিকৃতি রোধের উপায় ঃ ইসলামী চেতনা জাগ্রত করা

প্রশ্ন ঃ আমার মতে, বর্তমানে আমাদের দেশকে ইসলামী শরীয়া অনুযায়ী গঠন করতে এবং বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে ইসলামের বিধি-বিধান চালু করতে একটি সমস্যা আছে। অনেক সময় ধর্মীয় বিধি-বিধানের মূল উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে কেবল বাহ্যিক ও শাব্দিক দিকটাই দেখা হয়। এভাবে লক্ষ্য ও লক্ষ্য অর্জনের উপায়ের মধ্যে গরমিল সৃষ্টি হয়ে যায়। একটা আরেকটার স্থান দখল করে নেয়। যেমন, সূদের কথাই ধরুন। সূদকে অবৈধ ঘোষণা করার উদ্দেশ্যইতো ছিলো অর্থনৈতিক দখলদারী বন্ধ করা। একইভাবে ইজারা অধিক লাভের উদ্দেশ্যে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য গুদামজাত করে রাখা এবং কালো বাজারীর বিরোধিতা করা হয়েছে। কিন্তু বৈধ ব্যবসা বাণিজ্য চালু রাখা হয়েছে। কারণ সে যুগে তো পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ছিলো শিশু বয়েসের। তাছাড়া তখন পুঁজির মতো শিল্প যুলুমের হাতিয়ারও ছিল না।

বর্তমান কালের অবস্থা সে রকম নয়। এখন অবস্থায় অনেক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এখন বহির্বাণিজ্যের অর্থই হলো সম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে অপরাপর জাতিকে অধীনতা পাশে আবদ্ধ করা। এখন বৈধ-অবৈধ ব্যবসায়ের পার্থক্য মুছে গেছে। অথচ আমাদের আলিমরা যখন ফতোয়া দেন, তারা একথা ভুলে যান যে, আজকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মহাজনী সূদের কোন গুরুত্ব নেই। দারিদ্র্য আর দুরাবস্থা সেই জিনিসেরই ফসল, যাকে তারা জায়েয বলে ফতোয়া দেন। অর্থাৎ শিল্প পুঁজি এবং ব্যাংকিং।

উত্তর ঃ আপনি যে বিকৃতির উল্লেখ করলেন, তা এমন সব স্থানেই সৃষ্টি হয়, যেখানে আইনের লক্ষ্য ও প্রাণসত্তা ত্যাগ করে কেবল তার শাব্দিক ও বাহ্যিক দিক দেখা হয়। কোথাও বিকৃতি সৃষ্টি হয় জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির অভাবে। আবার কোথাও সৃষ্টি হয় লোকেরা নিজেদের স্বার্থে আইনের উদ্দেশ্যের সাথে বিদ্রোহ করার কারণে।

আমরা কেবল তখনই এ বিকৃতি থেকে বাঁচতে পারবো, যখন মুসলিম জনগণের মধ্যে ইসলামের প্রকৃত অনুভূতি জাগ্রত হবে। এমনটি যখন সৃষ্টি হবে, তখন তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্য থেকে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যার জন্যে এমন লোকদের খুঁজে বের করবে, যারা কুরআন-সুন্নাহ্‌র কেবল শাব্দিক অর্থই জানে না, বরঞ্চ কথার উদ্দেশ্য এবং মর্মবাণীও উপলব্ধি করে।

ইসলামী নীতিমালার ক্ষেত্রে ঐক্যের পন্থা

প্রশ্ন : শরীয়তের ব্যাখ্যাভাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্যের বাইরে নিছক যেসব ধর্মীয় মতপার্থক্য রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে আপনার মত কি? ভবিষ্যতে ইসলামের আলোকে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে এসব মতভেদ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবেনা কি? এ ব্যাপারে আপনার দৃষ্টিভঙ্গী জানতে চাই।

উত্তর : এসব মতপার্থক্য অন্যান্য মতপার্থক্যের চাইতে ভিন্নতর নয়। অন্যান্য যাবতীয় মতপার্থক্যের সমাধান আমরা যেভাবে করে থাকি, এগুলোরও সেইভাবেই সমাধান করা যাবে। এমন কোন মানব সমাজ নেই, যেখানে জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পাওয়া যায় না। কিন্তু এসব মতপার্থক্য কোথাও জীবন চলার গাড়ীকে অচল করে দেবার মতো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় না।

মতপার্থক্য নিরসনের গণতান্ত্রিক পন্থা হলো, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা অধিকাংশ লোকের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতের ভিত্তিতেই পরিচালিত করতে হবে। সংখ্যালঘু দলসমূহের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতকে কেবল ততোটুকুই বিবেচনা করা যাবে, যতোটুকু অবকাশ থাকবে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিতে। তাছাড়া সংখ্যালঘু হিসেবে তাদের অধিকারসমূহের সুবিচারপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। কিন্তু এর চাইতে বিস্ময়কর কথা আর কি হতে পারে যে, ইসলামী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে মতভেদ থাকার কারণে আমরা সবাই অনৈসলামী ব্যবস্থার ব্যাপারে একমত হয়ে যাবো?

ইসলামী রাষ্ট্র হলে অমুসলিমদের কি হবে?

প্রশ্ন : আমাদের দেশে মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ মতপার্থক্য ছাড়াও অমুসলিম সংখ্যালঘুদের বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখার দাবী রাখে। তারা

মুসলমানদের ধর্মীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা মেনে নেবে এবং তার আনুগত্য করবে বলে আপনি কি তাদের রাজী করাতে পারবেন?

উত্তর ঃ এই সমস্যাটির সমাধানও ঠিক অনুরূপ, যা মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ মতভেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। গণতান্ত্রিক পন্থায় একটি দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সেই আদর্শের ভিত্তিতেই প্রণীত ও পরিচালিত হয়, যা অধিকাংশ জনগণের দৃষ্টিতে সঠিক। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অবশ্যি তাদের দৃষ্টিভঙ্গী বিবেচনা করার দাবী করতে পারে। তাদের নাগরিক অধিকার এবং পারিবারিক আইন সংরক্ষণের দাবী করতে পারে। কিন্তু সুবিচারের দৃষ্টিতে তারা এই দাবী করতে পারে না যে, সংখ্যাগুরু জনগণ তাদের খাতিরে নিজেদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করুক। আমাদের দেশের জনগণ গভীর আস্থার সাথে একথা বিশ্বাস করে যে, ইসলামী আদর্শের অনুসরণের মধ্যেই তাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। সুতরাং এই বিশ্বাসের আলোকে নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়বার অধিকার তাদের রয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিজেদের নিরাপত্তার দাবী তাদের কাছে করতে পারে। কিন্তু মুসলমানদেরকে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদের মধ্যে নিজেদের কল্যাণ সন্ধান করার কথা বলার অধিকার তাদের নেই।

বাকী থাকে আনুগত্যের প্রশ্ন। প্রকৃতপক্ষে আনুগত্যের বিষয়টি রাষ্ট্রের ধর্মীয় কিংবা ধর্মহীন হবার সাথে জড়িত নয়। বরঞ্চ তা নির্ভর করে সংখ্যালঘুদের সাথে সংখ্যাগুরু ও ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী সুবিচার, সৌজন্য এবং উদারতা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে কি রকম আচরণ করে, তার উপর। আপনি কপটতা ও বাহ্যাড়ম্বর করে যদি আপনার ধর্ম এবং আদর্শও ত্যাগ করে তাদের বলেন যে, দেখো, তোমাদের খাতিরে আমরা আমাদের ধর্ম–আদর্শ সবকিছু ত্যাগ করে আমাদের দেশকে একটি ধর্মহীন রাষ্ট্র বানিয়েছি, তাতেও কিন্তু তারা সন্তুষ্ট হবে না। তারা তো দেখবে আপনি তাদের সাথে কতোটা সুবিচার করছেন? আপনি তাদের ব্যাপারে বিদ্বেষ এবং দমননীতি অবলম্বন করছেন,না সহিষ্ণুতা, উদারতা ও বদান্যতা অবলম্বন করছেন? মূলত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় আপনাদের আনুগত্য করবে, না আপনাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে, তার ফায়সালা নির্ভর করবে এই পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের উপর।

ইসলামী রাষ্ট্র কেন?

প্রশ্ন ঃ আমার মতে, কোন দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সে দেশের নাগরিকদের প্রথা–প্রচলন, স্বভাব–চরিত্র, নীতি–নৈতিকতা এবং ধ্যান–

ধারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা স্বয়ং কোন দর্শন বা ধর্মের অধিকারী হয় না। যদি এমনটি করার চেষ্টা করা হয়, তবে তা হবে ক্ষণস্থায়ী এবং কৃত্রিম প্রচেষ্টা। আমরা ততোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করতে পারি না, যতোক্ষণ না আমাদের আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামের ঐতিহ্য পূর্ণভাবে চালু করতে পারি। আমার মনে হয়, আমাদের জাতির ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে এখনো অনেক সময় লাগবে। তাই এখনই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাটা গাড়ীর আগে ঘোড়া জুড়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু নয়।

উত্তর : কোন দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা সে দেশের জনগণের প্রথা-প্রচলন, স্বভাব-চরিত্র, নীতি-নৈতিকতা এবং ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়, আপনার একথা সম্পূর্ণ সঠিক। এখন আমাদের দেশের জনগণ যদি ইসলামকে প্রবলভাবে ভালবেসে থাকে এবং ইসলামের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে, তবে তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী কেন এখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না? আপনার একথাও সঠিক যে, আমরা যদি এখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই; তবে জনগণের মধ্যে ইসলামের চেতনা, মানসিকতা এবং চরিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু এ প্রচেষ্টা থেকে আপনি ইসলামী রাষ্ট্রকে ব্যতিক্রম করলেন কোন্ কারণে, তা আমি বুঝতে পারলাম না? জনগণের মধ্যে এগুলো সৃষ্টি করার জন্যে যেমন চেষ্টা করে যেতে হবে, তেমনি সাথে সাথে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার মাধ্যমেই ঐসব বৈশিষ্ট্যের পরিপূর্ণতা সাধিত হতে পারে।*

[সাপ্তাহিক এশিয়া, ১৬ জানুয়ারি : ১৯৭১]

---

* ১৯৪৮ সালের মে মাসে রেডিও পাকিস্তান থেকে প্রচারিত বিতর্কিকা। এতে প্রশ্নকর্তা ছিলেন রেডিও'র কর্মকর্তা জনাব ওয়াজীহুদ্দীন আর জবাবদাতা ছিলেন মাওলানা মওদূদী। এতে যেসব প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে তা বর্তমান পরিস্থিতিতেও গুরুত্বপূর্ণ।

২. ইসলামের জন্যই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা

সহকর্মীদের প্রশ্নের আগে মাওলানা তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বক্তব্য রাখেন।

প্রিয় সাথী ও বন্ধুগণ!

আপনারা জানেন যে, অসুস্থতার কারণে আমি অবসর গ্রহণে বাধ্য হয়েছি। জামায়াতে ইসলামী ১৯৪১ সালের ২৫ আগষ্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এখন ১৯৬৮ সালের ২৫ আগষ্টের রাত। পুরো সাতাশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে এবং এ সময়ে আমার মনে কখনো এ ধরনের কোন চিন্তার উদ্রেক হয়নি যে, আমি এ কাজ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করি—যার সাথে আমার জীবন মৃত্যুর সম্পর্ক। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে বাধ্য হয়ে এ পথই আমাকে বেছে নিতে হয়েছে। যখন আমি অনুভব করলাম, এভাবে অবিরাম কাজ করলে ছয় মাসের বেশী টিকে থাকতে পারব না, কেবল তখনি অব্যাহতি নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এ সময় জামায়াতে ইসলামীর সাথী বন্ধুগণ আমার প্রতি যে ভালবাসা প্রদর্শন করেছেন, তা আমার হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। আমি আল্লাহর নিকট এ দোয়াই করব, আল্লাহ যেন তাদেরকে এ ভালবাসার যথার্থ প্রতিদান দেন। কারণ আমার ও আমার সাথীদের মাঝে যে ভালবাসা বিরাজমান, তা আমার ব্যক্তি সত্ত্বার কারণে নয় বরং একমাত্র আল্লাহর দীনের স্বার্থেই। আর যে ভালবাসা আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তার প্রতিদান আল্লাহ তায়ালাই দিয়ে থাকেন। আপনাদের কল্যাণে আমার কিছু করণীয় থাকলে তা কেবল এ দোয়াই করা যে, আল্লাহ যেন আপনাদেরকে তাঁর দীনের অধিকতর খিদমত করার তাওফীক দেন এবং আপনাদের চলার পথের সমস্যাসমূহ দূর করে দেন। আমীন।

চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাওয়ার কারণে আমাকে গত দু'মাস কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। এ মুহূর্তে আমাকে আগামী দু'তিন মাসে করণীয় অনেক কাজও সামলে নিতে হবে। আজো রওনা হবার প্রাক্কালে অনেক রাত পর্যন্ত আমাকে মানসিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। এ সময় প্রিয় সাথীরা ভালবাসার কারণে অব্যাহতভাবে সাক্ষাতলাভের জন্য আসছে। এখন আমি এতোই দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, আপনাদের উদ্দেশ্যে কোন বক্তব্য রাখার শক্তি নেই। তবে আপনাদের প্রশ্নের উত্তর অতি সংক্ষেপে পেশ করছি।

জামায়াতে ইসলামীর ভবিষ্যত

প্রশ্ন ঃ জামায়াতে ইসলামী অনাগত ভবিষ্যতে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন সমস্যায় দীনের সরলপথে টিকে থাকতে পারবে, এ ব্যাপারে আপনি কি আস্থাবান?

জবাব ঃ এ ক্ষেত্রে মু'মিনদের উচিত আশা ও আকাংখা এই দুইয়ের মাঝখানে অবস্থান করা। আমাদের আশান্বিত থাকা উচিত যে, আমরা আন্তরিকতার সাথে কাজ করে যেতে থাকলে আল্লাহ তাঁর সাহায্যের দ্বারা আমাদেরকে পরিচালিত করবেন। কিন্তু সেই সাথে সদা সতর্ক থাকাও প্রয়োজন যে, আমাদের মনে যেন অণু পরিমাণও খলতা ও কপটতা স্থান না পায়। অন্যথায় শয়তান আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করার সুযোগ পেয়ে যাবে। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করা দরকার। যেভাবে তিনি ইতিপূর্বে আমাদেরকে অধপতন থেকে রক্ষা করেছেন, ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও তিনি আমাদেরকে সঠিক পথের উপর অবিচল রাখবেন। তবে আমি অযথা নিজেদেরকে অবমূল্যায়ণ বা হেয় মনে করার (UNDERESTIMATE) কথা বলছি না। নিজেকে অবমূল্যায়ণ করা অতি মূল্যায়ণ করার মতই ভুল।

আল্লাহর রহমতে আমরা সবসময় সাধ্যমত চেষ্টা করে আসছি, যাতে জামায়াতে ইসলামীর অভ্যন্তরে কোন সমস্যা বা বিশৃংখলা মাথা তুলতে না পারে। আর যদি কোন বিশৃংখলা দেখা দিয়েই বসে, তবে তা যেন তৎক্ষণাত সংশোধন করা হয়। এ জন্য জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনার সুশৃংখল প্রক্রিয়া চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে আমরা সর্বক্ষণ নিজেদের দুর্বলতার পর্যালোচনা করে থাকি এবং তা শুধরে নেবার চেষ্টা করে থাকি। আল্লাহর অনুগ্রহে জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে এমন এক প্রক্রিয়া চালু রয়েছে, যেখানে কোন ব্যক্তিই পরীক্ষা ছাড়া নিজের শ্রম, আন্তরিকতা ও যোগ্যতা ডিংগিয়ে সামনে অগ্রসর হতে পারে না।

আমাদের গৃহীত এ ব্যবস্থাই সম্ভাব্য সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক কর্মপন্থা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা এ পথে অবিচল থাকি এবং আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা পোষণ করি, তাহলে জামায়াতের এ কার্যক্রম কোন কিছু দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তাছাড়া এ প্রক্রিয়ায় জামায়াতের যে চিন্তা পদ্ধতি এবং মানসিকতা গড়ে উঠেছে, তারই ফলস্বরূপ জামায়াতে ইসলামী আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বিশেষের ওপর নির্ভরশীল থাকেনি এবং ভবিষ্যতেও তেমন

পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে না। যারা জামায়াতে যোগদান করেন, তারা আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দীনের কাজকে এগিয়ে নেয়ার জন্যই আসেন। আল্লাহর অনুগ্রহে ভবিষ্যতেও জামায়াতে এ ধরনের ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি কম অনুভূত হবে না। এরাই ভবিষ্যতে দীনী কাজের পথ পরিক্রমায় যে সকল সমস্যার উদ্ভব হবে, তা সাধ্যানুযায়ী এবং আল্লাহর সাহায্যে সমাধান করে নেবে। তবে এই সকল আশ্বস্ততা ও নিশ্চিন্ততা সত্ত্বেও আমি আপনাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের যোগ্যতা অনুযায়ী অবশ্যই কাজ করবেন, পরিশ্রম অবশ্যই করবেন, কিন্তু নিজেদের যোগ্যতা ও শ্রমের ওপর নির্ভর করবেন না। একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কারো ওপরই নির্ভর করা যায় না।

ইসলামী জীবনধারার ভবিষ্যত

প্রশ্ন : নৈতিক অনাচার ও অধোপতন যদি এই হারে বাড়তেই থাকে এবং অধিকাংশ মানুষ অন্যায় ও অসৎ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে কিছুদিন পর মানুষ ইসলামী জীবনব্যবস্থার ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হতে আরম্ভ করবে না তো?

জবাব : আমি নিজেও আমার বিভিন্ন বক্তৃতায় বারবার এ কথা বুঝাবার চেষ্টা করে আসছি যে, সামাজিক জীবনে যদি নৈতিক অধোপতন ও বিকৃতি এ হারে বৃদ্ধি পেতে থাকে, তাহলে সমাজটা ইসলামী জীবনধারার জন্য অনুপযোগী হয়ে পড়বে। কিন্তু যে কথাটি এখানে বুঝে নেয়া প্রয়োজন, তা হচ্ছে আপনার সাধ্যের সীমানা যতদূর বিস্তৃত, সে পর্যন্তই আপনি চরিত্র সংশোধনের কাজ অব্যাহত রাখবেন। আপনার সাধ্যের বাইরের কোন ব্যাপারে আপনি দায়ী নন। আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না। বর্তমানে সমাজের বাস্তব চিত্র হচ্ছে এই যে, দেশের যাবতীয় উপায়-উপকরণ, ধন-সম্পদ ও কর্তৃত্ব যাদের হাতে নিবদ্ধ, তারা চরিত্র বিনাশের কাজে লিপ্ত। তারা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, যাতে এখানে সততা ও সদাচারের বিস্তার না ঘটে। বরং কেবল চরিত্রহীনতার বিকাশ ও বিস্তার ঘটতে থাকে। আমরা যারা ধন ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা সবকিছু থেকেই বঞ্চিত, তাদের পক্ষে এটা প্রতিরোধ করা যে সম্ভব নয়, তাতো বলারই অপেক্ষা রাখে না। এ ব্যাপারে আমাদের কোন দায়দায়িত্ব নেই। আমাদের দায়দায়িত্ব ও জবাবদিহি শুধুমাত্র এতটুকুই যে, যে কাজ আমাদের নাগালের ভেতরে ছিল, তা সমাধা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি, না তাতে কোন ত্রুটি আছে। সুতরাং আপনারা আপনাদের

চেষ্টা-সাধনা অব্যাহত রাখুন এবং সমাজ সংস্কারে বিরামহীনভাবে তৎপর থাকুন।

এতক্ষণ যা বলা হলো, তা ছিল নীতিগত বক্তব্য। তবে আমি অনুভব করছি যে, আল্লাহ তায়ালা এ ভূখন্ডকে ইসলামী জীবনধারার লালন ক্ষেত্র বানাবেন বলেই স্থির করে রেখেছেন। বিগত পঁচিশ বছরের অবস্থা পর্যালোচনা করে আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, এখানে ইসলামী জীবনধারা অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত হবে। উপমহাদেশে মুসলমানদের কখনো এ ক্ষমতা ছিল না যে, তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করবে। প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ এবং মোজেযা যে, তিনি উপমহাদেশের একটি অংশকে পাকিস্তানে পরিণত করেছেন এবং এমন আকৃতিতে করেছেন, যা দেশ বিভাগের কোন পরিকল্পনাতেই ছিল না। পরিকল্পনাতো এটাই ছিল যে, দেশকে এমনভাবে বিভক্ত করা হবে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল ভারতে এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। জনসংখ্যা স্থানান্তরের ব্যাপারটা কারো কল্পনায়ও স্থান পায়নি। ভৌগলিক আকৃতি যদি এ রকমই থাকতো, তাহলে এখানে ইসলামী শাসনের কথা মুখেই আনা সম্ভব হতো না। আসলে এটা আল্লাহ তায়ালারই সিদ্ধান্ত ছিল, যার কারণে মুসলমানদের একটি বড় অংশকে হিজরত করতে হলো এবং এভাবে অত্র এলাকা মুসলমানদের সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতার এলাকায় পরিণত হলো। দাংগা -হাংগামায় মুসলমানদের যত ক্ষতিই হোক, তা থেকে আল্লাহ তায়ালা এটুকু কল্যাণও নিশ্চিত করেছেন যে, এখানে ইসলামী শাসনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে।

পক্ষান্তরে আপনারা নিজেরাই অবলোকন করেছেন যে, যারাই এ দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, তারাই লাঞ্ছিত অপদস্ত হয়েছে। অতীতেও ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারীরা খুব বেশীদিন থাকতে পারেনি এবং ইনশাআল্লাহ ভবিষ্যতেও তারা দীর্ঘস্থায়ী হবে না। এ ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে এবং এরা যেভাবে বিকৃতি সৃষ্টি করছে, তাতে এখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না মনে করে আমি কখনো হতাশ হয়ে পড়ি না। অতএব, এই পরিস্থিতি জাতির জন্য এক পরীক্ষা ক্ষেত্র। আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই পরীক্ষায় পূর্ণ সফলতা দান করেন।

আমার ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এই যে, এ জাতিকে বিভ্রান্ত করার জন্য যত প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, সে অনুপাতে মানুষের মধ্যে বিকৃতি ছড়ায়নি। এ

জাতির মধ্যে এখনও সততা বিদ্যমান রয়েছে। যেটুকু সততা এখনো অবশিষ্ট আছে, আপনারা তা সংরক্ষণ করুন ও তা কাজে লাগান। আপনারা কি দেখতে পান না যে, এখনও মানুষকে আল্লাহর পথে আহবান জানালে তারা আপনাদের কথায় সাড়া দেয়। আপনাদেরকে ঘৃণা করে না, বরঞ্চ অন্যায় পথে যারা চলে এবং যারা চালায়; তাদেরকে খারাপই জানে। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের মূল্যবোধে পরিবর্তন হয়নি, পরিবর্তন হয়েছে কেবল তাদের অভ্যাসের। আর এটা কোন দুরারোগ্য ব্যাধি নয়।

অসাংবিধানিক ও অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সমাজ পরিবর্তন সম্ভব কি?

প্রশ্ন ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে যখন আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরা অসাংবিধানিক পন্থা প্রয়োগ করছে, তখন আমাদের পক্ষে কি সাংবিধানিক ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় বিপ্লব ঘটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়েনি?

জবাব ঃ মনে করুন, অনেক মানুষ একত্রিত হয়ে আপনার স্বাস্থ্য ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হলো। তাহলে আপনিও কি তাদের দেখাদেখি নিজের স্বাস্থ্য ধ্বংসের কাজে লিপ্ত হবেন? অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় কার্যসিদ্ধির চেষ্টা করে তারা নিতান্ত খারাপ কাজ করেছে। যদি আমরাও সেই পথই অবলম্বন করি, তাহলে আমরাও খারাপ কাজই করবো। অসাংবিধানিক পন্থা অবলম্বনের দু'টি রূপ হতে পারে। প্রথমতঃ প্রকাশ্যরূপ, দ্বিতীয়তঃ গোপনরূপ। আপনারা ভেবে দেখুন, উভয় রূপের পরিণতি কি হতে পারে।

প্রকাশ্যভাবে অসাংবিধানিক পন্থায় যে পরিবর্তন সাধিত হবে, তার পরিণাম অত্যন্ত খারাপ হবে। এ ধরনের প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমগ্র জাতি আইন ভংগের প্রশিক্ষণই পাবে মাত্র। এরপর শত বছর প্রচেষ্টা চালিয়েও আপনারা তাদেরকে আইনের প্রতি অনুগত করতে সক্ষম হবেন না। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় আইন ভঙ্গ করাকে কৌশল হিসেবে ব্যবহারের পরিণতি আপনারা অবলোকন করছেন। আজ বিশ বছর পরও ভারতের জনসাধারণকে আইনের প্রতি অনুগত করা সম্ভব হয়নি।

গোপন পন্থায় অবৈধ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হলে তার পরিণতি হবে আরো মারাত্মক। সংগঠনে কিছু লোক দন্ডমুন্ডের মালিক হয়ে বসে এবং গোটা সংগঠন বা আন্দোলন তাদের ইচ্ছানুযায়ীই পরিচালিত হয়। তাদের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণকারীদেরকে তৎক্ষণাত শেষ করে দেয়া হয়। তাদের নীতির

প্রতি আস্থাহীনতা প্রকাশ করাকে ভীষণ অসহনীয় ও অপছন্দনীয় মনে করা হয়। এখন আপনারা নিজেরাই চিন্তা করুন যে, এই গুটি কয়েক লোক যখন নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবে, তখন তারা কি জঘন্য স্বৈরাচারী হবে। আপনারা যদি এক স্বৈরাচারকে হটিয়ে অপর স্বৈরাচারকে নিয়ে আসেন তাহলে তাতে আল্লাহর সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর কোন্ দিকটি রইলো?

আমার পরামর্শ সর্বদাই এই যে, আপনাদেরকে যদি অনাহারে-অর্ধাহারেও থাকতে হয়, জেল-জুলুমও ভোগ করতে হয়, গুলীও খেতে হয়, তবুও ধৈর্য ও বিনয়ের সাথে নিজেদের সংস্কার আন্দোলনকে খোলাখুলিভাবে আইন-কানুন, নিয়ম-শৃংখলা এবং চারিত্রিক সীমানার মধ্যে পরিচালিত করতে থাকুন। স্বয়ং রাসূল (সাঃ)-এর পন্থাও ছিল প্রকাশ্য এবং দাওয়াতদানের পদ্ধতি ছিল খোলাখুলি। জামায়াতে ইসলামী সর্বদা এ পদ্ধতিই অনুসরণ করেছে। প্রথম কয়েক বছর আমাদের উপর অন্যায়ভাবে আক্রমণ চলেছে, কিন্তু আমরা কখনো বেআইনী পন্থা অবলম্বন করিনি। ফলে তারাই সমাজে হেয় ও অপদস্ত হয়েছে। আমাদের উপর কেউ কোন কলংক আরোপ করতে পারেনি। এভাবে চলতে পারলে এর একটা মস্তবড় নৈতিক প্রভাব প্রতিফলিত হবে। স্বয়ং বিরোধী মহলের বিবেকও সাক্ষ্য দেবে যে, তারা অন্যায় কাজ করছে। আপনাদের প্রতি আমার আবেদন, আপনারা কখনো নিজেদের নৈতিক সুনাম বিনষ্ট হতে দেবেন না এবং যারা অসাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় কাজ করার কথা ভাবে, তাদেরকে মোটেই উৎসাহিত করবেন না। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, আমাদেরকে তা শুধরাতে হবে। কিন্তু ভুল পদ্ধতিতে পরিস্থিতি শুধরায় না। বরং আরো বিগড়ে যায়।

[সাপ্তাহিক আইন, ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮ইং]

ইসলাম প্রচারে সুফীগণের ভূমিকা

প্রশ্ন : আমরা বই পুস্তকে পড়েছি, হিন্দুস্তানে বিদেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে সুফীগণ আসতেন এবং তাদের দাওয়াতে হাজার হাজার অমুসলিম মুসলমান হয়ে যেতো। এখন সুফীগণের আগমনের ধারা বন্ধ হলো কেন? বর্তমান সময়ে তো তাদের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী।

উত্তর : কোন যুগ-ই আল্লাহর ঐসব বান্দা থেকে মুক্ত ছিল না, যারা আল্লাহর দীনের প্রচার ও প্রসারের কাজ করেছেন। সুফীগণ তো আল্লাহর নবীগণের মত প্রেরিত হন না যে,তাদের আগমন ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। প্রকৃত

ব্যাপার হলো এই যে, যারা দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে লিপ্ত, তারা যখন মানুষের মাঝে বিচরণ করেন, তখন অনেক সময় তাদের গুরুত্ব পূর্ণরূপে অনুভব করা যায় না। পৃথিবী থেকে তাদের প্রস্থানের পর যখন এক যুগ পেরিয়ে যায় এবং তাদের নামের সাথে সম্মানসূচক কিছু উপাধি সংযুক্ত হয়, তখন আমরা তাদেরকে এবং তাদের সমকালীন সময়কে অত্যন্ত আবেগের সাথে স্মরণ করি এবং এটা অনুভূত হয় যে, এমন মানুষ তো কেবল সে যুগেই ছিল।

মূলত আল্লাহ্র দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত আল্লাহ্র বান্দা সর্বযুগেই বর্তমান থাকে এবং সমকালীন অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাঁরা আল্লাহর দীনের খেদমতে নিয়োজিত থাকেন।

পাকিস্তানকে মসজিদের মর্যাদা দান

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! জামায়াতে ইসলামীর বিভিন্ন নিবন্ধে পাকিস্তানকে মসজিদ হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কিছু সংখ্যক লোকের আপত্তি রয়েছে যে, যদি এটা মসজিদ হয়ে থাকে, তাহলে এখানে জুতা নিয়ে কিভাবে বিচরণ করা হয়? আর এই অভিযোগের গুরুত্ব কি?

উত্তর ঃ তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আল্লাহ্র রাসূল (সাঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেছেন যে, সমগ্র পৃথিবী আমার জন্য মসজিদ এবং পবিত্র স্থান গণ্য করা হয়েছে এবং এটা মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নবুওয়াতেরও একটি বিশেষত্ব। ঐ লোকদের কি এ ব্যাপারেও কোন আপত্তি আছে? কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মাওলানা বললেন ঃ **পরিষ্কার এবং সোজা কথা হলো, পাকিস্তানকে আমরা মসজিদ হিসেবে গণ্য করি এ কারণে যে, এ ভূখন্ড শুধুমাত্র ইসলামের নামে এবং ইসলামের জন্যই অর্জিত হয়েছে। এখানে একমাত্র ইসলামেরই বিজয় হওয়া উচিত। যদি কেউ ইসলাম ছাড়া এখানে ভিন্ন কোন জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তবে সে এ ভূখন্ডের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার দায়ে দোষী।**

প্রশ্ন ঃ মাওলানা! প্রশ্ন হচ্ছে, পাকিস্তানে যদি ইসলামী জীবনব্যবস্থা চালু না হয় তাহলে............?

উত্তর ঃ প্রশ্ন তো এটা নয়, বরং প্রশ্ন হচ্ছে, অবশেষে আপনি বেঁচে থাকার ইচ্ছাটাই কেন পরিহার করছেন? যদি আপনি নিজেই বেঁচে থাকার অধিকার পরিত্যাগ করেন, তাহলে কিভাবে বেঁচে থাকবেন। এখানে ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে না পারার কোন কারণ নেই। প্রয়োজন শুধু একদল

মরদে মুজাহিদের এবং এ যমীনকে রক্ষা করার মত দৃঢ় প্রত্যয়ের। রক্ষা করতে হবে এজন্য, যাতে এখানে দীনের পতাকা উড্ডীন হয়। এরপর বিফল হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না।*

[সাপ্তাহিক আইন, ৮ মে, ১৯৭০]

* ১৯৬৮ সালের ২৪ এবং ২৫ আগষ্টের মধ্যবর্তী রাত সোয়া আটটায় মাওলানা মওদূদী করাচীতে চৌধুরী গোলাম মোহাম্মদের বাসভবনে জামায়াত কর্মীদেরকে সাক্ষাৎদান করেন। কয়েক ঘন্টা পরই তাঁর লন্ডন রওয়ানা হওয়ার কথা। মাওলানার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য করাচীর বাইরে থেকেও বিপুল সংখ্যক সাথী সমবেত হয়। প্রায় ৪ হাজার কর্মী–সমর্থকের সমাবেশে মাওলানা বিভিন্ন প্রশ্নের যে জবাব দেন, ওপরে তাই তুলে ধরা হলো।

লাহোর মডেল টাউন অধিবাসীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের আসর

আপনি নিশ্চিত থাকুন যে, একটা শয়তানী শক্তি বেশীর চেয়ে বেশী যা কিছু করতে পারে, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করে তা বরদাশ্‌ত করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। সুতরাং যা কিছু সামনে আসে, তা আমার আশার চেয়ে অনেক কমই হয়ে থাকে। আমার সংকল্পের উপর তার একটা প্রভাবও পড়েনা, যতনা প্রভাব পড়ে কোন পাথরের উপর মাছির হামলায়। ওয়ামা তাওফীকী ইল্লা বিল্লাহ।

প্রশ্ন ঃ লোকেরা মনে করে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে মহিলাদেরকে সমান অধিকার ও সমমর্যাদা প্রদান করা হবে না। তাদেরকে শুধু পুরুষদের অধীন করে রাখা হবে। এই প্রগতির যুগে নারীদেরকে চার দেয়ালের মধ্যে বন্দী করে রাখার ধারণা কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? বোরকা পরিধান করলে তো নারীরা দেশের উন্নয়নে সহযোগী হবার পরিবর্তে প্রতিবন্ধক প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। বড় বড় ঘরের নারীরা মনে করে, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে তাদেরকে জোর–জবরদস্তি করে ধরে ধরে বোরকা পরিয়ে দেয়া হবে। পুরুষদেরকে দাঁড়ি রাখতে বাধ্য করা হবে। এসব ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি? বিশেষ করে উঁচু শ্রেণীর নারীদের মধ্যে এখন প্রোপাগান্ডা শুরু হয়েছে যে, এরা চারচারটি বিয়ে করবে।

উত্তর ঃ আপনার প্রশ্নের জন্যে দীর্ঘ জবাব প্রয়োজন। তবে, আমি সংক্ষিপ্ত ক'টি কথাই বলবো। এই সমাজের অনেক কিছুই আমি দীর্ঘদিন থেকে দেখে আসছি। সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করেছি। সেগুলোর পূর্ণ বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে অনেক কিছু লিখেছি। এসবের মধ্যে অন্যতম হলো মহিলাদের সমস্যা। এ প্রসংগে আমার 'পর্দা ও ইসলাম' এবং 'স্বামী–স্ত্রীর অধিকার' গ্রন্থ দু'টি অনেক আগেই প্রকাশ হয়েছে। পাঠাগার ও বাজারে গ্রন্থ দু'টি সহজলভ্য। শিক্ষিতদের প্রতি আমার অনুরোধ, অনুগ্রহ করে গ্রন্থ দু'টি পড়ে দেখুন। শিক্ষিত লোকদের ব্যাপারে আমি এ আশা করি না যে, তারা পড়ালেখা না করে এবং না জেনে–শুনেই কোন বিষয়ে মত প্রতিষ্ঠা করতে পছন্দ করবেন। অশিক্ষিত লোকেরা এমনটি করলে আফসোসের কিছু ছিল না। কিন্তু শিক্ষিত লোকদের এমনটি করা খুবই দুঃখজনক।

মহিলাদের সমান অধিকারের প্রশ্ন

এ প্রশ্নের জবাব হলো, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে নারীরা ঠিক সেই অধিকার এবং মর্যাদাই লাভ করবে, ইসলাম তাদের জন্যে যে অধিকার এবং মর্যাদা নির্ধারণ করে দিয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি চিন্তা করে থাকে যে, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল নারীদের অধিকার ও মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অবিচার করেছেন আর সুবিচার করেছে পাশ্চাত্যবাসী, তবে প্রথমে তার ঈমানের ব্যাপারেই তাকে পূর্ণ চিন্তা করে দেখতে হবে।

আপনাদের জানা দরকার, পাশ্চাত্যবাসী নারীদের যে 'সমমর্যাদা' দিয়েছে, তা তাদের মহিলা রেখে দেয়নি, দিয়েছে অর্ধপুরুষ বানিয়ে। তারা চায়, পুরুষরা

যতো কাজ করে, নারীদেরকেও সেই সব কাজ করতে হবে। কিন্তু একথা সবারই জানা, নারীরা যেসব কাজ সম্পাদন করে, পুরুষরা সেগুলো সব করতে সক্ষম নয়। সুতরাং এই 'সম' দাবীর অর্থ হলো, প্রকৃতি নারীদের উপর যেসব বাড়তি দায়িত্ব অর্পণ করেছে, একদিকে তাদেরকে সেগুলোও সম্পাদন করতে হবে, যা পুরুষরা সম্পাদন করতে সক্ষম নয়। অপরদিকে, পুরুষদের সাথে সমভাবে ঐসব দায়িত্বও তাদের পালন করতে হবে, প্রকৃতি যেগুলোর দায়িত্ব পুরুষদের উপর ন্যস্ত করেছে। অর্থাৎ ব্যাপারটা যেন এমন যে, তারা নারীদের দ্বারা দেড়গুণ বেশী কাজ করিয়ে নিতে চায়, আর নিজেরা করতে চায় অর্ধেক। এরি নাম দিয়েছে তারা, নারী–পুরুষের সমতার বিধান।

নারীদের প্রকৃতিগত মর্যাদা

সমতার দাবী করে পাশ্চাত্যে নারীরা প্রতারিত হয়েছে। তারা তাদের অনেক অধিকার ও মর্যাদা খুইয়ে বসেছে। Ladies first-এর সেই কাহিনী এখন সেখানে অচল। আমি স্বচোখে ইংল্যান্ডে দেখেছি, যানবাহনে নারীরা অসহায় দাঁড়িয়ে থাকে। সীটে বসে থাকা পুরুষরা তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না। অথচ আমাদের দেশে এখনো নারীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে পুরুষরা তাদের জন্যে সীট ছেড়ে দেয়। বলে, আপনি বসুন। কিন্তু পাশ্চাত্যের পুরুষরা বলে, তোমরা আমরা সমান। সুতরাং যে আগে সুযোগ পায় সে বসবে। নতুবা দাঁড়িয়ে থাকবে। এভাবে নারীরা সর্বত্র বঞ্চিত ও প্রতারিত হচ্ছে। কেউ তাদের জিজ্ঞেসও করে না। তবে 'বিশেষ' কোন কারণ থাকলে সেটা আলাদা কথা। সমতার দাবী সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের নারীরা পুরুষদের সাথে একই ধরনের কাজ করে সমান বেতন পায় না। এজন্য নারীরা হৈ–চৈও করে যাচ্ছে। তাছাড়া যেসব কর্মক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষ উভয়কে একই সমতলে নিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে যেহেতু আল্লাহ তায়ালা প্রকৃতিগতভাবেই নারীদেরকে পুরুষদের সমকক্ষ বানাননি, তাই লাখো চেষ্টা করেও সেসব ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের সমকক্ষ হতে পারে না। পাশ্চাত্য হোক কিংবা প্রাচ্য, কোথাও সাধারণত নারীদেরকে উচ্চ প্রশাসনিক নির্বাহী পদে অধিষ্ঠিত করা হয় না। বরং পুরুষদেরকেই করা হয়। নারীদেরকে মন্ত্রীত্ব প্রদান করা উচিত কিনা?—এ ব্যাপারে কয়েক বছর আগে ফ্রান্সে জনমত যাচাই করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ তাদেরকে গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত না করার পক্ষে রায় দেয়।

আসল কথা হলো, প্রকৃতিগতভাবে নারীদের জন্য যে মর্যাদা হওয়া উচিত, আপনি যদি তাদেরকে সেখান থেকে বিচ্যুত করে দেন, যে ময়দান তাদের প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়, সেখানে নিয়ে বসিয়ে দেন, তবে তো তারা পুরুষদের পিছে পড়ে যেতে বাধ্য। একই ময়দানের প্রতিযোগিতায় পুরুষরা অবশ্যি তাদের ছাড়িয়ে যাবে। এমতাবস্থায় কিছুতেই সমতা প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ইসলামী সমাজ ও পশ্চিমা সমাজ

ইসলাম নারীদের উপর কেবল সেসব দায়িত্ব-কর্তব্যই ন্যস্ত করে, যা প্রকৃতিই তাদের উপর ন্যস্ত করেছে। অতপর ইসলাম পুরুষদের সাথে তাদের সম্পূর্ণ সাম্যের মর্যাদা প্রদান করেছে। উভয়ের অধিকারের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য রাখেনি। সম্মানের দিক থেকে তাদেরকে সেই মর্যাদাই প্রদান করেছে, যা প্রদান করেছে পুরুষদেরকে। আমি উপরন্তু একথাও বলতে চাই, মুসলিম মহিলাদের উচিত, আল্লাহর শোকর আদায় করা যে, তারা মুসলিম সমাজে জন্ম নিয়েছে। কারণ পৃথিবীর অন্য কোন সমাজ নারীদেরকে ইসলামী সমাজের সমতুল্য মর্যাদা প্রদান করে না। আমেরিকায় গিয়ে দেখুন, নারীদের কি দশা। বৃটেনে নারীদের অবস্থা দেখে আসুন। কী যে আপদের জীবন তারা যাপন করে। পিতা তাদের দায়িত্ব বহন করে না। তাদের ব্যাপারে ভাইদের কোন দায়িত্ব নেই, সন্তানরাও তাদের দায়িত্ব বহন করে না। পরিবার ও বংশের কারো উপর তাদের ব্যাপারে কোন দায়িত্ব নেই। বয়স হলেই তাদের বাপ তাদেরকে বিদায় করে দেয়। বলে, নিজে গিয়ে কামাই করে খাও। অতপর সে কিভাবে কামাই করে খাবে, কিভাবে জীবন যাপন করবে, সে সম্পর্কে বার্গেনিং করার কোন অবকাশ থাকে না।

বর্তমানে পাশ্চাত্যের নারী সমাজ এতোই অসহায় জীবন যাপন করছে যে, তাদের জন্যে দুঃখ করবারও কেউ নেই। আমাদের দেশের যারা সেসব দেশে থাকে, তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন, সেখানে নারীদের কি দুর্দশা। অথচ আমাদের সমাজে বাপ উপযুক্ত পাত্র খুঁজে নিজেই নিজ দায়িত্বে কন্যাকে বিয়ে দেয়। এমনকি বিয়ে দেয়ার পরও পিতা সন্তানের কল্যাণ চিন্তায় ব্যাকুল থাকেন। ভাই-বোনদের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন। ছেলে মায়ের সেবায় নিরত থাকে। স্বামী স্ত্রীকে ঘরের রাণী বানিয়ে রাখে। এখানে আপনাদের প্রতি আন্তরিক স্নেহ প্রেম ও ভালবাসা পোষণ করা হয়। আপনাদের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়। আপনাদের সম্মান প্রদান করা হয়। অথচ পাশ্চাত্য সমাজে

নারীদের অর্ধ উলংগ করে পুরুষের সামনে নাচানো হয়। সেখানে সম্মান ও মর্যাদার কোন স্থান নারীদের জন্যে নেই।

এখন আমাদের দেশের নারীরা যদি সেসব অধিকারের প্রতি সন্তুষ্ট থাকতে না চায়, যা ইসলাম তাদের প্রদান করেছে; বরং সেই করুণ পরিণতি দেখতে চায়, যা ঘটছে পাশ্চাত্য দেশের নারী সমাজের, তবে তা দেখার স্বাধীনতা তাদের আছে। কিন্তু তাদেরকে একথা মনে রাখতে হবে, একবার সেই করুণ পরিণতির দিকে এগুলে সেখান থেকে ফিরে আসার সুযোগ খুব সহজে হবে না। কোন সমাজ যখন বিকৃতির দিকে এগিয়ে যায়, তখন সে বিকৃতির শেষ সীমায় পৌছে থাকে। আর বিকৃতির শেষ সীমায় পৌছুলে প্রত্যাবর্তন করা চাট্টিখানি ব্যাপার নয়।

দেশের উন্নয়নে নারীদের অংশগ্রহণ

বলা হয়েছে, পর্দা প্রথার অনুবর্তন করলে নারীরা দেশের উন্নয়নে সহযোগী হবার পরিবর্তে প্রতিবন্ধক প্রতিপন্ন হবে। এ প্রসংগে আমার প্রশ্ন হলো, দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে নতুন প্রজন্মের প্রতিপালন এবং প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত আছে, না নাই? সেই দেশ কেমন করে উন্নতি লাভ করতে পারে, যেখানে শিশুরা প্রথম দিন থেকেই পিতা-মাতার স্নেহ-ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়? যেখানে জন্ম হতেই শিশুরা পিতা-মাতার পরিবর্তে ভাড়াটে লোকদের হাতে প্রতিপালিত হয়? বাপও চকুরীতে চলে যায়, মাও চাকুরীতে চলে যায়, আর সন্তানদের প্রতিপালনের দায়িত্ব নেয় এমন সব প্রতিষ্ঠান, যেগুলো কোন অবস্থাতেই পিতা-মাতার বিকল্প হতে পারে না। শিশুকাল থেকেই এসব শিশুরা স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত হয়। আর শিশুকাল থেকে যেসব বাচ্চারা বাবা-মা'র আদর-স্নেহ বঞ্চিত হয়ে বড় হয়, তারা আসলে সত্যিকার মানুষ হয়ে গড়ে উঠতে পারে না।

আজ বিশ্বময় যে অন্যায়, অবিচার, পশুত্ব, বর্বরতা এবং কিশোর অপরাধ বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার কারণও এটাই যে, বিশ্বব্যাপী ক্ষমতার দন্ড সেসব লোকদের হাতে আসছে, যারা ছোটবেলা থেকেই বাবা-মা'র স্নেহ-মমতা থেকে বঞ্চিত। এসব শিশু যখন বড় হয়, তখন পিতা-মাতার প্রতিও তাদের কোন মমত্ববোধ থাকে না। আর যেখানে রক্তের বাঁধনের প্রতিই কোন মমত্ববোধ থাকে না, সেখানে মানবতার প্রতি মমত্ববোধের তো প্রশ্নই ওঠে না।

শেষ পর্যন্ত এই ধরনের লোকেরা তো স্বার্থের দাস হতে বাধ্য। মানুষের কল্যাণ চিন্তা থেকে মুক্ত হতে বাধ্য। ইংল্যান্ড সফরের সময় এমন অনেক

পাকিস্তানী লোকের সংগে আমার সাক্ষাত হয়েছে, যারা বহু বছর থেকে সেখানে বসবাস করে আসছেন। তাদের কাছ থেকে ইংরেজ সমাজের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানার চেষ্টা করেছি। কারণ, তারা সে সমাজের রগরেষা সম্পর্কে অবহিত। তারা আমাকে এমন সব ঘটনা শুনিয়েছেন, যা সত্যিই বেদনাদায়ক। এক কক্ষে এক বৃদ্ধা মা থাকেন। পেনশন দিয়ে চলেন। তার ছেলেমেয়েরা সবাই বিলাসী জীবন যাপন করে। বস্তুবাদী দৃষ্টিতে তাদের জীবন সুখের জীবন। কিন্তু এই বৃদ্ধার খোঁজ-খবর নেয়ার কেউ নেই। তার দুঃখে দুঃখী হওয়ার কেউ নেই। তাকে একটু সাহায্য করবার কেউ নেই। একদিন বৃদ্ধা মারা যায়। কেউ তার খোঁজ নিতে আসেনি। দুধওয়ালা প্রতিদিন দুধ দিয়ে যায়। সে যখন দেখল দুই তিন দিনকার দুধের বোতল দরজায় পড়ে আছে, ভিতরে ঢুকানো হচ্ছে না, তখন সে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ গিয়ে ভিতরে ঢুকে দেখে, বৃদ্ধার লাশে পচন ধরেছে। এই হচ্ছে সেসব নারীর অবস্থা, যাদের পুত্র-কন্যারা বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত।

ওখানে বসবাসকারীরা ওখানকার যে চিত্র তুলে ধরে, তাতে জানা যায়, সেখানে পারিবারিক বন্ধন নিঃশেষ হয়ে গেছে। পুত্রের সাথে পিতার, কন্যার সাথে মা'র এবং ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের কোন সম্পর্ক নেই। এই করুণ পরিণতির কারণ হলো, অর্থনৈতিক উৎপাদনের উন্নয়নকেই দেশ ও জাতির উন্নয়ন মনে করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে নারী-পুরুষ সবাইকে নিয়ে অর্থনৈতিক ময়দানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। বেপরোয়াভাবে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। অথচ কেবল অর্থনৈতিক উৎপাদন বৃদ্ধির নামই উন্নয়ন নয়। নারীরা যদি ঘরে নতুন প্রজন্মকে সুশিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়, মানবতা শিখায় এবং উন্নত নৈতিক চরিত্র ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য পয়দা করার চেষ্টা করে, তবে এটাও উন্নয়নের একটি বিরাট মাধ্যম। পুরুষরাও কলে-কারখানায় কাজ করবে, নারীরাও কলে-কারখানায় কাজ করবে, দেশের উন্নয়নের কেবল এটাই একমাত্র উপায় নয়। বরং এটাও উন্নয়নের একটা বড় উপায় যে, ঘরে শিশুদেরকে মানবতা শিক্ষা দিয়ে তৈরী করা হবে এবং এতোটা যোগ্য করা হবে যে, তারা পৃথিবীতে মানবতার নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা অর্জন করবে, হিংস্র পশুপাখী হয়ে গড়ে উঠবে না।

পর্দা প্রসংগ

পর্দার ব্যাপারে উঁচু ঘরের নারীদের যে আশংকার কথা আপনি প্রকাশ করেছেন, তার জবাবে প্রথমে সে মহিলাদের আমি সান্ত্বনা ও নিশ্চয়তা দিতে

চাচ্ছি, ইনশাআল্লাহ জামায়াত ক্ষমতায় গেলে কোন পুলিশ জোর-জবরদস্তি করে আপনাদের বোরকা পরিয়ে দেবে না। অতপর আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করতে চাই, বিগত কয়েক দশকে আপনারা কি কারণে বোরকা ছেড়েছেন? পুলিশ বাহিনী রাস্তায় রাস্তায় অভিযান চালিয়ে আপনাদের বোরকা খুলে নিয়েছে কি? যদি তা না হয়, বরং পাশ্চাত্যের অপসংস্কৃতির প্রভাবে এবং পরিবেশের চাপে আপনারা বোরকা ছেড়ে থাকেন, তবে ইনশাআল্লাহ যখন ইসলামী শিক্ষা বিস্তার লাভ করবে, পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির স্থলে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি চালু হবে এবং পরিবেশ পাল্টে যাবে, তখন এসব পোশাক পরিধান করতে অবশ্যি আপনারা লজ্জা বোধ করবেন, এখন যা পরে বেড়াচ্ছেন।

প্রথমে যখন ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনো মহিলাদের মেরে ধরে বাধ্য করে পর্দা করানো হয়নি। বরং আল্লাহ এবং রাসূলের শিক্ষা যখন মহিলাদের অন্তরে ঈমানের আলো জ্বেলে দিয়েছিলো, তখন তাদের এতটুকু বলে দেয়াই যথেষ্ট হয়েছিলো যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বেপর্দা পসন্দ করেন না। এতে করে তারা নিজেরাই সানন্দে পর্দা গ্রহণ করে নিয়েছিলো।

দাঁড়ি প্রসংগ

একইভাবে বিগত কয়েক দশকে মুসলিম সমাজ থেকে যেভাবে দাঁড়ি বিদায় নিচ্ছে, তাও জোর করে কেউ তাদের দাঁড়ি চেঁছে দেয়নি; বরং তাও ছিলো সৃষ্ট সমাজ পরিবেশের প্রভাব। এসবই ঘটেছে সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে, যা ইংরেজ শাসকরা আমাদের সমাজে চাপিয়ে দিয়েছিলো। ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যখন বিজয়ী হবে, তখন পরিবেশও ইনশাআল্লাহ পাল্টে যাবে। জামায়াত তার সদস্যদেরকেও বাধ্য করে দাঁড়ি রাখায় না। এমন অনেক লোকই জামায়াতে প্রবেশ করেছেন, যারা দাঁড়ি রাখতেন না। কিন্তু জামায়াতে অন্তর্ভুক্ত হবার পর যখন তাদের অন্তরে এ অনুভূতি পয়দা হয়েছে যে, আমরা মুসলমান আর মুসলমানের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মান্য করা, তখন তারা নিজেরাই নিজেদের বিবেকের তাড়নায় দাঁড়ি রেখে দিয়েছেন। আমরা জোর করে দাঁড়ি রাখাইনি।

জামায়াত ক্ষমতায় এলে ইনশাআল্লাহ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা পাল্টে যাবে। দেশের নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে। জনগণের রুচি এবং পছন্দ অপছন্দের মাপকাঠি পাল্টে দেবার চেষ্টা করা হবে। এর পরিণতিতে

ইনশাআল্লাহ প্রত্যেকের মুখে নিজের ইচ্ছায়ই দাঁড়ি গজিয়ে উঠবে। এজন্য কোন আইন প্রণয়ন করতে হবে না। শাস্তি নির্ধারণ করতে হবে না।[১]

স্ত্রীর সংখ্যা প্রসংগ

একথাও বলা হয়, জামায়াত ক্ষমতায় এলে লোকেরা চারটি করে বিয়ে করবে। এতে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয় এজন্য যে, যারা এ দেশের এ সমাজে বসবাস করে, তারা পাশ্চাত্যের অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে স্বয়ং নিজের দেশ এবং সমাজ সম্পর্কে এতোটাই অজ্ঞ। চোখ খুলে একটু তাকিয়ে দেখুন, আপনার দেশে এমন কতো লোক আছে, যারা চার চারটি বিয়ে করে রেখেছে? বরং দু'জন স্ত্রী গ্রহণকারী লোকের সংখ্যাই বা কতো? এটা একটা অহেতুক জবরদস্তিমূলক অপপ্রচার, যা আমাদের উপর বহু বিবাহ প্রসংগে আরোপ করা হয়েছে। আসল রহস্য হলো, এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে ঐসব নারীরা, যারা নিজেরাই তাদের স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রী। তারা বহু বিবাহের বিরুদ্ধে এ কারণে চেঁচামেচি করছে যে, ওদের সাহেবরা যেন আবার তৃতীয় বিবাহ না করে বসে। কারণ পর্দাহীন সমাজে 'স্ত্রী বাছাই'র সুযোগ অনেক বেড়ে গেছে।

যে পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতায় প্রভাবিত হয়ে বহু বিবাহের বিরোধিতা করা হয়, তাদের সমাজে এক বিবাহ (Monogamy) –কে আইনসংগতভাবে তো অবশ্যই আবশ্যকীয় সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাদের শতকরা একজনেরও বাস্তবে শুধু একজন স্ত্রী (Monogamous) নেই। চিকিৎসার জন্য আমি যখন লন্ডনে অবস্থান করছিলাম, তখন হাসপাতালের এক নার্স একদিন আমার সামনে ইসলামের বহু বিবাহ (Polygamy) প্রসংগ উত্থাপন করে। আমি তাকে বললাম, তুমি কসম খেয়ে বলো, তোমাদের দেশে কি এক বিবাহ পাওয়া যাবে। আমি আইনসংগত এক বিবাহের কথা বলছি না। তা তো তোমাদের এখানে বিদ্যমান আছেই। কিন্তু এটা বলো যে, কার্যত কি তোমাদের সমাজে এক বিবাহ পাওয়া যাবে?

সে বললো, না। আমি বললাম, এবার বলো, তুমি দু'টি অবস্থার মধ্যে কোনটিকে উৎকৃষ্ট মনে করো? একটি অবস্থা হলো এই যে, আইনসংগতভাবে এক বিবাহ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বেআইনীভাবে বহু বিবাহ খুব জোরেসোরেই চালু রয়েছে। আর এ অবৈধভাবে বহু বিবাহের ক্ষেত্রে যতোজন মহিলার সংগে একজন পুরুষের সম্পর্ক থাকে, এদের মধ্যে কোন

১. লাহোর মডেল টাউনের বাসিন্দাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের আসর। ২৪ জুলাই, ১৯৭০।

অন্যজনেরও তার উপর কোন হক নেই। আর এ কারণে তার উপর কোন দায়-দায়িত্বও অর্পিত হয় না। দ্বিতীয় অবস্থাটি হচ্ছে, ব্যক্তির উপর আইনের বাধ্যবাধকতা আরোপ করে তাকে একথা বলা যে, যদি সে একাধিক স্ত্রীর সংগে সম্পর্ক রাখতে চায়, তবে তাকে তাদের সাথে নিয়মতান্ত্রিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। তাদের সকল দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি তাদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত করা অত্যাবশ্যকীয়। আর সে ব্যক্তি একই সংগে সর্বোচ্চ চারটির বেশী বিয়ে করতে পারবে না। এবার তুমি নিজেই বলো, এ দু'টি অবস্থার মধ্যে কোনটি তোমার কাছে উৎকৃষ্ট?

একজন ইংরেজ মহিলা হয়েও সে স্বীকার করে যে, এ দু'টি অবস্থার মধ্যে দ্বিতীয়টিই সর্বোত্তম। সুতরাং আমি আমার মুসলিম বোনদের বলবো, যে দীন আপনারা পেয়েছেন, তার চেয়ে অধিক যুক্তিসঙ্গত, ন্যায়পরায়ণ এবং মানব কল্যাণের গ্যারান্টিবহ অপর কোন দীন বা জীবনব্যবস্থা নেই। এর ভেতরে যদি পাশ্চাত্য প্রভাবের দরুন কারো নযরে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তবে সে অপর কোন দীন খুঁজে নিতে পারে। আমাদের দীন বাস্তবে চার বিবাহের অনুমতি দিয়েছে সত্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে শর্তও আরোপ করেছে যে, সকল স্ত্রীর মাঝে ইনসাফ কায়েম করবে। যদি তা করতে সক্ষম না হয়, তবে একজন স্ত্রীকেই যথেষ্ট মনে করে নেবে।

আমোদ-প্রমোদ ও আনন্দ-বিলাস

প্রশ্ন : আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা আশংকা করছেন, জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এলে দেশে নিরস ও নিরানন্দের যুগ শুরু হবে। যৌবনের সমস্ত আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তরঞ্জন শেষ হয়ে যাবে। সকল প্রকার চিত্তবিনোদন নিষিদ্ধ করা হবে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে লোকদের এ আশংকা কি ঠিক?

উত্তর : নিরস শব্দটি তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটি পরিভাষা। নিরস বলতে তারা মদ্যপান বন্ধ করাকে বুঝিয়ে থাকে। যারা এই পরিভাষাটি আবিষ্কার করেছে; তাদের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, মদ বন্ধ করা হলে নিরস ও শুষ্কতা শুরু হবে। আর মদ্যপান চালু থাকার অর্থ হলো, সজীবতা। এখানে নিরস শব্দটি যদি এই অর্থেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তবে আমি পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, ইনশাআল্লাহ জামায়াতে ইসলামী এ দেশে কোন রস বর্তমান থাকতে দেবে না। একথাটি ভাল করে শুনে রাখুন এবং লিখে রাখুন।

আশংকা করা হয়েছে, আমোদ-প্রমোদ এবং চিত্তবিনোদন বন্ধ করে দেয়া হবে। এ প্রসংগে আমার আবেদন হলো, আমাদের এই বুদ্ধিজীবী মহল যেন যৌবনের সেইসব আমোদ-প্রমোদ ও চিত্তবিনোদনের উপকরণসমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করে ফেলেন, যেগুলো তারা চালু রাখতে চান। অতপর তাদের এই তালিকা দেখে আমরা চিহ্নিত করে দেব, কোন্‌গুলো চালু রাখা হবে, আর কোন্‌গুলো নিষিদ্ধ করা হবে।

মার্কিন সাহায্য

প্রশ্ন ঃ জামায়াত আমেরিকা থেকে সাহায্য পাচ্ছে বলে বিগত বছরগুলোতে জামায়াতের বিরুদ্ধে বারবার অভিযোগ উথাপিত হয়ে আসছে। এখন অভিযোগটির ধরন একটু পরিবর্তন হয়েছে। এখন অভিযোগ হলো, মার্কিন দূতাবাস আপনার গ্রন্থাবলীর লক্ষ লক্ষ কপি ক্রয় করে সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে। আর এভাবেই তারা আপনাদেরকে বিপুল অর্থনৈতিক সাহায্য করছে। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি নিজের লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে সম্পূর্ণ নির্লজ্জভাবে দিনরাত রঙীন রঙীন মিথ্যা কথা ছড়াতে থাকে, তবে আপনি তাদের কয়টা মিথ্যা কথা খন্ডন করবেন? এবং কতোদিন করতে থাকবেন? যারা এই অপবাদটি শুনেছে, তাদেরই উচিত ছিল, ওদের কাছে এর প্রমাণ দাবী করা। এটা সারাবিশ্বের স্বীকৃত নিয়ম যে, কেউ যদি কোন অভিযোগ উথাপন করে তবে তার স্বপক্ষে দলীল-প্রমাণ উপস্থাপন করার দায়িত্ব তারই উপর বর্তায়। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উথাপন করা হয়, প্রমাণ উপস্থাপন করার দায়িত্ব তার উপর বর্তায় না। অপবাদ আরোপকারীরা যখন অনুভব করল, তাদের প্রমাণবিহীন অপবাদ আর জনগণ গ্রহণ করছে না, তখন তারা আর একটি নতুন অপবাদ তৈরী করল যে, আমেরিকা আমাদের লক্ষ লক্ষ কপি বই কিনে নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিচ্ছে। চিন্তা করে দেখুন, এই লক্ষ লক্ষ কপি বই ছাপার জন্যে কাগজ তো দেশের দোকানগুলো থেকেই কিনতে হবে। বিদেশ থেকে তো লাইসেন্স ছাড়া এক টুকরা কাগজও আসবে না। তাছাড়া এ লক্ষ লক্ষ কপি বই তো দেশের প্রেসগুলোতেই ছাপাতে হবে। অতপর পরিবহন করে দেশের ভিতর দিয়েই কোন পথে সমুদ্রে নিয়ে ফেলে দেবে। এতোগুলো কাজ তো কিছুতেই সংগোপনে হতে পারে না। এখন অভিযোগকারীরা সেই দোকানগুলোর নাম বলুক, যেগুলো থেকে লক্ষ লক্ষ বই ছাপানোর জন্য কাগজ কেনা হয়েছে। সেইসব প্রেসের নাম বলুক, যেখানে লক্ষ লক্ষ বই ছাপা

হয়েছে। সেইসব পরিবহনের নাম বলুক, যেগুলোতে বহন করে সমুদ্রে বইগুলো ফেলা হচ্ছে।

এবার আপনাকে আর একটি কথা বলছি। এ দেশ এখনো সত্যবাদী, বিশ্বস্ত এবং সুবিচার প্রিয় লোকদের থেকে একেবারে খালি হয়ে যায়নি। আপনি এ ধরনের দশজন লোক বাছাই করুন। তাদেরকে প্রথমে আমার ঘরে নিয়ে আসুন। তারা আমার ঘরদোর পর্যবেক্ষণ করে দেখুক। অতপর জামায়াতের নায়েবে আমীর মিঁয়া তোফায়েলের বাসায় নিয়ে যান। জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল চৌধুরী রহমত এলাহীর বাসায় নিয়ে যান। পূর্ব পাকিস্তানের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের বাসায় নিয়ে যান। অতপর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সব জামায়াত নেতৃবৃন্দের বাসায় নিয়ে যান। তারা এদের ঘরদোর পর্যবেক্ষণ করে দেখুক। এরাই জামায়াতকে পরিচালনা করছেন। তারা নিজেদের চোখে দেখে আসুক, জামায়াত নেতৃবৃন্দ কি ধরনের ঘরে বসবাস করে। কি রকম পানাহার করে। তাদের ঘরে কি কি ফার্নিচার ও আসবাবপত্র আছে। সেই সাথে তারা এটাও দেখে আসুক, জামায়াত নেতৃবৃন্দ কি নিজেদের বাড়ীতে থাকে, নাকি ভাড়া বাড়ীতে? এরপর তারা নিজেরাই ফয়সালা করুক, মার্কিন সাহায্য পাওয়া লোকদের জীবন কি এ রকম হয়ে থাকে?

আপনি কি এমন কোন দল পাবেন, যে দলের লোকেরা একদিকে এতটা বিশ্বস্ত যে, তারা যা কিছু টাকা গ্রহণ করে, তা ঐ কাজেই ব্যয় করে, যে কাজের জন্য তারা টাকা গ্রহণ করেছে এবং নিজের ঘর সাজানোর জন্যে, ঘর বানানোর জন্যে কিংবা বিলাস্ সামগ্রী সংগ্রহের জন্যে ব্যয় করে না? অপরদিকে তারা এতোটা বিশ্বাসঘাতক যে, স্বদেশের সরকারের হাতেও বিক্রি হয় না, পুঁজিপতি-শিল্পপতিদের হাতেও বিক্রি হয় না, অথচ নিজেদের বিক্রি করে কেবল বারো হাজার মাইল দূরে গিয়ে আমেরিকার বাজারে?

আমি বলি, কারো যদি মাথা থাকে আর সে মাথায় বিবেক-বিবেচনা থাকে, তবে বিবেক খাটিয়ে দেখুক। এ ধরনের বিশ্বস্ত লোকেরা বিদেশীদের হাতে কেমন করে বিক্রি হতে পারে? আমাদের দেশে কি ক্রেতার অভাব পড়েছে? আমাদের দেশে কি খোলা বাজারে বুদ্ধি-বিবেক বেচাকেনা হয় না? এ দেশের কারা কারা বিক্রিত হয়ে আছে, একথা কার অজানা? কতদামে কারা বিক্রি হয়েছে, আর কে কাকে কিনেছে, এসব কথা কি জনগণ জানে না? কেউ কি একথা বলতে পারবে, আমাকে বা জামায়াতে ইসলামীকে কেউ খরিদ করতে পেরেছে। কে দাঁড়িয়ে একথা বলতে পারবে যে, ব্যক্তিগতভাবে

আমি তার একটি পয়সা দ্বারাও অনুগৃহীত হয়েছি। কিংবা জামায়াতে ইসলামী কখনো তার সাথে কেনাবেচার কাজ করেছে?

প্রশ্ন হলো, শেষ পর্যন্ত গোটা দেশে কি আমাকে আর জামায়াতে ইসলামীকেই বুঝি খুঁজে পাওয়া গেলো, যাদের উপর এই নিকৃষ্ট অপবাদ চাপানো যায়? জামায়াতে ইসলামী আমেরিকার সাহায্য পাচ্ছে বলে যারা দাবী করছে, একটু কষ্ট করে তাদের ঘরদোরও দেখে আসুন। তাদের গাড়ী বাড়ীর মান দেখে আসুন। তাদের উপায়-উপকরণ দেখে আসুন। তারপর আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন, তাদের পকেটে অবৈধ অর্থ ঢুকছে কিনা।

কাশ্মীরের জিহাদ প্রসংগ

প্রশ্ন ঃ কিছুলোক দীর্ঘদিন থেকে আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আসছে যে, আপনি কাশ্মীরের জিহাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। এ অভিযোগ কতটা সত্য? কাশ্মীর সমস্যার ব্যাপারে আপনার ও জামায়াতের দৃষ্টিভংগি কি?

উত্তর ঃ এ এক আজব ব্যাপার। বিগত তেইশ বছর ধরে আমি এ রকমই দেখে আসছি। দেশের সংস্কারের উদ্দেশ্যে জামায়াতে ইসলামী যখনই কোন বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চায়, অথবা যখনই জাতীয় নির্বাচন আসে এবং কিছু লোকের ভয় হয় যে, জামায়াত তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে বসবে, তখনই তারা কিছু পুরনো অভিযোগকে ঘসামাজা করে পুনরাবৃত্তি করতে থাকে। অতপর যখন সেই সময়টি পেরিয়ে যায়, তখন এই অপবাদগুলোকে কোন হিমাগারে নিক্ষেপ করা হয়। অনেক সময় এ অপবাদ আরোপকারী ব্যক্তিরাই আবার জামায়াতের সহযোগিতা করতে শুরু করে। তখন কিন্তু তাদের খেয়াল থাকে না যে, এটা সেই গুনাহগার জামায়াত, যাকে তারা এক সময় অপবাদ দিয়েছিল। এখন আমি এ অভিযোগের নতুন কোন জবাব না দিয়ে, সেই জবাবটিই পড়ে শুনাচ্ছি, যে জবাব দিয়েছিলাম আমি ১৯৬৩ সালে ঢাকায় প্রদত্ত বক্তৃতায় এবং যেটি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী খান হাবিবুল্লাহ খানকেও দিয়েছিলাম এবং যেটি পুস্তিকাকারেও প্রকাশ হয়েছিল। আপনার স্মরণ থাকার কথা, ১৯৬৩ সালের অক্টোবর মাসে উক্ত খান সাহেব আমার বিরুদ্ধে এক সাংঘাতিক ধরনের প্রোপাগান্ডা অভিযান শুরু করেন। অতপর এই লাহোর শহরেই জামায়াতের বার্ষিক সম্মেলন পন্ড করার চেষ্টা করা হয়। তাতে আমাদের একজন কর্মীকে শহীদ করা হয়। সে সময় আমার প্রতি যেসব অভিযোগ আরোপ করা হয়েছিল, সেগুলোর বিস্তারিত জবাব আমি ১৯৬৩ সালের নভেম্বর মাসে এক জনসভায় দিয়েছিলাম। সেদিক থেকে এটা ছিল

তাদের সরকারী অভিযোগের জবাবে আমার সরকারী জবাব। সেখানে আমি বলেছিলাম ঃ

"আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে, আমি নাকি কাশ্মীরের জিহাদ হারাম হবার ফতোয়া প্রদান করেছি। এ জিহাদে মৃত্যুবরণকারীদের মৃত্যুকে হারামের মৃত্যু বলেছি। এ এক নির্জলা মিথ্যাচার। ১৯৪৮ সালে এক ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে এ মিথ্যা অভিযোগ রচনা করা হয়েছিল। আর যখনই আমি দেশে কোন সংস্কারমূলক কাজের প্রচেষ্টা চালাই, ঠিক তখনি এসব বস্তাপঁচা মিথ্যা অপবাদকে টেনে হেচঁড়ে সামনে আনা হয়। আমি তখন পরিষ্কারভাবে বলেছি, কাশ্মীরীদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা তাদের অলংঘনীয় অধিকার। আর তাদের এই জিহাদ পূর্ণরূপে বৈধ। সাথে সাথে আমি এ কথাও বলেছিলাম যে, যারা পাকিস্তানের নাগরিক নয়, তাদের জন্যও কাশ্মীরী ভাইদের সাহায্যার্থে তাদের সাথে মিলিত হয়ে লড়াই করা সম্পূর্ণ বৈধ ও পবিত্র কাজ, বরং একটি ফরয কাজ। আমি সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছিলাম, পাকিস্তানের অধিবাসীরাও যদি সহায়–সম্পদ দিয়ে কাশ্মীরীদের সাহায্য করে, তবে সেটাও সম্পূর্ণ জায়েয। যে কথা আমি সে সময় বলেছিলাম এবং আজো বলছি, তাহলো কোন জাতির বিরুদ্ধে যদি স্বয়ং পাকিস্তান সরকার যুদ্ধ ঘোষণা না করে, তবে পাকিস্তানের জনগণ নিজেদের পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারে না। কোন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যদি বলে, সরকার কোন জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করলেও দেশের কোন একজন নাগরিক যুদ্ধের ঘোষণা দিতে পারে এবং দেয়া উচিত। তবে এমন ব্যক্তির অবস্থান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিবর্তে মানসিক হাসপাতাল (Mental Hospital)-এ হওয়াই উত্তম। কোন নিয়মতান্ত্রিক বৈধ সরকার কখনো এ পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে না। দেশের কোন নাগরিক বা নাগরিকদেরকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করবে?

পাকিস্তান সরকারের তখনকার অবস্থান সম্পর্কে তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ সালে পরিষ্কার ভাষায় তুলে ধরেন। নিরাপত্তা পরিষদের প্রকাশিত রিপোর্ট মওজুদ রয়েছে। তার ৩৪২ পৃষ্ঠা দেখুন। তাতে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় যথারীতি এসব কথা বলেছেন ঃ " Many political Agents by sheer force of personalities backed admittedly by thereats that subvertions and Allowances woud not be paid Prevented the calling of Jehad (that is to say the proclamation of holy war) in their agencies and Pispersed several lashkans."

এটাই ছিল পাকিস্তান সরকারের অবস্থান। এর মাধ্যমে জিহাদ তো ঘোষণা করা হয়নি, বরং জনগণ জিহাদে অংশ গ্রহণ করলে সরকারী এজেন্টরা তাদেরকে এই বলে হুমকি প্রদান করে যে, যদি তোমরা জিহাদ করো এবং জিহাদের জন্য সেখানে যাও, তবে তোমাদের বেতন-ভাতা সবকিছু বন্ধ করে দেয়া হবে। তাছাড়া আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী গোটা বিশ্বের কাছে একথাও জানিয়ে দিয়েছেন যে, কাশ্মীরে গিয়ে যুদ্ধ করবার জন্যে যেসব স্থানে লোকেরা জড়ো হয়েছে সরকারের এজেন্টরা তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছে। সরকারের এ ভূমিকার পর আপনারা আমার কাছে আর কি চান? ৮ সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ পর্যন্ত সরকারের এ ভূমিকাই বহাল ছিল। ৮ই সেপ্টেম্বর প্রথমবারের মতো সরকারের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা পরিষদকে জানানো হয় যে, আজাদ কাশ্মীরে আমাদের সেনাবাহিনী রয়েছে এবং লড়াই করছে। এরপরই ১৪ ডিসেম্বরে জামায়াতের মজলিসে শূরার বৈঠকে আমি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এ ঘোষণা দিয়েছি যে, এখন যেহেতু আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আমাদের সেনাবাহিনী সেখানে মওজুদ থেকে লড়াই করছে, সুতরাং এখন আমাদের জিহাদ করার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলমানদের জন্য এখন সেখানে গিয়ে লড়াই করা বৈধ হয়ে গেলো।"

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা

প্রশ্ন ঃ আপনার উপর এ অভিযোগও বারবার আরোপ করা হয়, বিশেষ করে জাতীয় নির্বাচনের সময় আরো ব্যাপক আকারে বলা হয় যে, আপনি পাকিস্তান আন্দোলনের বিরোধিতা করে কংগ্রেসের হাতকে শক্তিশালী করেছেন। এ প্রসংগে আপনার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের লেখার উদ্ধৃতি দেয়া হয়—যা আপনার মাসিক তর্জমানুল কুরআনে প্রকাশিত হয়েছিল। এ অভিযোগ সম্পর্কেও কিছু আলোকপাত করবেন কি?

উত্তর ঃ এ অভিযোগও একই সময় খান হাবিবুল্লাহ খান সাহেব খুব জোরেশোরে সংবাদপত্রে উপস্থাপন করেছিলেন। তার জবাবও আমি ঢাকায় প্রদত্ত সেই ভাষণে দিয়েছিলাম, একটু আগে যা আমি উল্লেখ করেছি। সে জবাবটাই আমি আপনাকে পড়ে শোনাচ্ছি ঃ

"আমার উপর প্রথমত এ অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যে, মওদূদী পাকিস্তান মতবাদের বিরোধী এবং কট্টর কংগ্রেসী ছিল। কংগ্রেসী হওয়ার

অভিযোগটা স্পষ্টতই ভুল। আমার গোটা জীবনে কখনো আমি কংগ্রেসের সাথে জড়িত ছিলাম না এবং দুইআনা বা চারআনা দামের সদস্যও আমি কখনো হইনি। পাকিস্তানের বিরোধিতার ব্যাপারটা আগাগোড়াই অসত্য। ১৯৩৭ সালে যখন প্রথমবারের মতো ভারতের ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী শাসন কায়েম হয়, তখন সর্বপ্রথম আমিই মুসলমানদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করেছিলাম যে, কংগ্রেস ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের উপর কি বিপদ সংঘটিত হতে যাচ্ছে। "মুসলমান আওর মওজুদাহ সিয়াসী কাশমাকাশ (১ম খন্ড)" নামক বইটি আমার আজো বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেকেই সেটি পড়ে দেখতে পারেন যে, সে সময় আমি মুসলমানদেরকে কোন্ বিষয় সম্পর্কে সাবধান করার চেষ্টা করেছিলাম এবং তাদের মধ্যে নিজ জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য কি কি করেছি। আজো মুসলিম লীগের হাজার হাজার সমর্থক বেঁচে আছেন, যারা একথার সাক্ষ্য দেবেন যে, সে সময় একমাত্র আমার ঐ বইখানাকে মুসলমানদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টির জন্য তারাই সবচেয়ে বেশী ব্যবহার করেছিলেন। এরই বদৌলতে মুসলিম লীগের আন্দোলন জনগণের মাঝে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। এরপর ১৯৩৮ সালে আমি "সিয়াসী কাশমাকাশ" ২য় খন্ড প্রকাশ করি। তাতে আমি বিশ্লেষণ করি যে, কংগ্রেস এক জাতির ভিত্তিতে যে পদ্ধতির রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা মুসলমানদের জন্য কি পরিমাণ ধ্বংসাত্মক হবে। সেই গ্রন্থের শেষাংশে আমি স্বয়ং দেশ বিভাগের চিন্তাধারা পেশ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, যদি অখন্ড ভারতে মুসলমানদের নিরাপত্তার কোন ব্যবস্থা না হয়, তবে বিভক্তি ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। এ প্রসঙ্গে আমি শুধু বিভক্তিকরণের পরিকল্পনাই পেশ করিনি, বরং এ প্রস্তাবও উপস্থাপন করেছিলাম যে, অধিবাসী বিনিময়ের ব্যবস্থাও সেই সাথে করা হোক।

সবচেয়ে বেশী সমালোচনা করা হয়েছে "সিয়াসী কাশমাকাশ" ৩য় খন্ডের উপর। যা আমার ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত রচনাসমূহের সমষ্টি। পূর্বাপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এই বই এর কিছু বক্তব্য উদ্ধৃত করা হয় এবং তৎকালীন প্রেক্ষাপটের প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে তার সারমর্ম এভাবে বের করা হয় যে, আমি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধী। অথচ আসল ঘটনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। যা আমি সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

যখন মুসলিম লীগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে, তারা দেশ বিভক্তির জন্য আন্দোলন করবে, তখন আমার সামনে দু'টি প্রশ্ন এত গুরুতর হয়ে দেখা দেয় যে, আমি আমার রাতের ঘুম হারাম করে তা নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করতাম।

প্রথম প্রশ্ন হলো, আল্লাহ না করুন যদি দেশ বিভক্তির আন্দোলনে মুসলিম লীগ ব্যর্থ হয় এবং দেশ ভাগ না হয়, তখন মুসলমানদের কি পরিণতি দাঁড়াবে? সে সময় তো দূরের কথা, ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকেও এটা নিশ্চিত ছিল না যে, পাকিস্তান হবেই। অপরদিকে একথা একজন সাধারণ মানুষও জানে যে, যে দল কোন উদ্দেশ্যে লড়াই করে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়, তার পক্ষে পুনরায় সে দেশে কাজ করার সুযোগ থাকে না। এ অবস্থায় একটি বিকল্প প্রতিরোধ ব্যূহ (Second defence line) আবশ্যক ছিল। যেন আল্লাহ না করুন, যদি তারা উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয়, তবে দ্বিতীয় এমন একটি দল তৈরী থাকে, যারা মুসলমানদের সামাল দেবে। এ উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাসে আমি 'জামায়াতে ইসলামী' কায়েম করি। আমি যদি পাঁচ ছয়শ' লোকের একটি দল আলাদাভাবে উল্লেখিত উদ্দেশ্য সাধনে সুশৃংখল ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করি, যারা পরবর্তীতে কাজ করতে পারে। তবে এটা কি কোন অপরাধ ছিল, যে কারণে আজ আমাকে শাস্তি দেয়া হবে?

দেশ বিভক্তির সময় জামায়াতের সর্বমোট রুকন সংখ্যা ছিল ৬২৫ জন। যার মধ্যে ২৪০ জন ভারতে থেকে যায়। অবশিষ্ট ৩৮৫ জন থাকে পাকিস্তানে। এ স্বল্প সংখ্যক লোকের পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নেয়া বা না নেয়ায় বিশেষ কিছু যেতো আসতো না। কিন্তু সে সময় এ লোকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যদি একটি সুশৃংখল জামায়াতে পরিণত করা না হতো, তবে বর্তমানকালের মানুষ সম্ভবত এর অস্তিত্ব অনুভব করতে পারতো না। কিন্তু ভবিষ্যতের ঐতিহাসিক যখন ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ইতিহাস নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করবে, তখন তারা এর প্রকৃত তথ্য জানতে পারবে।

দ্বিতীয় যে প্রশ্নটি আমার সামনে ছিল, তা হলো, যদি দেশ ভাগ হয়, তবে ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের দশা কি হবে এবং পাকিস্তানে ইসলামের অবস্থা কি হবে? ভারতে থেকে যাওয়া মুসলমানদের সম্পর্কে বলা চলে যে, দেশ বিভক্তির পর তাদের জন্য কিছু করা মুসলিম লীগের পক্ষে সম্ভব হতো না। তেমনিভাবে কংগ্রেসী মুসলমানদের পক্ষেও এটা সম্ভব ছিল না যে, তারা মুসলমানদের জন্য কোন কাজে আসতে সক্ষম হবে। আমি ১৯৪৭ সালের শুরুতেই একথা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি যে, কংগ্রেসী মুসলমানদের হিন্দুস্তানে সেই মর্যাদাও থাকবে না, যা ইংরেজ আমলে কোন সময় খান বাহাদুরদের ছিল। এজন্যই এমন একটি সুশৃংখল জামায়াত মওজুদ থাকা

অত্যাবশ্যকীয় ছিল যারা বিভক্তির পর হিন্দুস্তানের মুসলমানদের সামাল দিতে পারে। তেমনিভাবে একটি সুদৃঢ় জামায়াত পাকিস্তানের জন্যও প্রয়োজন ছিল, যেন তারা দেশ ভাগের পর মুসলিম রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরের প্রচেষ্টা চালাতে পারে। পাকিস্তান আন্দোলনে যারা অগ্রণী ভূমিকায় ছিল, তাদের কার্যকলাপ দেখে প্রত্যেক বিবেকবান লোকই এটা বুঝতে পেরেছিল যে, এরা একটি জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে তুলবে ঠিকই, কিন্তু এদের মধ্যে সেই যোগ্যতাও নেই কিংবা এদের ভেতর সেই আগ্রহ বা প্রস্তুতিও নেই, যা দ্বারা বুঝা যায় যে, এরা প্রকৃতপক্ষে এ দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করবে। প্রয়োজন ছিল পূর্ব থেকে এমন একটি যোগ্য দল প্রস্তুত থাকার, যারা ইসলাম থেকে বিপথগামীদের তৎপরতা রোধ করে দেবে এবং এ রাষ্ট্রের মোড় ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে দেবে। সে সময়ে যা কিছু আমার অনুমানে এসেছিল তা আমি স্পষ্টভাবে লিখেছি। আজ ষোল বছরের ইতিহাস একথার সাক্ষী যে, তখন আমি যেসব আশংকা ব্যক্ত করেছিলাম, তার প্রত্যেকটি সত্য হয়ে মানুষের সামনে দেখা দিয়েছে। একথা আমি ১৯৩৬ সালে বলেছিলাম। আজ তেইশ বছর পরও ঘটনাসমূহ আমার সেই অনুমানের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। জামায়াতে ইসলামীর অস্তিত্ব যাদের কাছে তিক্ত মনে হয়, তারা যা খুশী বলছে। কিন্তু বিগত তেইশ বছরের অবস্থাকে যারা নিঃস্বার্থভাবে ইসলামের একজন কল্যাণকামী হিসেবে দেখেছে, তাদের মন এ সাক্ষ্যই দেবে যে, যদি জামায়াতে ইসলামী এখানে প্রতিষ্ঠিত না থাকতো, তবে যে ফিতনার ঝড় এখানে উঠেছিল, তার মুকাবিলা করার মতো কেউ থাকতো না। এটা একমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ যে, দেশ বিভক্তির পূর্বেই জামায়াত এমনই একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হয়েছিল যে, বিগত তেইশ বছরে বিরোধী শক্তিসমূহ এবং সরকার তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও তার কোন বিপর্যয় ঘটাতে সক্ষম হয়নি। ঐ সমস্ত লোকের হাতে ইসলামের যে শোচনীয় পরিণতি হয়েছে এবং যে সকল ক্ষেত্র থেকে ইসলামকে বিদূরিত করা হয়েছে, তা আজ আর কারো অজানা নেই। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে পূর্ব অনুমানের ভিত্তিতেই আমি সেই জামায়াত প্রতিষ্ঠা করেছিলাম, যা আজ জামায়াতে ইসলামী নামে প্রত্যেকের কাছে পরিচিত। আজ আমি এসব অপবাদে ঘাবড়ে গিয়ে একথা বলবো না যে, আমি ভুল করেছি। বরং আল্লাহর অনুগ্রহে পূর্ণ গর্বের সাথে আমি একথা বলবো যে, আমি যা কিছু অনুমান করেছিলাম, হুবহু সেরকম অবস্থাই সৃষ্টি হয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমি যা করেছি, সেটাই আমার করা উচিত ও কর্তব্য ছিল। আমি যদি তা না করতাম তবে সেটাই হতো ভুল।"

উদ্ধৃত অভিযোগের জবাব

প্রশ্ন : বামপন্থী সাংবাদপত্র ও তাদের সমমনা তথাকথিত ধর্মীয় গোষ্ঠীসমূহ আপনার বিরুদ্ধে প্রতিদিন চরম ঘৃণ্য এবং অভদ্রজনোচিতভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছে। অসংখ্য গালি দিয়ে চলেছে এবং ভিত্তিহীন ও অতি নিম্নমানের অপবাদ আরোপ করছে। এমনকি আপনার অত্যন্ত অশোভন কার্টুন তৈরী করছে। এভাবে সেইসব সরলমতি মানুষকে বিভ্রান্ত এবং তাদের মনে আপনার সম্পর্কে খারাপ ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে—যারা আপনার মূল চিন্তাধারা সম্পর্কে অজ্ঞ। এ ধরনের অমানুষিক ধৃষ্টতাপূর্ণ অপপ্রচার নাকচ করার জন্য আপনি এ পর্যন্ত কোন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন কি?

উত্তর : আমার সংগে কেউ অভদ্রজনোচিত পন্থায় লড়াই করলে, আমি তার সাথে ভদ্রতার মাধ্যমে মোকাবিলা করার পদ্ধতি বেছে নিয়েছি। আমি এ জাতিকে পরীক্ষা করতে চাই। এ জাতি শেষ পর্যন্ত সৎ লোকদের কদর করে, না অসৎ লোকদেরকেই মাথায় তোলে। কখনো কখনো আমি ভীষণ অবাক হয়ে যাই যে, যে সমস্ত বক্তব্য-বিবৃতি থেকে পূতিগন্ধময় অপপ্রচার উছলে পড়ে, ঐ সমস্ত জিনিস লোকেরা কিভাবে শুনতে ও পড়তে পারে? কোন মানুষের মধ্যে যদি মনুষ্যত্বের সামান্যতম অনুভূতিও বিদ্যমান থাকে, তবে এ ধরনের কথাবার্তায় প্রভাবিত হওয়া তো দূরের কথা, উল্টো তার অন্তরে ঐ সব লোকদের প্রতি ঘৃণার সৃষ্টি হওয়ার কথা। এরপর মিথ্যা অভিযোগ সম্পর্কে বলা যায়, এর সবগুলোর জবাবই আমাদের প্রকাশিত বইপত্রে বিদ্যমান রয়েছে। আপনাদের কাজ হলো, যে ব্যক্তিই কোন মিথ্যা অভিযোগের দ্বারা প্রভাবিত হবে, আপনারা তাকে প্রকৃত অবস্থা অবহিত করবেন।

সমাজতন্ত্র

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর পরিকল্পনা কি এটা নয় যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মত ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান নির্মূল করে এমন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অপকারিতা বিদূরিত হবে? বিশেষত এ হাদীসের সংগে সংগতি রেখে জবাব দিন যে, "দারিদ্র্য মানুষকে কুফরের নিকটবর্তী করে দেয়।"

উত্তর : আমাদের দৃষ্টিতে প্রথমত সমাজতন্ত্র বাস্তবে কোন অর্থ-ব্যবস্থাই নয়। বরং এটি একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হচ্ছে, সমগ্র জাতির উৎপাদনের উপকরণসমূহ ব্যক্তিমালিকানা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয়

তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসা। একথা সুস্পষ্ট যে, এটা কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচী নয় বরং রাজনৈতিক কর্মসূচী। যারা সমাজতন্ত্র সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তারাও একথা স্বীকার করেছেন যে, সমাজতন্ত্র কোন অর্থনৈতিক বিধান দেয় না। বরং প্রকৃতপক্ষে এটি রাজনৈতিক কর্মসূচী দেয়। সমাজতন্ত্র বলে যে, সর্বহারা মানুষের নামে একনায়কতন্ত্র কায়েম করা হোক এবং উৎপাদন উপকরণ জোরপূর্বক ব্যক্তির অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রের সামগ্রিক অর্থনৈতিক জীবনকে নিজ নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত করা হোক।

দ্বিতীয় কথা হলো, সমাজতন্ত্র যদি একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হয়েও থাকে, তবু আপনি এর দর্শন, আকীদা–বিশ্বাস এবং নৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না। খোদ সমাজতন্ত্রীরাও একথা প্রকাশ্যভাবে বলে যে, আল্লাহ, রিসালাত এবং আখিরাতকে মেনে সমাজতন্ত্রের উপর টিকে থাকা সম্ভব নয়। একজন সমাজতন্ত্রীর জন্য অবশ্য কর্তব্য হলো, তাকে ধর্ম অস্বীকার করতে হবে। এ কারণে যে সমস্ত দেশে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় আল্লাহ বিরোধী অভিযান (Anti God campaigns) চালানো হয়। কারণ তারা এটা মনে করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মগজ থেকে আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) এবং আখিরাতের চিন্তাধারা সরানো না যাবে, ততক্ষণ সমাজতন্ত্র বিজয়ী হতে পারবে না। সুতরাং মুসলমান থেকেই সমাজতন্ত্রের শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের কল্পনা করাটা সম্পূর্ণ ভুল। আপনি যখনি সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা চালু করতে চান, ইসলামের সমস্ত বিধান পদদলিত করেই এটা করতে পারেন। ইসলামী আদর্শের অনুসারী হয়ে আপনি তা প্রবর্তিত করতে পারবেন না। কারণ সমাজতন্ত্রের বক্তব্য হলো, ভূ–সম্পত্তি জনগণের মালিকানা থেকে বিনিময় ছাড়াই ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং এজন্য যতো প্রাণ সংহারের প্রয়োজন হোক না কেন, তাতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করা হবে না। রাশিয়ায় ঐ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়, সে ইতিহাস কারো কাছে গোপন নয়। প্রশ্ন হলো, মুসলমান হয়ে এবং হাদীসের অনুসারী হিসেবে আপনি কিভাবে এ যুলুম করতে পারেন? যে পর্যন্ত আপনি আল্লাহ, আখিরাত এবং রিসালাতকে অস্বীকার না করবেন ততোক্ষণ পর্যন্ত এ অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন না। এ অর্থব্যবস্থা শুধুমাত্র তারাই গ্রহণ করতে পারে, যারা বলতে পারে যে, দেশের কল্যাণে আমি যে দর্শন খাড়া করেছি এবং যে আদর্শ তৈরী করেছি, আমি তা বলপূর্বক প্রবর্তন করবো, জনগণ এতে রাজী হোক বা না।

হোক। এ উদ্দেশ্য পূরণে যত যুলুম, প্রতারণা ও মিথ্যাচার প্রয়োগের প্রয়োজন হবে, সমাজতান্ত্রিক নীতিমালায় তা সবই বৈধ, বরং প্রকৃত নৈতিকতা। ইসলাম ত্যাগ না করে আপনি কি সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, এর আকীদা বিশ্বাস এবং অর্থব্যবস্থা বেছে নিতে পারেন? অতপর বলা হয়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সাম্য কায়েম হবে। আমার জানা মতে সম্ভবত পৃথিবীতে এতোবড় মিথ্যা কথা আজ পর্যন্ত বলা হয়নি। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে গিয়ে দেখুন, বাস্তবে কি সেখানে সমান অধিকার পাওয়া যাচ্ছে?

স্বয়ং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বই পত্রই একথার সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, সেখানে মোটেই সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত নেই। সমাজতন্ত্র একদা এ দাবী করে যে, প্রত্যেকের নিকট থেকে দক্ষতা অনুযায়ী কাজ নাও এবং প্রত্যেককে তার প্রয়োজন মোতাবেক পারিশ্রমিক দাও। কিন্তু এ দর্শন সে কবেই ত্যাগ করেছে। বরং এখন এ দর্শনকে অসমাজতান্ত্রিক বলে মনে করা হয়। স্টালিন তো এও বলেছিল যে, সে ব্যক্তি সমাজতন্ত্রের শত্রু, যে বলে, পারিশ্রমিক প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে সমতা কায়েম করা উচিত। সুতরাং একথা বলা মিথ্যা ও ধোঁকাবাজী ছাড়া আর কিছুই নয় যে, সমাজতন্ত্র এলে সমান অধিকার কায়েম হবে। এ যাবত সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে কোথাও সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

كاد الفقران يكون كفرا -এ হাদীসটির অর্থ হলো, মানুষ যখন চরম ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে, তখন কখনো তার ঈমান পর্যন্ত বিপন্ন হয়। এর দাবী হলো, মুসলিম সমাজ থেকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য বিদূরিত করার প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কিন্তু ইসলাম কি আপনাকে এ ক্ষুধা-দারিদ্র্য দূর করার কোন বিধান দেয়নি যে, এ কারণে আপনি কোন অনৈসলামিক ব্যবস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়বেন। ইসলাম যেখানে এ সমস্যার উত্তম সমাধান পেশ করেছে, সে ক্ষেত্রে লেনিন, মার্কস অথবা মাও সেতুংয়ের নিকট ভিক্ষা চাওয়ার কি দরকার আপনার?

সহিংসতার অভিযোগ

প্রশ্ন : কোন কোন মহল জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পন্থা প্রয়োগ ও চরমপন্থী হওয়ার অভিযোগ আরোপ করে। এ অভিযোগ কতোটা ঠিক?

উত্তর : কোন ব্যক্তি বিগত তেইশ বছরের ইতিহাসে এমন কোন একটি উদাহরণ পেশ করুক যে, জামায়াত কখনো সন্ত্রাস বা বল প্রয়োগ করেছে

অথবা হিংসাত্মক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পুরো তেইশ বছরে এর একটি দৃষ্টান্তও কেউ উপস্থাপন করতে পারবে না। জামায়াতের গঠনতন্ত্রে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, সংবিধান অনুসারে আমরা আইনসংগত এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতেই কাজ করে যাবো।

জামায়াতে ইসলামী এমন একটি দল, যা স্বীয় সংবিধান পরিপন্থী কাজ কখনো করে না। যদি এর কোন একজন রুকন জামায়াতের গঠনতন্ত্রের বিপরীত কিছু করতে চায়, তবে তাকে সর্বপ্রথম জামায়াত থেকে পদত্যাগ করতে হবে। এই লাহোর শহরে যখন তাশখন্দ ঘোষণার বিরুদ্ধে ন্যাশনাল কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, সেখানে জামায়াতের একজন রুকন আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব পেশ করতে চাইলে জামায়াত তাকে পরিষ্কারভাবে একথা জানিয়ে দেয় যে, আপনার এ প্রস্তাব যেহেতু আমাদের সংবিধান পরিপন্থী, এজন্য জামায়াতের রুকন থাকা অবস্থায় আপনি তা পেশ করতে পারবেন না। শেষ পর্যন্ত তাকে জামায়াত থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছে। এরপরই তিনি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রশ্ন হলো, যে দল অহিংস পন্থায়ও আইন অমান্য করতে প্রস্তুত হয় না, সে দল হিংসাত্মক পন্থায় আইন অমান্য কি করে করতে পারে? প্রকৃতপক্ষে যারা নিজেরাই সহিংস আন্দোলন ও সন্ত্রাস করে, সন্ত্রাসের প্রকাশ্য মহড়া চালায় এবং সন্ত্রাসের পথেই বিপ্লব ঘটাতে চায়, তারাই আমাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও সন্ত্রাসের অভিযোগ আরোপ করে নিজেদের সহিংস ও সন্ত্রাসী চরিত্রকে ঢেকে রাখে। এর উদাহরণটা হলো, চুরি করার পর চোরের নিজেই চোর চোর বলে চিৎকার শুরু করে দেয়া।

চরমপন্থী হবার অভিযোগটা একটি নতুন অভিযোগ হিসেবে শওকতে ইসলামের মিছিলের পর থেকে আরোপ করা শুরু হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, কেউ গেরিলা যুদ্ধের ঘোষণা দিলে সেটা চরমপন্থী ভূমিকা পালন করা হয় না। অথচ এথেকে আত্মরক্ষার জন্য জাতিকে প্রস্তুত করাটা চরমপন্থার শামিল। যারা এটাকে বাস্তবে চরমপন্থা বলে মনে করে এবং তাদের কাছে মধ্যপন্থা এটাই যে, যখন দেশে প্রচন্ড বিদ্রোহ সৃষ্টি করার প্রস্তুতি নেয়া হবে, এমতাবস্থায় আমরা বসে তামাশা দেখবো। তাদের কাছে এ মধ্যপন্থা কল্যাণকর হতে পারে। কিন্তু জামায়াত এ রকম মধ্যপন্থার পক্ষপাতী নয়।

[সাপ্তাহিক এশিয়া লাহোর, ৯ আগষ্ট, ১৯৭০]

শওকতে ইসলাম
(ইসলামী গণজাগরণ দিবস)

দীনী কিংবা জাতীয় বিষয়ে আমি যাকেই কোন ভুল করতে দেখি, স্বয়ং তার পরিণাম চিন্তাই আমাকে বাধ্য করে দুনিয়াতেই তাকে সংশোধন করবার চেষ্টা করতে। আমার মতে প্রত্যেক মুসলমান, বিশেষ করে তাদের উলামা এবং নেতৃবৃন্দের এই অধিকার আমার উপর রয়েছে, আমি যেন তাদেরকে সুস্পষ্ট ভ্রান্তিসমূহ থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করি।

•

সম্মানিত সাথী ও উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ!

আমি সর্বপ্রথম মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি এজন্য যে, ৩১ মে তাঁরই অনুগ্রহে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান দলমত ও বিবাদ-বিসম্বাদ উপেক্ষা করে একই উম্মাহ হিসেবে একত্রিত হয়েছে। সারাদেশে তারা বিরাট আকারের সমাবেশ করে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, এই দেশের মুসলমানরা ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতবাদ মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। এই সমাবেশে কোন দল বা উপদল আত্মপ্রচারের চেষ্টা করেনি। তারা নিজেদের কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে প্রমাণ করেছে যে, মুসলমানরা একটি মাত্র উম্মাহ। কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহই তাদের ঐক্যের ভিত্তি। মুসলমান হিসেবে তাদের সিদ্ধান্ত হলো, তারা যে কালেমার প্রতি ঈমান রাখে, নিজেদের দেশে তারা তার পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখতে চায়। পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী ব্যবস্থা তাদের উদ্দেশ্য নয়। সমাজতন্ত্রের সাথেও তাদের কোন সম্পর্ক নেই। এই সমস্ত ভ্রান্ত মতবাদের কোনটাই তারা পছন্দ করে না।

এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ যে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইসলামের স্বপক্ষে এই উদ্দীপ্ত আবেগ-ঐক্যের প্রদর্শনী হয়েছে। শহরের লোকেরা ছাড়াও দূর গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষও এই সমাবেশে অংশগ্রহণ করেছে। প্রায় দু'লক্ষ লোক শওকতে ইসলামের এই সমাবেশে শরীক হয়েছে। এই সমাবেশ শুধু দেশের ভেতরে অবস্থানরত ইসলামের শত্রুদেরকেই নয়, বরং ইসলামের বিদেশী শত্রুদেরকেও হুঁশিয়ার করে দিয়েছে যে, এখানকার মুসলমানরা অচেতন নয়। এরা কোন নিষ্প্রাণ মৃত জাতি নয়, বরং তারা একটি জীবন্ত, জাগ্রত ও চৌকস জাতি। তারা ভালভাবেই লক্ষ্য রাখছে, দেশে কোন্ মতবাদের আমদানী ঘটছে। তারা সর্বশক্তি দিয়ে এই বাতিল মতবাদকে প্রতিহত করার বলিষ্ঠ সাহস রাখে।

ইসলামের চরিত্র এবং সমাজতন্ত্রের চরিত্র

মুসলমানদের এই সমাবেশে উন্নত নৈতিক প্রেরণা সক্রীয় রয়েছে। সভ্যতা ও ভদ্রতা বিবর্জিত কোন বক্তব্য প্রদান করা হয়নি। কারো জান-মালের প্রতি হুমকি সৃষ্টি হয়নি। কোন অশালীন এবং ভুল বক্তব্য শ্রুতিগোচর হয়নি। কারো

বিরুদ্ধে ধ্বনি উচ্চারিত হয়নি। কেবল উচ্চস্বরে আল্লাহর কালেমা ধ্বনিত হচ্ছিল। মুসলমানরা ন্যায়পন্থায় নিজেদের আন্তরিক আবেগ প্রকাশ করছিল। এটা আল্লাহরই দয়া যে, তিনি মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইসলামী চরিত্রের সমাবেশ করিয়ে দেখিয়ে দিলেন, কেবলমাত্র ইসলামই শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে। এ দেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হলে মানুষের জান-মাল, সম্মান ও প্রতিপত্তি সুরক্ষিত থাকবে। কারো জন্য ভীতির কোন কারণ থাকবে না। আল্লাহ তায়ালার আরো একটা অনুগ্রহ এই যে, যারা এই দীনের মুকাবিলায় ভিন্ন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তিনি পাঁচ দিনের মধ্যেই দেখিয়ে দিলেন, এরা কি ধরনের ভাষা, চরিত্র ও কর্মকান্ডের অধিকারী? যদি তারা ক্ষমতায় এসে যায়, তাহলে তাদের হস্তক্ষেপ থেকে কারো জান-মাল ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা পাবে না। আল্লাহর একটা হিকমত হলো, তিনি তাঁর দীনের বিরুদ্ধবাদীদের মুখোস নিজেই উন্মোচন করেছেন এবং সেটা যথা সময়েই করে থাকেন। জগতবাসী স্পষ্টভাবেই দেখে নিয়েছে যে, ইসলামের অনুসারীদের চরিত্র কেমন, আর লেনিন ও কার্ল মার্কসের অনুসারীরাই বা কি ধরনের চরিত্র ও কর্মকান্ডের অধিকারী।

আল্লাহর পথে পরীক্ষার পর্যায়

আমাদের অনেক শুভাকাংখী রয়েছেন, যারা আমাকে ভালবাসেন এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথেও আন্তরিক সম্পর্ক রাখেন। তারা পরশু (৫ জুন) থেকে বরাবরই বলে আসছেন যে, যেভাবে পরশুর (৫ জুন) মিছিলে হামলা করা হয়েছে এবং বরাবরই আমার উপর, জামায়াতে ইসলামীর উপর এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক সংগঠন ও নেতৃবৃন্দের উপর যেভাবে হামলা করা হচ্ছে, তাতে তাদের ক্রোধ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। তারা এই জঘন্য ধৃষ্টতা ও পৈশাচিক তান্ডবের জবাব দিতে চায়। আমি তাদেরকে বলতে চাই যে, এটাই তো সেই অবস্থা, যে অবস্থায় আল্লাহর পক্ষ থেকে এই পরীক্ষা হয় যে, আপনি তার দীনের জন্যে কি পরিমাণ ধৈর্যধারণ করতে পারেন? কুরআনে করীমে আল্লাহ তাঁর নবীকে সম্বোধন করতঃ মুসলমানদেরকে হেদায়াতের এই বাণী শুনিয়েছেন-

واصبر على ما يقولون অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা যা বলছে, সেটার উপর ধৈর্যধারণ করুন। আরো অগ্রসর হয়ে আল্লাহ বলেন, وهجرهم هجرا جميلا অর্থাৎ অত্যন্ত ভদ্রজনোচিতভাবে তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। তাদের

গালীর জবাবে তোমরাও তাদেরকে গালী দেবে না। তাদের দুর্বৃত্তপনার জবাবে তাদের সাথে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়বে না। নীরবে তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। গালাগালীর জবাবে আপনার এই কর্মপন্থা মানুষের নিকট গোপন থাকবে না। জগতবাসী আপনার সজ্জন সুলভ আচরণও দেখে নেবে এবং তাদের অসভ্যপনাও যাচাই করে নেবে। আমার উপদেশ হলো, আপনারা তাদের কোন অশালীন উক্তি বা বক্তব্যের প্রতি কর্ণপাত না করে নীরবে নিজের কাজ করে যান। ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, যারা পথে পথে গালী দিয়ে বেড়ায় এবং নিজেদের সংবাদপত্রে অশালীন প্রবন্ধাদী লেখে এবং কুৎসা ও অপবাদ রটনার কোন সুযোগ হাত ছাড়া করে না, মানুষ তাদের উপর বিরূপ হয়ে পড়বে। আপনার মধ্যে এবং তাদের মধ্যে তো পার্থক্য এটাই। খোদা না করুন, যদি আপনিও তাদের সমপর্যায়ে এসে গালীর জবাব গালী দিয়ে দেয়া শুরু করেন, তাহলে এই পার্থক্য থাকবে কি করে? ভাল-মন্দ প্রভেদ করার সুযোগ মানুষের হবে কি ভাবে? এমতাবস্থায় যদি কোথাও ইসলামের অনুসারীদের দ্বারা কোন অধৈর্যমূলক কর্মকান্ড ঘটে যায়, তাহলে সেটা ইসলামের জন্য লাভজনক প্রমাণিত হবে না।

সমাজতন্ত্রীদের কর্মপন্থা

আপনাদের প্রতি আমার পরবর্তী বক্তব্য এই যে, আমাদের দেশের বর্তমান সময়টা খুবই নাজুক ও সংকটপূর্ণ। এই সংকটপূর্ণ সময়ে যারা পাকিস্তানের শান্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তা চায়, সর্বত্র আল্লাহর নাম প্রতিষ্ঠিত দেখতে চায়, তাদেরকে অবিরাম কাজ করতে হবে। একদিকে সেই সমস্ত লোক রয়েছে, যারা মুসলিম উম্মাহর উপর অনৈসলামিক মতবাদ জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে চায়। তারা নির্বাচনের মাধ্যমে সফল হওয়ার আশা পোষণ করে না।

বারবার মুসলমানদের পক্ষ থেকে যেসব ক্রোধ বা উত্তেজনা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থন অর্জন করার আশা তাদের নেই। বিশ্বের কোথাও তারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে, এমন নযীর নেই। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোথায়ও ক্ষমতায় এসে থাকলেও পরবর্তীতে তারা সেই পদ্ধতিতে বিদায়ও নিয়েছে। বল প্রয়োগে ক্ষমতা দখলই তাদের ইচ্ছা। এই ইচ্ছা পূরণার্থে আইয়ূব খানের একনায়কত্বের মাধ্যমে তারা নিজেদের ভিত মযবুত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। তাদের বাসনা ছিল যে, একনায়কত্ব ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকুক, যতক্ষণ তাদের বিপ্লবের জন্য

ময়দান সম্পূর্ণরূপে তৈরি না হয়। যখন তারা অনুভব করবে যে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তাদের অনুকূলে, তখন একনায়কত্বের গদী উল্টে দিয়ে নিজেরাই ক্ষমতাসীন হবে। ইন্দোনেশিয়ায় তারা এই কূটকৌশলই অবলম্বন করেছিল এবং সোকার্নোকে নিজেদের জালে জড়িয়ে নিজেদের পরিকল্পনা অনুযায়ী ঠিক সময়ে বিপ্লব ঘটিয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ তায়ালা ইন্দোনেশিয়াকে তাদের জবর দখল থেকে রক্ষা করেছেন এবং তাদের সকল পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

নির্বাচন নয়, বিপ্লব

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পরিণতিতে আইয়ুব খানের একনায়কত্ব পাকিস্তানে যখন শেষ হওয়ার পথে, ঠিক তখন তারা জ্বালাও, পোড়াও, ঘেরাও ও মারধরের মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা অকৃতকার্য করে দেয়। শেষ পর্যন্ত দেশে পুনরায় মার্শাল'ল কার্যকর হয়ে যায়। সেই থেকে তারা রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করার জন্য ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে আসছে। দেশে প্রতিনিয়ত ধর্মঘট হরতাল করাতে পারলে শ্রমিকদের মধ্যে অস্থিরতা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হবে এবং বিপ্লবের পথও হবে প্রশস্ত। এই ছিল তাদের ধারণা। সেই অনুসারে এতদিন চেষ্টা চালানোর পর এখন তারা প্রকাশ্যে গেরিলা যুদ্ধের ডাক দিয়ে বসেছে। তারা এই ঘোষণাও দিয়েছে যে, তারা বন্দুকের নলের মাধ্যমে বিপ্লব ঘটাবে। তারা নির্বাচন চায় না, চায় বিপ্লব। নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হয়ে তারা গোটা দেশে অনির্দিষ্টকালের জন্য সর্বাত্মক হরতাল শুরু করেছে এবং ১লা জুন থেকে জ্বালাও পোড়াও আর ঘেরাও এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই সমস্ত কমিউনিষ্ট এবং সমাজতন্ত্রীদের কর্মপন্থা হলো, "ঘরে ঢিল ছুড়ে দেখ, যদি মানুষ জাগ্রত থাকে, তাহলে পিছু হটে যাও। ঘুমন্ত থাকলে সামনে অগ্রসর হও।" এই কর্মপন্থাকে সামনে রেখে যখন তারা দেখলো যে, ১লা জুনের সিদ্ধান্তের কারণে মুসলমানদের মধ্যে চাঞ্চল্য ও বিরক্তি সৃষ্টি হয়েছে এবং নিজেদের দীনের হেফাযতের জন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, তখন তারা নিজেদের লংমার্চ কর্মসূচী বাতিল করে দেয়। তারপর তাদের জ্বালাও-পোড়াও এবং ঘেরাও এর কর্মসূচীর মধ্যে 'জ্বালাও-পোড়াও' বাদ দিয়ে কেবল ঘেরাও কর্মসূচী বাকি রাখে। যেন মুসলমানদেরকে এই বলে ধোঁকা দেয়া যায় যে, তারা সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। দেশের শান্তি শৃংখলা এবং মুসলমানদের আকীদা বা বিশ্বাসের সাথে এই চেষ্টা-সাধনার কোন সম্পর্ক নেই। পূর্ব পাকিস্তানে তো তারা বিশেষভাবে এই বলে মানুষদের

ধোঁকা দিতে চায় যে, তারা ঘেরাও এর ধারাবাহিক কর্মসূচী কেবলমাত্র চারিত্রিক সংশোধনের জন্য শুরু করেছে। তারা ঘুষখোর এবং জুলুমবাজ অফিসারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে। অথচ বিগত বছরগুলোতেও তারা যখন জ্বালাও-পোড়াও, ঘেরাও এবং হত্যাকাণ্ডের ন্যায় জঘন্য কর্মসূচী শুরু করেছিল, জীবন্ত মানুষকে বৃক্ষের সাথে বেঁধে হত্যা করা হয়েছিল, লোকজনসহ ঘরবাড়ী জ্বালিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল, তখনও তারা এই বলে সাফাই দেয়ার চেষ্টা করেছিল যে, যাদেরকে মারা হয়েছে তারা ছিল অত্যাচারী। অথচ চোর হোক বা ডাকাত হোক, তাদের শাস্তি দেয়ার কাজতো রাষ্ট্রের। মানুষ নিজে নিজেই যদি শাস্তি দেয়া আরম্ভ করে দেয়, তাহলে তাদের এ অভিযানে যে শুধু চোর আর ডাকাতই শাস্তি পাবে, সেটার নিশ্চয়তা কোথায়? এটাও তো সম্ভব যে, আগামীদিন কোন ব্যক্তি মসজিদে আযান দেবে, আর অন্য এক সম্প্রদায় ক্ষিপ্ত হয়ে তার চোখ উপড়ে ফেলবে এই বলে যে, আযান দেয়া আমাদের নিকট অপরাধজনিত কাজ। অর্থাৎ মানুষ যখন শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিজেরাই সামলানোর চেষ্টা করে, তখন কোন্‌টি অপরাধ আর কোন্‌টি অপরাধ নয়, তা নির্ণয় করা অসম্ভব। কোন সম্প্রদায়ের নিকট কালেমা পড়া অপরাধ হতে পারে। কোন সম্প্রদায় আযান এবং নামাযকে অপরাধ মনে করতে পারে। আবার কোন সম্প্রদায় এমন কর্মসূচীকেও ন্যায়বিচার মনে করতে পারে, যা অত্যাচারেরই ভিন্নরূপ মাত্র।

ঘেরাও : সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনুশীলনী

এ সময়ে ঘেরাও এর অভিযান দৃশ্যত নৈতিক এবং সামাজিক সংশোধনের নিমিত্তেই চালানো হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে অনুশীলনে অভ্যস্ত করার প্রচেষ্টা চলছে, সেটা নিরেট সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একটা অনুশীলন মাত্র। এর মাধ্যমে জনগণকে এরূপ ধারণা দেয়া হচ্ছে যে, রাষ্ট্র আমাদের কাছে অসহায়। জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই। তাই যে সময় ইচ্ছা, সেই সময়ে আমরা হরতাল করাবো। রাস্তার দ্রুতগামী গাড়ীকে আগুনে নিক্ষেপ করবো। ঘর-বাড়ী, কল-কারখনা এবং দোকানপাট জ্বালিয়ে দেব। জনগণকে রক্ষা করার মত কোন রাষ্ট্রই নেই। হালে সিদ্ধিরগঞ্জ পাওয়ার হাউস ঘেরাও করা হয়েছে। সরকার ঘেরাওকারীদের সম্মুখে আত্মসমর্পণ করে তাদের দাবীসমূহ মঞ্জুর করে নিয়েছে। নামেমাত্র দু'চারজন শ্রমিককে আইন ভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে। আইন ও স্বাভাবিক শান্তি-শৃংখলা ভঙ্গ করার মূল হোতাকে

জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করা হয়নি যে, তোমরা এমন অপরাধ করলে কিভাবে। যেমন আমি এমাত্র বলেছি যে, ঘেরাও এর অনুশীলন এজন্য, যেন প্রমাণ করা যায় যে, এখানে কোন সরকার নেই, এমন কোন আইন আদালত নেই, যা তাদেরকে শাস্তি দিতে পারে। মানুষের মধ্যে এই ঔদ্ধত্য সৃষ্টি করা হচ্ছে, যেন তারা সরকারী অফিসারের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে নিজেদের সম্মুখে নতিস্বীকারে বাধ্য করে। কোন চরিত্র এবং আইন কানুনই এই দেশে অবশিষ্ট নেই। আমার বুঝে আসছে না যে, এই সামরিক শাসন কোন ধরনের? দেশে মার্শাল' ল জারী করার শেষ পর্যন্ত সার্থকতা কি? বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে যেরূপ দুর্বলতা প্রদর্শন করা হচ্ছে, অতীতে দুর্বল থেকে দুর্বলতর কোন সরকারও এমন দুর্বলতা প্রর্দশন করেনি।

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা

পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার বিরামহীন প্রচেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জনৈক ব্যক্তিকে পি-আই এর জেলা ম্যানেজার করে চট্টগ্রাম প্রেরণ করা হয়েছে। কিন্তু সেখানে তাকে বিমান থেকে অবতরণ করতে দেয়া হয়নি। বলা হয়েছে যে, আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের একজন ব্যক্তিকেও সহ্য করতে রাজি নই। আগামীদিন এমন হতে পারে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন ব্যক্তিও যদি সেখানে যায়, তাহলে তাকেও সেখান থেকে ফেরত দেয়া হবে। আমার বক্তব্য হলো, অবস্থা যদি এ রকমই চলতে থাকে, তাহলে সম্ভবত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেব সেখানে গেলে তাকেও বিমান থেকে অবতরণ করার সুযোগ দেয়া হবে না। মনে হয় যেন সরকারের এহেন দুর্বলতার কারণে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ক্রমেই শক্তিশালী হচ্ছে।

অযোগ্য রাজনীতিবিদদের অস্তিত্ব : একটি বাড়তি সমস্যা

আরেকটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে অযোগ্য রাজনীতিবিদদের নিয়ে। এরা সবসময় নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বকে নিজেদের অধিকার মনে করে আসছে। ভবিষ্যতেও নিজেদের বিপুল ভূ-সম্পত্তি ও অঢেল নগদ অর্থের সুবাদে পুনরায় শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার আশা পোষণ করে। এভাবে আমরা তিন প্রকার ফিত্‌নার মধ্যে নিমজ্জিত। প্রথমটা হচ্ছে সমাজতন্ত্র, দ্বিতীয়টা হচ্ছে আঞ্চলিকতা ও প্রাদেশিকতা, তৃতীয়টা হচ্ছে সেই সমস্ত অযোগ্য

রাজনীতিবিদদের উপস্থিতি, যারা নিজেদের কর্ম দ্বারাই নিজেদের অযোগ্যতা প্রমাণ করেছে।

অবিরাম ও লাগাতর পরিশ্রমের প্রয়োজন

এমতাবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় কথা হলো, যারা ইসলাম এবং পাকিস্তানের শান্তি ও স্থিতিশীলতা চায়, তারা যেন এক মিনিট সময়ও বিশ্রাম গ্রহণ না করে। পরিস্থিতির পরিবর্তনের জন্যে নিজেদের জীবন যেন উৎসর্গ করে। এ সময়ে প্রয়োজন হচ্ছে বিরামহীন ও একটানা পরিশ্রমের। জামায়াতে ইসলামী একটি তহবিল গঠন করেছে। এর নাম পাকিস্তানের আদর্শ রক্ষা তহবিল। কিন্তু এতে চাঁদা আদায়ের গতি খুবই মন্থর। এই তহবিলের জন্য বড় বড় পুঁজিপতিদের নিকট যাওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং একজন সাধারণ মুসলমানের সাহায্যেই এ কাজ করতে হবে। যে ব্যক্তি পাকিস্তানের সংরক্ষণের জন্য আপনাকে আটআনা অথবা একটাকা প্রদান করবে, বুঝে নেন যে, সে ব্যক্তি আপনার দাবী ও প্রচেষ্টার সাথে একমত। বিন্দু বিন্দু জমা করে আমরা সাগর সৃষ্টি করতে পারি। তবে শর্ত হচ্ছে বিন্দু বিন্দু করে জমা করার জন্য আমাদেরকে ময়দানে বের হতে হবে। শুধু শহরেই নয়, বরং দূর গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ার এবং কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে। এ ব্যাপারে যদি কিঞ্চিত পরিমাণ অমনোযোগিতাও প্রকাশ করা হয়, তবে তার কুফলের হাত থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো না। খোদা না করুন, আগামী সংসদে যদি এমন ব্যক্তিবর্গ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, যারা ইসলামও চায় না, দেশের অখন্ডতাও চায় না, তাহলে ধরে নিন যে, এই মঙ্গল ভালাই নেই। মোটামুটি এ কয়টি কথাই আমি আপনাদেরকে বলতে চেয়েছিলাম।*

[সাপ্তাহিক এশিয়া, লাহোর, ১৪ জুন, ১৯৭০]

---

* ১৯৭০ সালের ৭ জুন বাদ আসর জামায়াতের কেন্দ্রীয় দফতরে কর্মীদের উদ্দেশ্যে মাওলানা মওদূদীর ভাষণ।

৫. ইসলামী আন্দোলন এবং বিরাজমান পরিস্থিতি

শওকতে ইসলাম বা ইসলামী গণজাগরণ সমাবেশ এবং ইসলামপ্রিয় দলসমূহ

প্রশ্ন ঃ তথাকথিত কিছু ইসলামী দলের শওকতে ইসলাম সমাবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকাটা কি একথাই প্রমাণ করে না যে, তারা দেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী থেকে কার্যত পিঠটান দিয়েছে? জামায়াতে ইসলামী যদি এদের সঙ্গে নির্বাচনী জোট গঠন করে, তবে কি এতে জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না?

উত্তর ঃ আমি চাই, এভাবে চিন্তা করার রীতির পরিবর্তন ঘটুক। কোন দল যদি কোন কারণে শওকতে ইসলাম সমাবেশে অংশগ্রহণ না করে থাকে, তবে তার অর্থ এ নয় যে, সে 'তথাকথিত ইসলামী দলে' পরিণত হয়ে গেছে এবং তাদের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়েছে। জামায়াত কর্মীদের বিশেষভাবে এরূপ চিন্তা করার রীতি পরিহার করা উচিত। যারাই ইসলামকে ভালবাসে, আমাদের কর্তব্য হলো তাদেরকে নিজেদের অধিকতর কাছে টেনে আনার চেষ্টা করা, নিজেদের কর্মপদ্ধতি দ্বারা দূরে ঠেলে দেয়া নয়।

জুনাগড় এবং পাকিস্তান

প্রশ্ন ঃ জুনাগড় রাজ্য পাকিস্তানে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু ভারত আক্রমণ চালিয়ে জোরপূর্বক তাকে দখল করে নেয়। জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এলে জুনাগড় ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করবে কি?

উত্তর ঃ আবেগ তাড়িত হয়ে কোন কোন সময় এমনসব দাবী করা হয়, যার ফলে নিজেদেরই সুনাম নষ্ট হয়। জামায়াতে ইসলামী এমন কোন দাবী করতে চায় না যে, তারা ক্ষমতাসীন হলে জুনাগড়কে ভারতের কবলমুক্ত করবে। এ মুহূর্তে আমাদের সামনে রয়েছে জম্মু–কাশ্মীরের স্বাধীনতা সমস্যা। কাশ্মীরী মুসলমানরা বিগত তেইশ বছর ধরে ভারতীয় শাসকদের অত্যাচারের শিকার। তাদেরকে যুলুমের এই থাবা থেকে মুক্ত না করা পর্যন্ত আমরা অন্য কোন অঞ্চলের স্বাধীনতার প্রতি দৃষ্টি দিতে পারি না।

নিসন্দেহে জুনাগড় নিজেকে পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিল। কিন্তু ভারত সরকার এ রাজ্যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার ছুতা দেখিয়ে বল প্রয়োগে এর উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারা আরো বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজ্যের মুসলমান শাসক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রাখে না। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যেহেতু ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি পছন্দ করে, সে কারণে আমরা এ রাজ্যকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করেছি। পক্ষান্তরে সেই সরকারই আবার কাশ্মীরের ডোগরা রাজা যখন নিজকে ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করে, তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীরী মুসলমানদের দাবীর কোন তোয়াক্কাই করেনি। আমাদেরকে সর্বপ্রথম ভারতের এ ভাওতাবাজী নস্যাৎ করতে হবে। কাশ্মীরী মুসলমানদের দাবী অনুযায়ী আমরা এ এলাকাকে স্বাধীন করতে পারলে পরে জুনাগড়ের ব্যাপারেও চিন্তা করবো।

আইয়ুব খানের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন

প্রশ্ন ঃ বর্তমান সরকার সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে 'ফিল্ড মার্শাল' পদবীর উপযুক্ত বিধিসম্মত সুযোগ–সুবিধা দিয়েছে। এ প্রসংগে আলোকপাত করুন।

উত্তর ঃ দুনিয়ার যাবতীয় সমস্যার উপর আলোকপাত করা তো আমার পক্ষে কষ্টকর। আইয়ুব খান ফিল্ড মার্শাল নিজেই হয়েছিলেন। বর্তমান সরকারও নিজেরাই এ ফায়সালা করেছে। সামরিক সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত আইনসংগত ও স্থায়ী মর্যাদা রাখে না। নির্বাচনের পর যে গণতান্ত্রিক সরকার ক্ষমতায় আসবে, সে এসব সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করতে পারবে।

সন্ত্রাসীচক্র এবং আমাদের কর্তব্য

প্রশ্ন ঃ সন্ত্রাসীচক্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। এদের মোকাবিলায় আমাদের কঠোর নীতি অবলম্বন করা উচিত নয় কি?

উত্তর ঃ যেসব শক্তি এ সময় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে, তারা যদি ধৈর্যহীনতার পরিচয় দেয় এবং তাদের সব কাজের মোকাবিলা করে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, তাহলে এ থেকে বিরোধী শক্তির উদ্দেশ্যই সফল হবে। আমাদের উদ্দেশ্য ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ বিরোধী শক্তি তো এটাই

মনে-প্রাণে কামনা করে যে, আমরা এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং উত্তেজনা সৃষ্টিকারী পরিস্থিতিতে অধৈর্য হয়ে সন্ত্রাসমূলক প্রতিরোধ তৎপরতায় অবতীর্ণ হই এবং চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে গুটিয়ে ফেলি।

আমরা এতটা ঐক্যবদ্ধ থাকতে চাই যেন সন্ত্রাসীচক্র ইসলামী শক্তিগুলোর ওপর আক্রমণ চালালে আমরা অসাড় হয়ে বসে না থাকি। কিন্তু আইন-শৃংখলা বিনষ্টকারী গোষ্ঠীকে প্রতিহত করা সরকারের দায়িত্ব। আমাদের কাজ হলো শুধু আত্মরক্ষা করা।

ধৈর্যের পরীক্ষা

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর দীন এবং আপনার প্রতি আমাদের প্রগাঢ় ভালবাসা রয়েছে। যখন আপনার ওপর কোন অপবাদ চাপানো হয়, তখন আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। মন চায় এসব অপবাদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেই। কিন্তু এগুলোকে কোন গুরুত্ব না দেয়ার জন্যে আপনি উপদেশ দিয়েছেন। আপনি আর কতকাল আমাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেবেন?

উত্তর ঃ যারা আল্লাহর দীনের খাতিরে আমাকে ভালবাসেন, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এর প্রতিদান দিন। যখন আমি নিজে অপবাদের শিকার হয়ে অধৈর্য হই না, তখন আপনারা কেন অস্থির হয়ে পড়েছেন। আমি গালী শুনি, পত্র পত্রিকায় পড়ি আর সেগুলো এক পাশে রেখে দিয়ে নিজের কাজে মনোনিবেশ করি। আপনারাও নিজ নিজ কাজ করে যান। এসব বাজে কথার প্রতি কান দেবেন না। আল্লাহ তায়ালা আমাকে যে সম্মান দান করেছেন, তা কেউ ছিনিয়ে নিতে পারবে না। আর যে মর্যাদা আমি লাভ করিনি, তাও আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ আমাকে দিতে পারবে না।

খেলাফতে রাশেদার যুগ

প্রশ্ন ঃ এ যুগেও কি খোলাফায়ে রাশেদীনের মত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব? এজন্য কতকাল সময় প্রয়োজন?

উত্তর ঃ আমাদের সমগ্র প্রচেষ্টা তো এটাই যে, আমরা অতি দ্রুত গতিতে খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগের কাছাকাছি পৌছে যাব। এ কাজে কতকাল সময় লাগবে, সে ব্যাপারে আমরা কিছুই বলতে পারব না। বান্দার কাজ হলো প্রচেষ্টা চালানো। ফলাফল আল্লাহর কুদরতের নিয়ন্ত্রণে। খেলাফতে রাশেদার যুগ স্বীয় মহিমায় এতই উন্নত যে, এভারেষ্ট জয় করাও তারচেয়ে সহজ। কিন্তু এ যুগের মানদন্ডে পৌছা ভীষণ কষ্টসাধ্য।

বস্তুত যদি কোন সমাজ খেলাফতে রাশেদার মানদণ্ডে নাও পৌছে বরং এর কাছাকাছি পৌছতে পারে তাহলেও গোটা বিশ্বে এর একটা নৈতিক প্রভাব পড়তে পারে এবং এই নৈতিক প্রভাবই তার বিজয়ের কারণ হয়ে দেখা দিতে পারে। খেলাফতে রাশেদার সমসাময়িক রাষ্ট্রসমূহ বস্তুগত দিক থেকে অনেক উন্নত এবং আড়ম্বরের অধিকারী ছিল, কিন্তু অবশেষে তারা পর্যুদস্ত ও বিজিত হয়। মুসলমান শাসকদের সরলতা, অনাড়ম্বর জীবন ও আল্লাহ ভীতির প্রভাব তৎকালীন বাদশাহদের মাঝে এমনভাবে ছড়িয়ে ছিল যে, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)'র ওফাতের পর রোম সম্রাট মন্তব্য করেছিলেন : "আমরা অনেক সাধক ও দরবেশ দেখেছি, কিন্তু এমন কোথাও দেখিনি, যিনি ক্ষমতার আসনে বসেও সাধক এবং দরবেশের জীবন বেছে নিয়েছেন।"

জামায়াতে ইসলামী এবং ভারতীয় মুসলমান

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতাসীন হলে ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যার সমাধান করবে কিভাবে?

উত্তর : আমাদের লক্ষ্য যদি শুধু নির্বাচনে জেতা হয়, তাহলে আমরা অবাধে এ দাবী করতে পারি যে, ক্ষমতায় এলেই আমরা ভারতের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের নাস্তানাবুদ করে ছাড়বো। অথচ আমরা বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে চাই। এমন দাবী করতে আমরা কখনোই প্রস্তুত নই, যা বাস্তবতা থেকে অনেক দূরে।

কোন মুসলমান যখন তার অপর ভাইকে কষ্টের মাঝে নিপতিত দেখে, তখন সে তা থেকে তাকে উদ্ধারের সাধ্যমত চেষ্টা করে। ইনশাআল্লাহ আমরাও আমাদের ভারতীয় মুসলমান ভাইদের হিন্দু-সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং ভারতীয় শাসকের যুলুম ও নির্যাতন থেকে বাঁচানোর সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালাবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি পাকিস্তানে একটি মজবুত ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম হয়, তাহলে ভারত এ ধরনের অত্যাচার ও অন্যায়ের সাহসই পাবে না।

জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য ও বৈদেশিক মুদ্রা

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্যের অনুবাদ কোন্ কোন্ ভাষায় হয়েছে। এগুলোর প্রকাশনায় যে অর্থাগম ঘটে, তা-কি ঐ সমস্ত দেশে ব্যয় হয়, না এর লব্ধ অর্থ দেশে আসে?

উত্তর : সবচেয়ে বেশী বই আরবী ভাষায়, অতপর তুর্কী এবং ফারসীতে প্রকাশিত হয়। আমরা এ বইগুলোর কোন রয়ালটি গ্রহণ করি না। এ কারণে অর্থ বিনিময়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। গ্রন্থ অনুবাদ ও প্রকাশনা তত্ত্বাবধানকারীকে আমরা এ পরামর্শ দিয়েছি যে, এগুলোর আয় থেকে যে অর্থ গ্রন্থকারের প্রাপ্য, তা আপনারা আমাদের পক্ষ থেকে দীনের প্রচার-প্রসারে ব্যয় করবেন। তুরস্কে এর রয়ালটির অধিকাংশই গ্রন্থ অনুবাদ খাতে ব্যয় করা হয়। অনেক জায়গায় আমাদের বইয়ের তরজমা হয়ে গেলেও আমরা তা পরে জানতে পেরেছি।

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচার

প্রশ্ন : পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের অভিযোগ, আমীরে জামায়াত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারের উল্লেখ করেন না।

উত্তর : পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে অবিচার হয়েছে, তা দূর করার জন্য আমরা আমাদের ঘোষণাপত্রে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় সংযোজন করে দিয়েছি। সেখানে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পশ্চাৎমুখীতা, দারিদ্র্য এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার জন্যে আমাদের কি করণীয় রয়েছে। আজকাল আমি খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য পেশ করছি, যেখানে কেবল নীতিগত বক্তব্যই দেয়া হয়েছে। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শুরুতে লাহোরে আমি যে বক্তব্য রেখেছি, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের আলোচনা পূর্ণাঙ্গরূপেই স্থান পেয়েছে। তবে পূর্ব পাকিস্তানের অভিযোগ বর্ণনা করাই যাদের সার্বক্ষণিক কাজে পরিণত হয়েছে, তাদের মোকাবিলা করা আমার সাধ্যাতীত।

জামায়াতে ইসলামীর রুকনিয়াত

প্রশ্ন : বিগত দিনে জনাব উমরাও খান এবং গুরমানী সাহেবের জামায়াতে ইসলামীতে যোগদানের খবর এসেছে। তারা কি নিয়ম মাফিক জামায়াতের রুকন হয়েছেন?

উত্তর : একথা সর্বজন বিদিত যে, কেউ জামায়াতে ইসলামীর সাথে পরিচিত হলে তখন সে মুত্তাফিক হয়। এরপর সে জামায়াতের সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কর্মসূচী এবং মেজাজ বুঝার চেষ্টা করে

এবং নিজেকে জামায়াতের মেজাজ অনুযায়ী ঢেলে সাজায়। তখন রুকন প্রার্থী হওয়ার পর্যায় সৃষ্টি হয়। আর যখন এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হওয়া যায় যে, সে যথার্থরূপে রুকন হওয়ার যোগ্য, তখন তাকে রুকন করা হয়। ছোট-বড় যে-ই হোক, সকলের জন্যই এ পর্যায়গুলো অতিক্রম করা অপরিহার্য।

হাতুড়ে ডাক্তার, না বিজ্ঞ চিকিৎসক

প্রশ্ন ঃ পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ধ্বংস করার দায়িত্ব পুঁজিপতিদের উপর বর্তায়। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আপনি সমাজতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে রেখেছেন?

উত্তর ঃ আপনি আমার গতকালের (১৩ই জুন নিশতর পার্কের) বক্তৃতা শুনে থাকলে আপনার স্মরণ হবে যে, আমি দেশের যাবতীয় দুঃখ কষ্টের দায়-দায়িত্ব সর্বপ্রথম পুঁজিপতি এবং উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাদের উপরই আরোপ করেছি।

একথা স্মরণ রাখবেন, পুঁজিবাদ এক ব্যাধির নাম। এর চিকিৎসার্থে হাতুড়ে ডাক্তার আর বিজ্ঞ চিকিৎসক দু'জনই এগিয়ে আসে। সমাজতন্ত্র একজন হাতুড়ে ডাক্তার আর ইসলাম একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক। বিজ্ঞ ডাক্তার বলছে, যদি তুমি হাতুড়ে ডাক্তার দ্বারা এ রোগের চিকিৎসা করাও, তবে তাতে রোগও সারবেনা, রোগীও মারা যাবে। গোটা জাতি এ ব্যাধি থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। হ্যাঁ, তুমি যদি আমার দ্বারা এ রোগের চিকিৎসা করাও, তাহলে রোগও নির্মূল হবে এবং জাতীয় স্বাতন্ত্র্যও বজায় থাকবে। আমি জাতিকে হাতুড়ে ডাক্তারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছি।

শরীয়তের দৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা

প্রশ্ন ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা হারাম কেন? অনুগ্রহপূর্বক সন্তোষজনক জবাব দিন।

উত্তর ঃ সমাজতান্ত্রিক মালিকানা বলতে সম্ভবত রাষ্ট্রীয় মালিকানা বুঝানো হয়েছে। যে ব্যক্তি এই মতবাদ গ্রহণ করেছে, সে ব্যক্তি মালিকানাকে সমস্ত অনাচারের মূল মনে করে। কুরআন সুন্নাহ অধ্যয়ন করেছে এমন ব্যক্তির

ভেবে দেখা উচিত যে, আল্লাহ তায়ালা কি সামাজিক জীবনের সকল অনাচারের জন্য ব্যক্তি মালিকানাকে দায়ী করেছেন, এবং তিনি কি এর ওষুধ স্বরূপ জাতীয়করণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন? কেউ যদি এটা বুঝে থাকে তাহলে সে কুরআন ও হাদীস থেকে এর দলীল পেশ করুক।

জাতীয়করণকে সামাজিক জীবনের ভিত্তি হিসেবে অভিহিতকারী সম্ভবত একথাই বলতে চায় যে, মার্কস ও লেনিন যে সূক্ষ্ম জ্ঞান ও দূরদর্শিতার অধিকারী, তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সঃ)-এর ভাগ্যে জোটেনি। অথবা সে এটা বলতে চায় যে, আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন মার্কস ও লেনিন এ যুগের নতুন নবী হয়ে এসেছেন।

ভেবে দেখুন, এ দু'টো অবস্থা কি ইসলামের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের অনুসারীদের সম্পর্ক বহাল রাখতে পারে? ইসলামের সকল সামাজিক নীতিমালা ব্যক্তি মালিকানার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। মুসলমানের বৈবাহিক জীবন ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত। উত্তরাধিকার আইনও ব্যক্তি মালিকানার দৃষ্টিকোণের ভিত্তিতে কার্যকর হয়। যাকাত এবং আদল ও ইহসানের মধ্যেও ব্যক্তি মালিকানার দৃষ্টিভঙ্গি কার্যকর। সুতরাং ব্যক্তি মালিকানার যদি বিলুপ্তি ঘটে, তবে ইসলামের আলোকে আপনার সামাজিক জীবন পরিচালিত করতে পারবেন কি?

সমাজতন্ত্র এটাও বলছে না যে, বিনিময় প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তি মালিকানার বিলোপ সাধন করা হবে। বরং সে চায় বিপ্লব ঘটিয়ে হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে জনগণের বিষয়-সম্পত্তির উপর জোরপূর্বক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে। কুরআন ও হাদীস মানুষকে নৈতিকতার শিক্ষা দেয়। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিক দর্শন এ নৈতিকতার বিপরীত প্রশিক্ষণ দান করে। এভাবেই ইসলামের নৈতিক বিধানের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার সরাসরি সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে।

ইসলামে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এ স্বাধীনতা যদি ছিনিয়ে নেয়া হয়, তবে শরীয়তের সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হবে না, যে কারণে মানুষকে এক স্বাধীনচেতা সৃষ্টি হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। উল্লিখিত যুক্তির ভিত্তিতেই সমাজতান্ত্রিক মালিকানা শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে হারাম।

অনলবর্ষী বাগ্মীতা

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে অনলবর্ষী বাগ্মীদের যোগ্যতা অবদমিত করে রাখা হয়, অথচ পরিস্থিতি এ থেকে ভিন্ন জিনিস দাবী করে।

উত্তর : জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে আবেগের একটা সীমা আছে, যা অতিক্রম করা সমীচীন নয়। জামায়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে অনেক ভাল ভাল আবেগোদ্দীপক বক্তা রয়েছেন। কিন্তু তারা আবেগে উদ্দীপ্ত হয়ে নৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করেন না। শুধু আবেগই যথেষ্ট নয়, বরং তার সাথে পর্যাপ্ত বুদ্ধিমত্তারও প্রয়োজন।*

[সাপ্তাহিক এশিয়া, লাহোর, ২৬ জুলাই, ১৯৭০]

* আমীরে জামায়াত ১৯৭০ এর ১৪ জুন করাচীতে জামায়াত কর্মীদের প্রশ্নের জবাব দেন।

৬. ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান

মানবিক কল্যাণের বাহক

প্রশ্ন ঃ পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার স্থলে ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান চালু হলে, তাতে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক কল্যাণ হবে কি? বিস্তারিত বলুন।

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক কল্যাণের চেয়ে মানবিক কল্যাণ অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার সবচেয়ে বড় যুলুম হচ্ছে, তা শ্রমিক শ্রেণীকে কলুর বলদ বানিয়ে তাদের কাছ থেকে মানবতা ছিনিয়ে নেয়। বর্তমানে যেখানেই পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা চালু আছে, মানুষের উপর এ রকম উৎপীড়ন চালানো হচ্ছে। ইসলামী বিধান প্রতিষ্ঠিত হলে তা শুধু যে শ্রমজীবী মানুষকে অতিরিক্ত সম্পদের অধিকারী করতে সচেষ্ট হবে, তাই নয়, বরং এ রাষ্ট্রব্যবস্থা চায়, সমাজের সচ্ছল মানুষদের মত তারাও সুখী জীবন যাপন করুক। ইসলামী রাষ্ট্র বৈধ শ্রম এবং ইনসাফভিত্তিক পারিশ্রমিকের নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করবে এবং শ্রমিকদেরকে এ পরিমাণ সময় দেয়া হবে যে, তারা তাদের ডিউটি শেষ করার পর নিজ পরিবার ও সন্তান-সন্ততিদের প্রতি মনোযোগী হতে পারবে। নিজের ও পরিবারের নৈতিক মানোন্নয়নের কাজও করতে পারবে।

অর্থনৈতিক উপকরণের অপর্যাপ্ততা

প্রশ্ন ঃ আমাদের অর্থনৈতিক উপকরণের অপর্যাপ্ততা রয়েছে। সুতরাং কিভাবে আমরা উন্নত দেশের পর্যায়ে আসতে সক্ষম হবো?

উত্তর ঃ অর্থনৈতিক উপকরণ বলতে সম্ভবত এখানে প্রাকৃতিক সম্পদ বুঝানো হয়েছে। এটা বলা ঠিক নয় যে, আমাদের সম্পদের স্বল্পতা রয়েছে। আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ জাপানের প্রাকৃতিক সম্পদের চেয়ে বেশী। জাপানকে বিদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করতে হয়। এতদসত্ত্বেও তাদের জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত। সম্পদের অর্থ শুধুমাত্র কয়লা ও লোহা নয়, বরং মানব সম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত। সুশিক্ষিত মানব সম্পদ যেখানে বিদ্যমান থাকে, সেখানে বৈষয়িক সম্পদের স্বল্পতা দেশের উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না। আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের মানব সম্পদের অভাব নেই। পাকিস্তানের

লোকেরা প্রযুক্তিগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে কৃতিত্ব সম্পন্ন। তারা যখন বিদেশে গিয়ে কাজ করে, তখন বিদেশীদের সংস্পর্শে কাজ বুঝার ক্ষেত্রে প্রখর মেধার পরিচয় দেয় এবং অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ সম্পন্ন করে। পরিতাপের বিষয় দেশের সম্পদের একটা বিরাট অংশ স্বার্থান্বেষী লোকদের হাতে কুক্ষিগত হয়ে আছে। এজন্য আমরা মানব সম্পদের দ্বারা যথার্থ কল্যাণ হাসিল করতে পারছি না এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে এর সুফলও পৌছতে পারছে না।

বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করলে এবং বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জনের ইচ্ছা থাকলে সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মান অনেক উন্নত হবে। আর যদি আল্লাহভীরু লোকদের হাতে রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে, তবে শুধু ব্যক্তি জীবনের মান-ই উন্নত হবে না, বরং মানবতার মর্যাদাও উন্নত হবে।

কারখানার মালিকদের অধিকার

প্রশ্ন : ইসলামী রাষ্ট্রে কারখানার মালিকদের স্বেচ্ছাচারিতার অধিকার থাকবে কি?

উত্তর : অবৈধ অধিকার থেকে তাদেরকে নিশ্চিতরূপে বঞ্চিত করা হবে। কিন্তু কারখানার মালিক হিসেবে তাদের কিছু বৈধ অধিকার রয়েছে, যা প্রয়োগে তাদের বাধা দেয়া হবে না। যেমন ধরে নিন, কোন ব্যক্তি একটি কারখানার কর্মচারী হয়ে সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করে না, কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ ছড়ায়, তাদেরকে ভাংচুর ও সন্ত্রাসের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং অযৌক্তিক কোন কারণে গোটা কারখানায় গোলমাল বাধায়। এ ক্ষেত্রে কারখানার মালিক সেই কর্মচারী ছাটাই অথবা সাময়িকভাবে বরখাস্তের নির্দেশ জারী করার অধিকার অর্জন করবেন। তবে কারখানার মালিকদের যুলুম করার অধিকার দেয়া হবে না এবং একনিষ্ঠ শ্রমিকদের সুবিধার্থে বিশ্বস্ত ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীদের যখন খুশী চাকুরীচ্যুত করার অধিকারও তাদের থাকবে না।

আমরা জামায়াতের গঠনতন্ত্রে স্পষ্ট করে বলেছি যে, শ্রমিকদের সাথে ন্যায়সংগত আচরণ করা উচিত। অর্থাৎ কারখানার মালিকদেরও অনর্থক ক্ষতি করা যাবে না এবং শ্রমিক শ্রেণীকেও মালিকদের অত্যাচার ও শোষণের শিকারে পরিণত হতে দেয়া যাবে না। একথা মনে রাখবেন, আমরা সমাজকে শ্রেণী সংঘাতের দিকে নিয়ে যেতে চাই না। আমরা চাই শ্রমিক ও মালিকদের

মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হোক এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়নে কাজ করুক।

কাজের সময় এবং কারখানায় অংশীদারীত্ব প্রসংগ

প্রশ্ন : বর্তমানে কল–কারখানায় শ্রমিকদের নিকট থেকে অধিক শ্রম আদায় করা হয়। তাদের এ অতিরিক্ত শ্রমের সকল ফায়দা মালিকরা অর্জন করে। জামায়াত এ ক্ষেত্রে কি পদ্ধতি অবলম্বন করবে?

উত্তর : জামায়াতে ইসলামীর দৃষ্টিভংগি হলো, ইনসাফভিত্তিক পারিশ্রমিকের পাশাপাশি শ্রমিকদের কাজের সময়ও নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। কখনো যেন তাদের নিকট থেকে অতিরিক্ত কাজ আদায় করা না হয়। পক্ষান্তরে কারখানার উৎপাদনের সঙ্গে শ্রমিকদের মুনাফার এমন একটা সম্পর্ক থাকা দরকার, যা তাদেরকে অতিরিক্ত শ্রমের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। এজন্য তাদেরকে বোনাস শেয়ারও দেয়া হবে। অর্থাৎ শ্রমিকদেরকে কারখানার অংশীদার বানাতে বোনাসের অংশ ব্যয় করা হবে। তারা যেন উপলব্ধি করে, তাদের শ্রমের সম্পূর্ণ লাভ শুধু মালিকই পাচ্ছে না, বরং এতে তাদেরও অংশ রয়েছে। শ্রম আইন পুনর্বিবেচনার অর্থ হচ্ছে শ্রম শোষণ করার সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে এবং শ্রমজীবী শ্রেণীকে অধিকতর সুখী ও সচ্ছল করা হবে।

বেতনের আনুপাতিক হার

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামী শ্রমিকদের সর্বনিম্ন বেতন দেড়শত টাকা নির্ধারণ করার সুপারিশ করেছে। অথচ তারা উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেনি।

উত্তর : ঘোষণাপত্র না পড়েই এ প্রশ্ন করা হয়েছে। আমরা আমাদের ঘোষণাপত্রে একথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছি যে, মাসিক বেতনের বর্তমান হার ১ঃ ১০০ থেকেও বেশী। আমরা বর্তমানে এ হার কমিয়ে ১ঃ ২০ এর সমান্তরালে আনার চেষ্টা করছি। অতপর এ হার আরো কমিয়ে পর্যায়ক্রমে ১ঃ১০ এর সমান্তরালে আনা হবে।

শ্রেণীভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব

প্রশ্ন : শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের জন্য সংসদে আসন নির্ধারণ করে দেয়া যুক্তিসঙ্গত নয় কি?

উত্তর : এটা সেই শ্রেণী বিভাজনের ধারণা, যার ধ্বনি সমাজতন্ত্রীরা তুলে থাকে। সত্যিকার অর্থে যদি শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের দাবী সমর্থন করা হয়, তাহলে সকল স্তরের মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধিত্ব না দেয়া পর্যন্ত ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। একথার কি নিশ্চয়তা আছে যে, শ্রেণীভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে লোক নির্বাচিত হয়ে সংসদে আসবে এবং তারা শ্রেণী সুবিধার উর্ধে থেকে জাতির সামগ্রিক কল্যাণে কাজ করবে? একথারও কোন নিশ্চয়তা নেই যে, তারা নিজ পক্ষের সঙ্গে বিশ্বস্ততার হক আদায় করবে এবং সংসদে এসে কোন বিকি-কিনির অভিযোগে অভিযুক্ত হবে না। সুতরাং শ্রেণীভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধন করবে না।

শ্রমিকদের প্রতিনিধিত্বের দ্বারা যদি সংসদে শ্রমিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া এবং সংসদে তাদের বক্তব্য পেশ করার অধিকার বুঝানো হয়ে থাকে, তবে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এটা যথার্থভাবেই অর্জিত হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যে সাধারণ নির্বাচন হয় সেখানে তো দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব এসে যায়। আমাদের জনগণ এমন বিবেক বিক্রেতা নয় যে, গুটি কয়েক মুদ্রার বিনিময়ে স্বীয় মতামত বিক্রির পথ বেছে নেবে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যদি এর আগে সাধারণ নির্বাচন হতো, তবে আপনি বুঝতে পারতেন যে, জনগণ কাদের নির্বাচিত করতো। প্রথমবার জনগণ প্রতারণার স্বীকার হলে, দ্বিতীয়বার অবশ্যই তারা যোগ্য ব্যক্তিকেই নির্বাচিত করবে। তৃতীয়বার আরো অধিক যোগ্য ব্যক্তির আশা করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এমনটি হয়নি। এখন আমরা নতুন করে এ অভিজ্ঞতা অর্জন করবো।

অজ্ঞতাবশত যদি আমরা সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে ফেলি, তবে আমাদের মাঝে প্রচন্ড সংঘাতের সৃষ্টি হবে এবং একক জাতিসত্তার অনুভূতি সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হবে। যারা শ্রেণীভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারা প্রকৃতপক্ষে এ রকম সংঘাতেরই সৃষ্টি করতে চায়। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, ঈমানদার এবং আল্লাহভীরু লোক নির্বাচিত হয়ে আসুক। তাদের দ্বারা কোন শ্রেণীর শংকিত হওয়ার কারণ থাকবে না। তারা সকল স্তরের মানুষের কল্যাণ এবং জাতির সামগ্রিক স্বার্থেই কাজ করবে।

শ্রমিক আন্দোলন ও সমাজতন্ত্রী চক্র

প্রশ্ন : শ্রমিক আন্দোলনের মাঝে সমাজতন্ত্রীরা ছড়িয়ে আছে। এরা শ্রমিকদেরকে ভাংচুর এবং সন্ত্রাসের পথে নামিয়ে এ আশ্বাস দেয় যে,

তোমাদের সমস্যা সমাধানের এটাই একমাত্র উত্তম পথ। আমরা কিভাবে এ প্রবণতা ঠেকাতে পারি?

উত্তর ঃ একথা বুঝে নিন যে, সমাজতন্ত্রীদের উদ্দেশ্য শ্রমিকদের অধিকার আদায় করে দেয়া নয়। তারা চায়, শ্রমিকদের মধ্যে একটা অরাজকতা ও অস্থির পরিবেশ বিরাজ করুক। এরা যদি কোন দাবী পূরণ হতে দেখে, তো নতুন আরেকটা দাবী দাঁড় করিয়ে দেয়। শ্রমিকদেরকে তারা ক্রমাগত এই বলে প্ররোচিত করতে থাকে যে, নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের মাধ্যমেই তারা স্বীয় অধিকার অর্জন করতে পারে। তাদের উদ্দেশ্য হলো, এ ধরনের নৈরাজ্য এবং বিশৃংখলার ফলে যেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ পরিষ্কার হয়, আর তারা কোন উপযুক্ত সময়ে দেশ ও জাতিকে সমাজতান্ত্রিক শাসনের কোলে ঠেলে দিতে পারে। এ উদ্দেশ্য পূরণে তারা পুঁজিপতি এবং শ্রমিকদের সঙ্গে সমঝোতা করে উভয়কেই স্বস্থানে বোকা বানিয়ে রাখে। আমরা সারাদেশে এমন শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত করতে চাই, যা নৈতিক রীতিনীতির সীমায় থেকে শ্রমিকদের দাবী আদায়ের সংগ্রাম করবে। যদি এ ধরনের শ্রমিক আন্দোলন সংগঠিত হয়, তবে পুঁজিপতিদের নত করা এবং শ্রমিকদের বৈধ অধিকার অর্জনে সফল না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না। ভাংচুরের ফলে শুধু পুঁজিপতিদেরই ক্ষতি হবে, শ্রমিকদের নিজেদের কোন ক্ষতি হবে না—তাদের মধ্যে এ প্রবণতা প্রতিপালিত হওয়া ঠিক নয়। কারণ এতে জাতির সামগ্রিক সম্পদ বিনষ্ট হয়, যার ক্ষতিকর পরিণতি শেষ পর্যন্ত তাদের উপরও বর্তাবে।

শ্রমিক-কৃষকের নামে গালভরা বুলি

প্রশ্ন ঃ কতিপয় ব্যক্তি অভিযোগ করেছেন যে, জামায়াতে ইসলামী তাদের নির্বাচনী অভিযানে শ্রমিক ও কৃষকের সমস্যাকে গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখে না।

উত্তর ঃ যারা এ অভিযোগ উত্থাপন করে, তাদের ধারণা ঠিক নয়। জামায়াতে ইসলামী শ্রমিক ও কৃষকদের সমস্যাকে কোন সময় গুরুত্বহীন মনে করেনি। বর্তমানে সারাদেশে জামায়াতের উদ্যোগে যেসব সভা-সমাবেশ হচ্ছে, সে বিষয়ে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের মাধ্যমেই অনুমান করা যায় যে, জামায়াত এ সমস্যাগুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে এসেছে।

তবে একথা সত্য যে, আমরা কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে গালভরা বুলি আওড়িয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বোকা বানাতে চাই না। যে নেতা কৃষকের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজেকে উৎসর্গীত মনে করে এবং তাদের চিন্তায় দিশেহারা

হয়ে পড়ে, তার জমিদারীতে গিয়ে দেখুন যে, তার নিজের কৃষক ও চাষীদের কি অবস্থা এবং তারা কি শোচণীয় জীবন যাপন করছে। একইভাবে যে সকল নেতা শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার দাবী করে, তাদের কারখানায় গিয়ে শ্রমিকদের দূরবস্থার প্রতি তাকালেই বোঝা যাবে যে, তাদের এই দাবীর যথার্থতা কতটুকু।

ইসলামী রাষ্ট্র ও প্রচলিত সুযোগ-সুবিধা

প্রশ্ন ঃ কোন কোন ব্যক্তি এ আপত্তি উত্থাপন করে যে, যদি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে শ্রমিকরা প্রভিডেন্ট ফান্ড, ছুটিছাটা এবং অন্যান্য প্রচলিত সুবিধাদি ভোগের বৈধতা অর্জন করবে না। কারণ ইসলামে এ ধরনের সুযোগ–সুবিধার কোন রীতি নেই।

উত্তর ঃ যারা এ অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তাদের মনে যদি এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায়, তবে এরপর তারা এ অভিযোগও উত্থাপন করবে যে, ইসলামে উড়োজাহাজ, রেলগাড়ী, বাস ইত্যাদির কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং যাতায়াতের মাধ্যম হিসেবে এগুলোর ব্যবহার ইসলামসম্মত নয়, এটা একটা নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ অভিযোগ। আর এগুলো তারাই পেশ করে থাকে, যাদের চিন্তা–ভাবনা ও বুঝার যোগ্যতা থাকে না। ইসলাম প্রত্যেক যুগেই ইনসাফের যথার্থ পদ্ধতিকে অনুমোদন করেছে এবং সামাজিক জীবনে এর প্রতিফলন ঘটিয়েছে। বর্তমান যুগে যদি শ্রমিকরা প্রভিডেন্ট ফান্ড, ছুটিছাটা এবং অন্যান্য সুবিধাদি লাভ করে থাকে তবে সেসব ইনসাফের ভিত্তিতেই পেয়ে থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রে এসব সুযোগ–সুবিধা কেবল বহালই থাকবে না, বরং আরো যেসব সুবিধা ইসলামের ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থার আলোকে তাদের পাওয়া উচিত, তা–ও প্রদান করা হবে।

ডিউটি ও ইবাদত

প্রশ্ন ঃ মিল–কারখানায় শ্রমিকদেরকে আট ঘন্টা কাজ করতে হয়। মহাজনের কর্মচারী (গোমস্তা) বলে যে, এ সময়ের মাঝে নামায পড়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। কারণ তোমরা পুরো আট ঘন্টারই পারিশ্রমিক গ্রহণ কর। এ আট ঘন্টায় তোমরা নামাযের জন্য যে সময় ব্যয় কর, তার পারিশ্রমিক অবৈধভাবে আদায় করছো। মেহেরবানী করে যুক্তি দ্বারা আমাদের এ সমস্যার সমাধান জানাবেন।

উত্তর : যারা শরীয়তের দোহাই দিয়ে মুসলমানদেরকে নামায থেকে বিরত রাখে, তারা প্রকৃতপক্ষে শরীয়ত নিয়ে খেলা করে। তাদের এ কাজ মূলতই নাজায়েয ও হারাম। মুসলমানদের এদের প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয় এবং নামায যথারীতি আদায় করা প্রয়োজন।

যেভাবে খাওয়া, পান করা এবং প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ মানুষের অপরিহার্য কাজের অন্তরভুক্ত এবং এ প্রয়োজন পূরণের জন্য তাদেরকে কারখানায় কাজের মাঝেও অনুমতি দেয়া হয়; তেমনিভাবে মুসলমানদের জন্য আপন রবের স্মরণ করাও এক অতি জরুরী কাজ। কোন মহাজনের এ অধিকার নেই যে, সে এই অতি প্রয়োজনীয় কাজের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। কোন মহাজন মুসলমান হয়েও মুসলমানের ফরয নামায আদায়ে বাধা দেবে, এটা আরো দুঃখজনক।

জায়গীরদারী বিলোপ

প্রশ্ন : ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত জায়গীরদারদের ব্যাপারে কি নীতি গ্রহণ করা হবে?

উত্তর : আমরা এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলেছি যে, সকল নতুন এবং পুরনো জায়গীরদারী বাজেয়াপ্ত করা হবে।

জাতীয় মালিকানা মতবাদ

প্রশ্ন : ইসলামী রাষ্ট্রে যদি সকল শিল্প-কারখানা জাতীয় মালিকানাভুক্ত করা হয়, তবে এতে ভালো ফল আশা করা যায় কি?

উত্তর : কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে জাতীয় মালিকানাভুক্ত করা সমাজতন্ত্রের দর্শন। এটা নীতিগতভাবেই ভুল এবং পরিণতির দিক থেকেও ধ্বংসাত্মক। কোন গোষ্ঠীর জন্য একটি দর্শন প্রতিষ্ঠা করে জোরপূর্বক তা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া মানবতা বিরোধী কাজ। এ গোষ্ঠী যেখানেই মানুষের ভূ-সম্পত্তি বিনিময় ছাড়া সামষ্টিক মালিকানাভুক্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে, সেখানেই প্রচন্ড দাঙ্গা ও হত্যাযজ্ঞের সৃষ্টি হয়েছে। এটা পুরোপুরি যুলুম এবং অন্যায়। পৃথিবীতে যত ধর্ম দেখা যায়, তার মধ্য থেকে কোনটাই তার অনুসারীদের এ শিক্ষা দেয়নি যে, তারা মানুষের সম্পদের উপর বলপ্রয়োগের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করুক।

এ দৃষ্টিভংগি পরিণতির দিক থেকে এতোই বিপজ্জনক যে, যদি কল-কারখানাগুলোকে জাতীয় নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, তাহলে দেশে বর্তমান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার চাইতেও জঘন্য স্বৈরাচারী আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে।

এ রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতার কোন কল্পনাই করা যায় না। জনগণ এমন অসহায় অবস্থায় থাকে যে, কোন যুলুমের প্রতিবাদে আওয়াজ তোলা তো দূরের কথা, তারা নিজের ঘরেও এ ব্যাপারে প্রকাশ্য অভিমত ব্যক্ত করতে পারে না। গোয়েন্দাবৃত্তির এমন সুদৃঢ় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয় যে, পিতা পুত্রের সঙ্গে এবং স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে কোন কথা বলতে ভয় পায়। পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির মাঝে অবিশ্বাস ও সন্দেহের পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। জাতীয় মালিকানার এই স্বাদ যারা গ্রহণ করেছে, তারা তো এ থেকে বেরিয়ে আসার ফরিয়াদ জানাচ্ছে। আর যারা এর স্বাদ গ্রহণ করেনি, তারা চায়, এ বিপদ তাদের উপর চেপে বসুক।

ইসলামী রাষ্ট্রে শ্রমিক আন্দোলন

প্রশ্ন : ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক আন্দোলনের কোন প্রয়োজন থাকবে কি? কেননা ইসলামী বিধান অনুযায়ী সবকিছুই তো সঠিকভাবে পরিচালিত হবে।

উত্তর : ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে এটাই তো পার্থক্য। সমাজতন্ত্রের বক্তব্য হলো, যখন তা কোন দেশে প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানে শ্রমিক আন্দোলনের প্রক্রিয়া বিলুপ্ত হয়ে যায়। শুধু নামেমাত্র ট্রেড ইউনিয়ন ও শ্রমিক সংগঠনের অস্তিত্ব থাকবে। প্রকৃতপক্ষে তা হবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মুখপাত্র। শ্রমিকদের কল্যাণের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যে বেতন-ভাতা ও কাজের সময় শ্রমিকদের জন্য নির্ধারণ করে, তা যথার্থভাবে মেনে চলার দায়িত্ব এই শ্রমিক সংগঠনগুলোর উপর ন্যস্ত হয়। শ্রমিকদের নির্ধারিত ভাতা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের কোন অধিকার থাকবে না, তা সে ভাতার পরিমাণ ন্যায়সঙ্গত হোক বা না হোক। ইসলাম এ ধরনের বলপ্রয়োগ নীতির পরিপন্থী। ইসলামী রাষ্ট্রে শ্রমিক আন্দোলনের অস্তিত্ব থাকবে। এখানে শ্রমিকদেরকে ইসলামী নীতিমালা ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত করা হবে। সেভাবেই শ্রম আদালত তার কার্য

পরিচালনা করবে। শ্রমিকরা তাদের সংগঠনের মাধ্যমে তাদের দাবী-দাওয়া এ আদালত থেকে আদায় করে নিতে পারবে।

ইসলামে বাণিজ্য আইন

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় সাধারণত বলা হয় যে, ব্যবসায়-বাণিজ্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত করতে হবে। কিন্তু সেই বিধানগুলো কি? এ সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই।

উত্তর : ইসলামী বিধান সম্পর্কে মানুষের সাধারণ অজ্ঞতা জটিলতার সৃষ্টি করে। ইসলামে ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত বিস্তারিত বিধান রয়েছে। ফিকাহর সকল গ্রন্থে كتاب البيوع নামে একটি অধ্যায় আছে, যেখানে ব্যবসায় ও লেনদেন সংক্রান্ত ইসলামী বিধান বর্ণিত হয়েছে। এভাবে হাদীসের গ্রন্থগুলোতেও كتاب البيوع অধ্যায় পাওয়া যায়। এতে ব্যবসায়-বাণিজ্য সংক্রান্ত রাসূলের (সাঃ) যুগের দৃষ্টান্তসমূহ এবং সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) কর্মধারা পেশ করা হয়েছে। আমি এ অধ্যায়গুলো উর্দু ভাষায় রূপান্তর করে প্রকাশ করার চেষ্টা করছি। মানুষ যেন হালাল ও হারাম পণ্যের ধারণা অর্জন করতে পারে।

আমি আমার গ্রন্থে সংক্ষিপ্তভাবে হারাম পণ্য সম্পর্কে খোলামেলা বর্ণনা করেছি। কারণ ইসলামী শরীয়তে যে বস্তু হারাম নয়, তা মোবাহ। এভাবে হালাল ও মোবাহ পণ্য আপনা হতেই চিহ্নিত হয়ে যায়। কুরআনে করীমে ব্যবসায়কে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুসন্ধানের মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। ব্যবসায়ীর সামনে হালাল ও হারাম দু'টো পথই উন্মুক্ত থাকে। কিন্তু সে যদি আল্লাহর ভয়ে হালাল পণ্যকেই যথেষ্ট মনে করে, তবে সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহর মর্যাদা লাভ করবে।

গণতন্ত্র প্রসংগ

প্রশ্ন : ইসলামে গণতন্ত্রের স্বীকৃত মর্যাদা কি?

উত্তর : মানুষের মধ্যে এ ভুল ধারণা বিরাজমান আছে যে, পাশ্চাত্য থেকে গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে। আসলে মুসলমানদের নিকট থেকেই পাশ্চাত্যে গণতন্ত্রের বিস্তার হয়েছে। ফিকাহর গ্রন্থসমূহে عليه الاجماع এবং عليه الجمهور শব্দগুলো পাওয়া যায়। যখন ডেমোক্রেসী (Democracy)

শব্দ পাশ্চাত্য থেকে উৎপত্তি লাভ করে, তখন মুসলমান পণ্ডিতেরা গণতন্ত্রের পরিভাষাকে এই শব্দগুলোর সমার্থক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং এর তরজমা 'গণতন্ত্র' করেন।

এবার পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ও ইসলামী গণতন্ত্রের প্রসংগে আসা যাক। এ দু'টোর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। তারা যে কোন হারাম বস্তুকে হালাল সাব্যস্ত করতে পারে, এতে কেউ বাধা দিতে পারে না। কিন্তু ইসলামী গণতন্ত্রে জনগণ নয়, আল্লাহই সকল ক্ষমতার উৎস। গোটা জাতি আল্লাহর বিধান মেনে চলে রাষ্ট্র পরিচালনা করে। তারা যদি কোন হারামকে নিজ ইচ্ছায় হালাল করার চেষ্টা করে, তাহলে তৎক্ষণাত কাফির হয়ে যায়। অতপর এদের ও পাশ্চাত্য জনগণের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকে না।

জমি বর্গা দেয়া

প্রশ্ন ঃ জায়গীরদারী প্রথায় মানুষ তার জমি বর্গাচাষীর কাছে দিয়ে উৎপন্ন দ্রব্যের অর্ধেক অংশ ঘরে বসে লাভ করে। এটা সরাসরি যুলুম ও বিবেক বর্জিত কাজ। ইসলাম এ প্রসংগে কি বিধান পেশ করে?

উত্তর ঃ মানুষ জায়গীরদারী এবং জমিদারীকে এক জিনিস মনে করে। অথচ জায়গীরদারী হলো সেই জিনিস, যা সরকার কোন ব্যক্তির সেবার প্রতিদানস্বরূপ জমির কোন খণ্ড উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করে। যদি কোন অবৈধ কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ এ উপঢৌকন দেয়া হয়ে থাকে, তবে আমরা অবিলম্বে তা বাতিল ও বাজেয়াপ্ত করে নেবো।

আর জমিদারী তো পৈত্রিক সম্পত্তির ব্যাপার। শরীয়ত তা বর্গাচাষীর কাছে দেয়া জায়েয করে। স্বয়ং হুজুর (সাঃ) তাঁর জমি বর্গাচাষীর কাছে দিয়েছেন। এভাবে বিশিষ্ট সাহাবীগণও (রাঃ) এ কাজের অনুসরণ করেছেন। যুক্তির আলোকে বিবেচনা করা হলে বুঝা যাবে যে, এ কাজ সম্পূর্ণরূপে বৈধ। দৃষ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্য করুন, এক ব্যক্তি তার নাবালক সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করলো। এ সন্তান এবং বিধবা স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য জমি ছাড়া অন্য কোন সামগ্রী নেই। এটা জানা কথা যে, নাবালক শিশু জমিতে হাল চালাতে পারবে না। এমতাবস্থায় তারা ঐ জমি বর্গাচাষীর কাছে দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করবে। বর্গাচাষীর কাছে জমি প্রদানের অধিকার তাদের নিকট থেকে হরণ করা এবং তাদেরকে উপোস রেখে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া

ইনসাফের কাজ হতে পারে না। তবে একথার নিশ্চয়তা থাকতে হবে যে, যে ব্যক্তি জমি বর্গা নিয়ে চাষ করবে, সে যেন তার বৈধ হক থেকে বঞ্চিত না হয়।

শ্রমিকদের প্রতি উপদেশ

পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের মাঝে যে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি করেছে, সেগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে, মানুষ নিজের অধিকারের কথা মনে রাখে কিন্তু কর্তব্যের কথা ভুলে যায়। আমি আপনাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি, আপনারা আপনাদের অধিকারের পাশাপাশি নিজ নিজ কর্তব্য সম্পর্কেও সজাগ থাকবেন এবং যে কাজের বিনিময়ে আপনারা পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন, তা যথাযথভাবে সম্পন্ন করবেন। একইভাবে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তাও পূরণ করবেন। আমাদের দেশে যে শ্রমিক আন্দোলন চলছে, তার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দিক হলো, তারা শ্রমিকদের নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয় না। আপনারা সেই শ্রমিক আন্দোলনগুলোকেই সফল করে তুলবেন, যারা নৈতিক চরিত্র গঠনেরও উদ্যোগ নেয়।

শ্রমিকদের মধ্যে সিনেমা দেখা এবং মাদক দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতাও দেখা দিয়েছে। এসব তাদের জন্য ধ্বংসাত্মক পরিণতি ডেকে আনবে। যদি তাদের বেতন বৃদ্ধিও পায় কিন্তু স্বভাব ঠিক না হয়, তবে তাদের অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটবে না।*

[সাপ্তাহিক এশিয়া, লাহোর, ৫ জুলাই, ১৯৭০]

---

* ১৪ জুন ১৯৭০ করাচীতে দশ সহস্রাধিক শ্রমিকের সমাবেশে মাওলানা মওদূদী (রঃ) প্রদত্ত প্রশ্ন উত্তর ভিত্তিক বক্তব্য।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনীতিতে অংশ নেয়া প্রকৃত দীনের কাজ

ইসলামের মধ্যে যে রদবদল করা হচ্ছে, আমি যদি তা মেনে নিই এবং মানুষ আমাকে যে ছাঁচে দেখতে চায়, আমি যদি নিজেকে সেই ছাঁচে ঢেলে সাজাই, তবে আমি এমন এক অপরাধ করবো, যার জন্যে আল্লাহর কাছে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে, যে জবাবদিহির সময় কেউই আমার সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে না। তাই আমি নিজেকে পরকালীন বিপদে নিমজ্জিত করার চাইতে মানুষের ইচ্ছার বিপরীত সাজানোকে অনেক উত্তম মনে করি।

ইসলাম ও রাজনীতি

প্রশ্ন : বর্তমান প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক রূপ ধারণ করে চলেছে। সাথে সাথে আমাদের সকল তৎপরতাও রাজনৈতিক হয়ে যাচ্ছে। কোন সময় এমন মনে হয়, যেন আমরা আমাদের মূল দাওয়াত থেকে দূরে সরে গেছি। আমাদের এ অনুভূতি কি ঠিক? যদি না হয়, তবে আমাদের মনের শান্তির জন্য কি করা উচিত?

উত্তর : এ প্রশ্নের জবাব হলো, আপনি আপনার মূল দাওয়াতকে বুঝার চেষ্টা করুন। রাজনৈতিক রূপ লাভ করার এক অর্থ এই হতে পারে যে, মানুষ তার দীন ও ঈমান ছেড়ে দিয়ে সকল বৈধ ও অবৈধ পন্থায় রাজনৈতিক নেতৃত্ব লাভে উদ্যোগী হয়ে উঠে। আল্লাহ না করুন, আপনার মধ্যে এ অবস্থা যদি সৃষ্টি হয়ে যায়, তাহলে তওবা করুন। জামায়াতে ইসলামী ছেড়ে দিয়ে ঘরে বসে থাকুন এবং রাজনীতিতে অংশগ্রহণের চিন্তা নিজের অন্তর থেকে বাদ দিন। কিন্তু যদি রাজনীতি দ্বারা আপনার উদ্দেশ্য এই হয় যে, এ দেশে ইসলামী বিধান প্রচলিত হোক, তবে এটাই জামায়াতের দাওয়াত এবং তার মূল উদ্দেশ্য।

আপনি যদি সত্যি সত্যি নিজের জন্য নেতৃত্ব লাভের চেষ্টা করে থাকেন, তবে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং এই বিকৃত চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলুন। কিন্তু আপনার দৃষ্টিভঙ্গি যদি এমন হয় যে, সৎলোকদের নেতৃত্বের আসনে বসাবেন এবং এ দেশে একটি আদর্শ সরকার প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালাবেন, তবে এটাই প্রকৃত দীনের কাজ। আবার আপনার মধ্যে যদি এ কাজে আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়, তাহলে এর সঠিক কারণ চিহ্নিত করা দরকার। আপনি যেখানেই অবস্থান করুন, অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী হোন কিংবা মানুষের সংস্পর্শে আসুন, কোন অবস্থাতেই আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হবেন না। নিয়মিতভাবে নামায আদায় করুন। কুরআন যতটুকু পড়তে পারেন, নিয়মিত পড়তে থাকুন। কিন্তু একথা বুঝে নিন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে থাকা এবং ঘরে বসে থাকার অবস্থা ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যুদ্ধক্ষেত্রে মানুষের লক্ষ্য হয় বিরোধী দল যেন বিজয়ী হতে না পারে। এ অবস্থায় তারা তাদের পুরো শক্তি শত্রুকে পরাজিত করতে ব্যয় করে। তেমনিভাবে ঘরে বসে যিক্‌র ও চিন্তা-গবেষণা যতটা নিয়মিতভাবে করা সম্ভব হয়, তা যুদ্ধক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

এ প্রসঙ্গে আরো একটা কথা খেয়াল রাখবেন, কোন কোন সময় মানুষ দেখতে পায়, আল্লাহ আমাদের নিকট থেকে দূরে সরে আছেন। এতে তার নফস ধোঁকায় পড়ে যায়। এটা একটা শয়তানী কুমন্ত্রণা। এ থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করুন। আর যদি আপনার প্রচেষ্টায় কোন সফলতা অর্জিত হয়, তবে মনে রাখবেন এতে আপনার চেষ্টা-সাধনার কৃতিত্বের চাইতে আল্লাহর অনুগ্রহের অবদান অনেক বেশী। এ সফলতার জন্য আল্লাহর কাছে মাথা নত করুন ও তাঁর শোকর আদায় করুন।

সরকারের তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' আচরণ

প্রশ্ন ঃ সরকারের তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' আচরণের কারণে বর্তমানে দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, গালি প্রদানকারীরা নিরাপদে থাকছে, কিন্তু যারা গালির শিকার; তাদেরই কোন নিরাপত্তা নেই। এ অবস্থায় একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের কি করা উচিত?

উত্তর ঃ এমন অবস্থায় এছাড়া আর বলার কি আছে যে, একজন দেশপ্রেমিক নাগরিকের ধৈর্যের সাথে অবস্থার মোকাবিলা করে যাওয়া উচিত। আমার মতে যে সরকার যালেম ও মযলুমের মাঝে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে সে মূলত কোন সরকারই নয়। এ ধরনের নিরপেক্ষ নীতি আসলে যালেমদের পক্ষাবলম্বনেরই নামান্তর।

ইসলাম প্রিয় দলগুলোর ঐক্য

প্রশ্ন ঃ ইসলামী দলসমূহের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন একটা সাধারণ দাবী। ৩১ মে'র প্রেক্ষাপটে কতিপয় ইসলামপন্থী দলের পক্ষ থেকে যে মনোভাব প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব কি?

উত্তর ঃ আসল ব্যাপার হলো, ৩১ মে (১৯৭০) তারিখে 'শওকতে ইসলাম' তথা ইসলামী শানশওকতের স্বপক্ষে সর্বদলীয় মিছিল সমাবেশ করার একটি প্রস্তাব বিভিন্ন ইসলামী দলের কাছে পেশ করা হয়েছিল। যারা এটা পছন্দ করেছে, তারা তা গ্রহণ করেছে। আর যারা পছন্দ করেনি, তারা প্রত্যাখ্যান করেছে। এতে অসন্তুষ্ট হওয়ার কি আছে? আমাদের কাজ হলো, আল্লাহর পথে আমরা আমাদের সদিচ্ছা এবং আন্তরিকতা প্রকাশ করবো। আমরা যতটুকু আন্তরিকতা প্রকাশ করবো, আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের অন্তর আমাদের সাথে অথবা আমাদের অন্তর আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের সাথে ততটুকু একাত্ম হতে থাকবে।

কাদিয়ানী নবুওয়াত এবং মুসলমান

প্রশ্ন ঃ কাদিয়ানীরা যদি আমাদেরকে মুসলমান মনে করে, তাহলে কি তারা কাফির হবে না? কাদিয়ানীরা তো নিজেদেরকে কালেমাধারী মুসলমান মনে করে।

উত্তর ঃ এ প্রশ্নটি জামায়াতে ইসলামীর নির্বাচনী ঘোষণাপত্রের একটি বাক্যের সাথে সম্পৃক্ত। সেখানে লিখা আছে ঃ "যারা মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর পর অন্য কাউকে নবী বলে স্বীকার করে এবং তাঁর নবুওয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে কাফির মনে করে, তাদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম সাব্যস্ত করা হোক।"

বাক্যটির শেষাংশে যে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তার প্রয়োজনীয়তা এজন্য দেখা দিয়েছে যে, পাঞ্জাব এবং ভাওয়ালপুরের মানুষ কাদিয়ানী সমস্যাকে বুঝলেও পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ এ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নয়। এজন্য যখন তাদের কাছে কাদিয়ানীদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম সাব্যস্ত করার দাবী রাখা হয়, তখন শিক্ষিত লোকেরা বলে যে, এটা আবার কি একটা সাম্প্রদায়িক সমস্যা উসকে দেয়া হলো। এ কারণে তাদেরকে বুঝানোর জন্যে ব্যাখ্যা হিসেবে লিখা হয়েছে যে, যারা নবী (সাঃ)–এর পর অন্য কাউকে নবী বলে স্বীকার করে এবং সেই নবীর প্রতি অবিশ্বাসীদেরকে কাফির মনে করে, তাদেরকে সংখ্যালঘু অমুসলিম ঘোষণা দেয়া হোক।

নবুওয়াতের আকীদার মূল কথা হলো, এর প্রতি বিশ্বাসীগণ মুসলমান এবং অবিশ্বাসীগণ কাফির সাব্যস্ত হয়। এখন কাদিয়ানীরা নিজ মুখে মুসলমানদের কাফির বলুক বা নাই বলুক, কিন্তু তাদের নয়া নবুওয়াতের আকিদার দিক থেকে তো মুসলমানগণ কাফির হিসেবেই গণ্য। এজন্যই হয় তাদেরকে অমুসলিম সংখ্যালঘু সাব্যস্ত করা হবে, নচেত নিজেদেরকে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মেনে নিতে মুসলমানদেরকে প্রস্তুত হয়ে যেতে হবে। এটা একটা সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাব, যা সংসদে পেশ করা হবে। তাই এ ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যাটা জরুরী।

ব্যক্তি মালিকানা, সীমিত মালিকানা জাতীয় মালিকানা

প্রশ্ন ঃ আপনি একদিকে ব্যক্তি মালিকানাকে জাতীয় মালিকানায় পরিণত করার বিরোধিতাও করেন, আবার সীমিত মালিকানারও সমর্থন করে বলেন

যে, জাতীয় গুরুত্বের অধিকারী কল-কারখানাগুলোকে জাতীয়করণ করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। এর কারণ কি?

উত্তর : জামায়াতের ঘোষণাপত্র না পড়েই এ প্রশ্ন করা হয়েছে। আমরা আমাদের ঘোষণাপত্রে একথার ব্যাখ্যা দিয়েছি যে, আমরা জাতীয় মালিকানাকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করার বিরোধী। কারণ এতে ইসলামের ব্যক্তি মালিকানা সংক্রান্ত মূলনীতি লংঘিত হয়। আবার স্থায়ীভাবে মালিকানা সীমিত করণের প্রবক্তাও নই। সাময়িক সীমিত মালিকানার নীতি আমরা এজন্য গ্রহণ করেছি যে, প্রাচীনকাল থেকে যে অর্থনৈতিক অসমতা চলে আসছে, তা চিহ্নিত করা খুবই কঠিন। এ কারণে নির্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত সম্পদ ন্যায্যমূল্যে ক্রয় করে সহজ কিস্তিতে ভূমিহীন কৃষক ও ক্ষেত-মজুরদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে। ইসলামী রাষ্ট্রে অবৈধ পন্থায় সম্পদ পুঞ্জীভূত করার কোন সুযোগ নেই। এজন্য সীমিত মালিকানা নিজে নিজেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

জাতীয় গুরুত্ববহ কল-কারখানাগুলোকে জাতীয়করণ করার ব্যাপারে একথা বলা হয়েছে যে, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব জনগণের নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের। আর এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এটাও নিশ্চিত করে নেয়া জরুরী যে, এ কল-কারখানাগুলো যেন আমলাতন্ত্রের সুপরিচিত দুর্নীতি ও অব্যবস্থার শিকারে পরিণত না হতে পারে।

সমাজতন্ত্র যদি এসেই পড়ে............।

প্রশ্ন : এ দেশে যদি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েই যায়, তাহলে কি অবস্থা দাঁড়াবে?

উত্তর : আপনি এই 'যদি' কে কেন প্রশ্রয় দিচ্ছেন? আপনি বরং সিদ্ধান্ত নেন যে, ইনশাআল্লাহ এ দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। যে দেশে এগার কোটি মুসলমান বিদ্যমান, সেখানে তারা বেঁচে থাকতে যদি একটি কুফরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে তাদের জন্য ডুবে মরা উচিত। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হলে কি হবে, এ প্রশ্নের জবাব এই যে, ঐ দেশগুলোর প্রতি তাকিয়ে দেখুন, যেখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে কি হয়েছে? মিসর, সিরিয়া, ইরাক, সুদান, লিবিয়া, চেকোস্লাভাকিয়া সবগুলো দেশের পরিণাম আপনার সামনে সুস্পষ্ট। আল্লাহ না করুন, যদি পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ঐসব দেশে যা হচ্ছে এখানে তাই হবে।

"একটা কিছু" বলতে কি বুঝানো হয়েছে

প্রশ্ন : কিছুদিন পূর্বে চৌধুরী রহমত ইলাহী সাহেব করাচীতে বলেছিলেন, সরকার যদি শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব একেবারেই পালন না করে, তবে আমাদের নিজেদেরকেই একটা কিছু করতে হবে। এই "একটা কিছু" বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : ধরুন, আপনার গ্রামে চুরি-ডাকাতি অব্যাহতভাবে বেড়েই চলেছে। আপনি আইন-শৃংখলা প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তারা আপনার অভিযোগে আমলই দিচ্ছে না। এ অবস্থায় আপনি কিছু করবেন কি না। যদি করেন, তবে বলুন সেই "কিছু"টা কি?

পুঁজিবাদের নিন্দা

প্রশ্ন : কতিপয় ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, আপনি পুঁজিবাদের নিন্দা করেন না এবং আপনার বক্তৃতায় শ্রমিক ও কৃষকদের প্রসংগ স্থান পায় না।

উত্তর : পুঁজিবাদের নিন্দা সম্পর্কে কথা হলো, যদি কোন ব্যক্তি আমার রচনা পড়ে থাকে তবে সে বুঝতে পারবে যে, যারা পুঁজিবাদের নিন্দায় বক্তৃতা করে বেড়ায়, আমি তাদের থেকেও কঠোর সমালোচনা করেছি। আমার লেখা "খোতবাত" "সুদ" "ইসলামের অর্থনৈতিক মতবাদ" এবং অন্যান্য গ্রন্থে এ সমালোচনা বিদ্যমান। প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, যখন আমি সমাজতন্ত্রের সমালোচনা করি তখন সমাজতন্ত্রীরা অনন্যোপায় হয়ে আমার উপর পুঁজিবাদের পৃষ্ঠপোষকতার অপবাদ চাপিয়ে দেয়।

আমার বক্তব্যে শ্রমিক ও কৃষকদের উল্লেখ না থাকা সম্পর্কে বলতে চাই, তাদেরকে ধোঁকা দেয়া আমার লক্ষ্য নয়। এজন্যই আমি ঘন ঘন "শ্রমিক কৃষক" "শ্রমিক কৃষক" জপনা করি না। এটা তো যারা কৃষক ও শ্রমিকদেরকে বোকা বানাতে চায় তাদেরই কাজ। আমি হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছি। হক ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হলে যেভাবে অন্যান্য মানুষ এ থেকে উপকৃত হবে, তেমনি কৃষক ও শ্রমিকরাও উপকৃত হবে।

[সাপ্তাহিক 'এশিয়া' লাহোর, ১৪ জুন, ১৯৭০ইং]

৮. দেশ বর্তমানে এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন

সুধী মণ্ডলী,

আল-কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় একথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কোন জাতিকে কোন নিয়ামত দান করেন এবং সে জাতি এ নিয়ামতের অবমূল্যায়ণ করে ও আল্লাহর অনুগ্রহের প্রতি অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেয়, তখন আল্লাহ সে জাতির নিকট থেকে প্রদত্ত নিয়ামত ছিনিয়ে নেন এবং তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ছাড়েন না। শাস্তির ধরন সম্পর্কে আল-কুরআনে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো, আল্লাহ সে জাতিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেবেন। এ দলগুলোকে দিয়ে একে অপরের প্রতি শক্তি প্রয়োগ করাবেন এবং প্রত্যেক দলকে অপর দলের বাড়াবাড়ির স্বাদ আস্বাদন করাবেন।

আমি আপনাদেরকে একথা এজন্য স্মরণ করিয়ে দিলাম যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের প্রতিও এক বড় অনুগ্রহ দান করেছেন। সুতরাং আমাদের ভেবে দেখা উচিত, এ অনুগ্রহের জবাব আমরা কিভাবে দিয়েছি। সুদীর্ঘ আড়াইশত বছর আমাদেরকে যুলুম-নির্যাতন এবং গোলামীর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। যে দেশে আমরা বহু শতাব্দীকাল যাবত সম্মান ও নেতৃত্ব সহকারে বসবাস করেছি, সেই দেশে এমন এক সময়ও অতিবাহিত হয়েছে যে, আমাদের উপর আমাদের শত্রুরা চেপে বসেছে এবং আমাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনার শিকার বানাতে কোন ত্রুটি করেনি। পরবর্তীতে এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল যে, তিনি আমাদেরকে পাকিস্তান নামক এক বিরাট দেশ দান করেছেন এবং স্বাধীনতা দিয়েছেন। এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভের পর পৃথিবীতে তা বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অনুগ্রহ। আর যে কারণে আল্লাহ এ অনুগ্রহ দান করেছেন, তা ছিল এই যে, ভারতীয় উপমহাদেশের সকল মুসলমান ইসলামের কালেমার উপর একত্রিত হয়েছিল। জাতি হিসেবে পাঞ্জাবী, বাঙালী অথবা বেলুচ হওয়ার কথা তারা ভুলে গিয়েছিল। তাদের কথা শুধু একটাই ছিল যে, আমরা মুসলমান। যে অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গড়ে উঠেছিল, শুধু সেখানেই একথা সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং ইউপি, বিহার, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ এবং দাক্ষিণাত্যের মানুষও

এই একই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তারা চেয়েছিল আমরা এমন এক ভূখণ্ড অর্জন করতে চাই, যেখানে তারা ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী জীবন পরিচালিত করতে সক্ষম হবে। ইসলামী বিধান মেনে চলতে পারবে। এই চেতনার ভিত্তিতেই আল্লাহ আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং এত বড় একটি দেশও দান করেছেন।

আমরা এ নিয়ামতের কি হক আদায় করেছি

এবার একটু গভীর দৃষ্টিতে চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ আমাদেরকে যে নিয়ামত দান করলেন, তা পেয়ে আমরা কি করেছি? পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এখনো খুব বেশীদিন অতিবাহিত হয়নি। কোটি কোটি মানুষ এখনো জীবিত যাদের সামনে এ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠালগ্নে অবস্থা এই ছিল যে, সমগ্র জাতি ইসলামী আদর্শের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিল। এতে ভাষা, গোত্র, অঞ্চল কিংবা শ্রেণীভিত্তিক কোন মতবিরোধ ছিল না। এখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হোক, এটাই সমগ্র জাতির কামনা ছিল। সে সময় জাতির মধ্যে নেতৃত্বও একক ছিল। উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রেও সকলের মতৈক্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং একই নেতৃত্বের প্রতি সকলেই সম্মত ছিল। একটি জাতির জন্য এরচেয়ে অধিক সৌভাগ্যের কথা আর কি হতে পারে যে, তাদের সামনে একটাই উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বিদ্যমান ছিল, যার উপর তারা ঐকমত্যেও পৌছেছিল। নেতৃত্বও এমন ছিল যে, তা সকলের সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করেছিল। পৃথিবীতে এর চাইতে উত্তম অনুকূল অবস্থা খুব কম জাতির ভাগ্যেই জুটেছে।

অথচ যে ইসলামের নামে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো, প্রথমে সেই ইসলামকেই উপেক্ষা করা হলো। এর পথে নানারকম প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করানো হলো। এথেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য বিভিন্ন প্রকার ছলছুতা অবলম্বন করা হলো এবং এর পরিবর্তে আমরা বিদেশ থেকে আমদানী করা মূলনীতির উপর কাজ শুরু করলাম। ইংরেজদের গোলামী যুগের চেয়েও এ মূলনীতিগুলোর অনুসরণ বেশী করা হলো। আমার বক্তব্য হচ্ছে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পর যদি ইসলামের অনুসরণ করা হতো, তবে বর্তমানের সমস্যাসমূহের একটিও সৃষ্টি হতো না। কখনও এ প্রশ্নের অবতারণা হতো না যে, যারা দেশ শাসন করছে, তারা বাঙালী, পাঠান না পাঞ্জাবী—যদি তারা ইনসাফ ও আল্লাহভীতির সাথে ইসলামী আদর্শকে বাস্তবায়িত করতো। অথচ এ বিষয় থেকে পশ্চাদপসরণ করা হলো। যে রাষ্ট্রে ইনসাফ থাকে না এবং যে

দেশে জাতির আকীদা-বিশ্বাস ও ভাবাবেগের বিপরীত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, সেই রাষ্ট্রের ধ্বংস এবং টুকরো টুকরো হওয়া থেকে কোন শক্তিই তাকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় না। ইনসাফ না থাকলে জনগণের মাঝে মত-পার্থক্য ও অস্থিরতার সৃষ্টি হবেই। পক্ষান্তরে যদি কোন রাষ্ট্র সেই মূলনীতি ও বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হয়, যা মানুষ নিজ আকীদা-বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে সত্য মনে করে, তাহলে সরকার এবং গোটা জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা প্রতিষ্ঠিত হবে। যে কাজে জনগণের সহযোগিতা থাকবে, সরকার সে কাজই করতে সক্ষম হবে।

ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যদি এভাবে দেশ পরিচালিত হতো, তবে তেইশ বছরের মধ্যে আমরা বিশ্বের একটি অতীব শক্তিশালী ও উন্নত জাতিতে পরিণত হতাম। কিন্তু এখানে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী কাজ করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ক্রমাগত আদর্শিক সংঘাত সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলাম সম্পর্কে বারবার মানুষের মগজে একথা ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইসলামের মধ্যে ৭৩ ফের্কা বিদ্যমান। অথচ এখানে সর্বমোট তিনটি ফের্কাই রয়েছে। কিন্তু এ বেচারাদের তা জানা ছিল না। কোথা থেকে শুনে তারা এটাকে অজুহাত বানিয়ে বলতে শুরু করেছে যে, মুসলমানরা যেখানে ইসলামের নামেই ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করবে কিভাবে? এভাবে মুসলমানদের মধ্যে অব্যাহতভাবে আদর্শিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে মুসলমানরা ইসলামের ওপর সংঘবদ্ধ না হতে পারে। তারা যেন এটাও বুঝে যে, এ ভূখণ্ডে কেবল ইসলামই অচল, এছাড়া অন্য সব মতবাদ চলতে পারে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিয়মিতভাবে অপপ্রচারের মাধ্যমে একথাই মানুষের মন-মগজে গেঁথে দেয়া হয়েছে। অতপর এখানে যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা পুরোপুরি ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত আদর্শেরই অনুরূপ ছিল। সেই সুদ, পারমিট এবং জুয়ার উপরই আমাদের অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলো, যা পুঁজিবাদের ভিত্তি। পরিণতি এই দাঁড়ালো যে, ইংরেজ আমলে যতোটুকু পুঁজিবাদ ছিল, তা কয়েক গুণ বেড়ে গেল। যার ফলে সম্পদ পুঞ্জীভূত হতে হতে কতিপয় পরিবারের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়লো। গোটা জাতি তাদের জন্য এক হরিলুটের ক্ষেত্রে পরিণত হলো। হরিলুটের সম্পর্কেও তো জনশ্রুতি রয়েছে যে, এতে বন্ধু ও

শত্রুর অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে এর অর্থ গ্রহণ করা হয়েছে এই যে, বন্ধু অথবা শত্রু যার গ্রাসই কেড়ে নিতে পারো, নাও। নির্যাতনমূলক পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে এ দেশে প্রতিপালন করা হয়েছে। যার ফলে অবস্থা আজ এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। নিঃস্ব মানুষের উদরের কাছে এই আবেদন করা হচ্ছে যে, তোমরা ইসলাম পরিত্যাগ কর। কারণ এ ইসলাম তোমাদের সমস্যার কোন সমাধান পেশ করেনি। সুতরাং অন্য কোন মতবাদ গ্রহণ কর। আল্লাহর এ বান্দারা ভেবেও দেখলো না যে, যেখানে ইসলামের আদর্শ অনুসরণই করা হলো না, সেখানে তা পরিত্যাগ করার উপদেশ কিভাবে দেয়া যেতে পারে?

ধর্মহীন শিক্ষাব্যবস্থার নীলনকশা

এর পাশাপাশি এমন শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যা আমাদের যুব মানসে আল্লাহ সম্পর্কে সন্দেহের সৃষ্টি করে। আখিরাত সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে। রিসালাত সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে। ওহী সম্পর্কে শুধু সন্দেহই সৃষ্টি করে না, বরং তা অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে। আমাদের দেশে এটা আল্লাহর মেহেরবানী ছিল যে, এক কালেমা, এক রাসূল, এক আল্লাহ এবং এক কুরআন সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ মতৈক্য ছিল।

এসব মতৈক্য লন্ডভন্ড করার চেষ্টা করা হয়েছে। যে সভ্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, তা পুনরুজ্জীবিত করার পরিবর্তে গোটা জাতিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার পথে ঠেলে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য চালচলনে আমরা এতদূর নিমজ্জিত হয়েছি, যতোটা ইংরেজদের শাসনামলেও হইনি। এটা সমগ্র জাতির নৈতিক চরিত্রের সর্বনাশ করে দিয়েছে।

গণতন্ত্র ও ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

এরপর আরো বড় যে যুলুমটি করা হয়েছে, তা হলো, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভের পর একটি গোষ্ঠী যখন অনুভব করলো যে, এখানে যদি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে গোটা জাতি মুসলমান হওয়ার কারণে আজ না হোক কাল কিংবা পরশু এখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হওয়াটা অবধারিত। একথা চিন্তা করে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, এখানে কোনক্রমেই গণতন্ত্র চলতে দেয়া যাবে না। এই গোষ্ঠী বলতে সেই সমস্ত লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে এটা চায় না যে, এখানে ইসলামের

ইনসাফপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। তারা মনে করে, যদি গণতন্ত্রের পথ বন্ধ থাকে, তবে এ দেশ তাদের জন্য অবাধ লুটপাটের ক্ষেত্রে পরিণত হবে। এদের মধ্যে সরকারী কর্মচারীগণ, পুঁজিপতি, বড় বড় জমিদার ও জায়গীরদাররাও জড়িত রয়েছে। এছাড়া পাশ্চাত্য সভ্যতার ধারক এবং প্রকৃতপক্ষে ইসলাম থেকে যাদের বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল, তারাও এদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরা সকলে মিলে এ ব্যাপারে একমত হয়েছে যে, এখানে ইসলামও প্রতিষ্ঠিত হতে দেবে না এবং গণতন্ত্রও চলতে দেবে না। যার ফলে দেশে নয় বছর পর্যন্ত কোন সংবিধান তৈরী হতে পারেনি।

আপনারা লক্ষ্য করুন, যে জাতির আল্লাহ, রাসূল এবং কিতাব এক এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় যাদের মাঝে কোন মতপার্থক্য ছিল না, সে জাতির জন্য একটি সংবিধান রচনা করা অতি সহজ কাজ ছিল। অথচ এজন্য নয়টি বছর কাটিয়ে দেয়া হলো। বারবার সংবিধান রচনার চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তা বানচাল করে দেয়া হয়েছে। অবশেষে ১৯৫৬ সালে সংবিধান রচিত হলেও এ সংবিধানের অধীনে একটি সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পূর্বেই সামরিক শাসন জারী হলো এবং নির্বাচনের পথ বন্ধ করে দেয়া হলো। সাধারণ নির্বাচনের পরিবর্তে চার বছর পর আমাদেরকে যা দেয়া হলো, তা ছিল মৌলিক গণতন্ত্র। যার অর্থ আমি ইতিপূর্বেও বলেছি যে, গণতন্ত্রের মূল শিকড় উপড়ে ফেলার নামই হচ্ছে মৌলিক গণতন্ত্র। আমাদের দেশে যখন এ অবস্থার সৃষ্টি হলো, তখন এখানকার মুসলমানদের মধ্যে গোত্রীয়, ভাষাগত এবং অঞ্চলভিত্তিক আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠলো।

ক্রমান্বয়ে এমন পর্যায় এসে গেলো, যাতে চিন্তাশীলেরা এ রকম চিন্তা করতে লাগলো যে, জাতীয়তার ভিত্তি শুরু থেকেই নেই। জাতীয়তার ভিত্তি যদি কিছু হয় তবে তা ভাষা, জন্মভূমি অথবা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড অথবা গোত্রই হতে পারে। একথা ভেবে দেখুন, যদি আমরা জাতীয়তার ভিত্তি হিসেবে ভাষাকে স্বীকৃতি দিই, তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে, এক ভাষায় কথা বলা সমস্ত লোক একই জাতিভুক্ত, চাই তারা মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হোক কিংবা অবিশ্বাসী। আমাদেরকে যদি একথা মেনে নিতে হয়, তবে অবিভক্ত ভারতে থাকা কালেই তা মেনে নিলাম না কেন? পাকিস্তান সৃষ্টিরই বা কি প্রয়োজন ছিল? তেমনি মাতৃভূমিকে যদি জাতির ভিত্তি সাব্যস্ত করা হয়, তবে এর অর্থ এই হবে যে, একই ভৌগলিক অঞ্চলে যারা বাস করে, তারাই কেবল পরস্পরের ভাই, অন্যরা পর। সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের কি কখনো এ দৃষ্টিভংগি ছিল ? মুসলমানদের মধ্যে যদি এ

দৃষ্টিভংগি থাকতো, তবে পৃথিবীতে এ জাতির সৃষ্টিই হতো না। রাসূল (সাঃ) এ উম্মতকে একই আকীদার ভিত্তিতে গঠন করেছিলেন। কে আরবীভাষী, আর কে ফারসীভাষী, সে ভিত্তিতে নয়; এবং আরব-আজমের ভিত্তিতেও এ উম্মতের সৃষ্টি হয়নি। এখানে ভাষা ও জাতিগত গোঁড়ামীই ক্রমান্বয়ে আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। বিশেষভাবে একনায়কত্বের দশ বছরে এ দৃষ্টিভংগি লালিত হয়ে এমন শক্তিতে রূপান্তরিত হলো যে, পাকিস্তানে প্রকাশ্যে 'ইসলাম মুরদাবাদ' শ্লোগান উচ্চারিত হলো। কালেমা তাইয়েবার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার দুঃসাহস দেখানো হলো এবং একথা খোলাখুলি বলা হলো যে, আমরা ইসলামের পরিবর্তে এখানে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাই। অবস্থার এ চিত্র যদি ভারতের মুসলমানদের জানা থাকতো, তবে তারা বলতো বরং এখন বলছে যে "এমন হবে আগে জানলে নিজের ঘরবাড়ী খোয়াতামনা।" তাদের উপর আজ বিপদ মুসিবতের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ছে। তাদেরকে নিকৃষ্ট ধরনের নির্যাতনের শিকারে পরিণত করা হচ্ছে। শুধুমাত্র এ অপরাধে যে, তারা পাকিস্তান আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। কিন্তু ফলাফল যা দাঁড়ালো তা হচ্ছে, যাদের জন্য তারা ত্যাগ স্বীকার করে এ দেশ প্রতিষ্ঠা করলো, তারা এটাও ভুলে গেল যে, আমরা মুসলমান। তাদের একথা বেশ মনে আছে যে, আমরা বাঙালী, সিন্ধী এবং বেলুচ। আর এর ভিত্তিতেই তাদের পরস্পরের মধ্যে তীব্র সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে। এর ভিত্তিতে আন্দোলন চলছে। কোন কোন অঞ্চলে প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে বলা হচ্ছে যে, মোহাজিরগণ এখান থেকে চলে যাও। এসব কর্মকান্ড দেখে শুনে মনে হয়, যে অনুগ্রহ আল্লাহ দান করেছিলেন, তা আমরা ভুলে গিয়েছি। তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছি এবং নেয়ামতের অপব্যবহার করেছি। এর পরিণাম যা হয়েছে তাও কারো কাছে গোপন নেই। আল্লাহ না করুন, যদি এ দেশ খন্ডবিখন্ড হয়ে যায়, তবে বাঙালী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী অথবা বেলুচ কেউ রক্ষা পাবে না। যে ঐক্য এবং জাতীয়তার ফলস্বরূপ এ দেশ সৃষ্টি হয়েছে, সেই ঐক্য এবং জাতীয়তার বদৌলতেই তা টিকে থাকতে পারে। যদি এ বিষয়গুলো একবার পরিত্যাগ করা হয়, তবে এরপর এ দেশে টিকে থাকা মুশকিল।

তারা নিজেদেরকে স্বাধীন রাখতে পারবে না। দ্বিতীয় প্রকার অকৃতজ্ঞতা দেখুন যে, আমরা ইসলামের কালেমার উপর একত্রিত হয়েছিলাম। ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ জীবন, মান-সম্ভ্রম এবং কোটি কোটি মানুষের সম্পদ কুরবানী করা হলো। অথচ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এখন বলা হচ্ছে যে, এখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। আসল কথা হলো, এ ধরনের

লোক এখানে আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং তারা মনের মধ্যে এ রকম চিন্তাই পোষণ করতো। কিন্তু এর আগে কারো এ সাহস ছিল না যে, সে ইসলাম ছাড়া অন্যকোন আদর্শের নাম উচ্চারণ করে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে যদি একথা বলা হতো যে, পাকিস্তান সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চাওয়া হচ্ছে, তবে কোন মুসলমান তার একটা আঙ্গুলও কাটাতে প্রস্তুত হতো না, জানমাল ও সম্মান কুরবানী করাতো দূরের কথা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কয়েক বছর পর্যন্ত কারো এ ধরনের শ্লোগান দেয়ার সাহস ছিল না। কতিপয় লোকের মনে এসব আজেবাজে চিন্তা বিদ্যমান ছিল বটে। তাদের মগজে এ চিন্তা ঘুরপাক খেতো। নানা রকম সাহিত্যিক ভঙ্গিমায় (যা প্রকৃতপক্ষে অসাহিত্যিক ভঙ্গি) একথা উপস্থাপন করা হতো যে, ইসলামের পরিবর্তে এখানে অন্যকোন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করা হোক। কিন্তু দশ বছরের একনায়কত্বের তত্ত্বাবধানে এ চক্র দেখতে দেখতে পরিণত রূপ লাভ করেছে। একনায়কত্ব ও তাদের মাঝে এক ধরনের সমঝোতা ছিল যে, আমরা এই একনায়কত্বকে টিকিয়ে রাখতে মদদ যোগাব। আর আমাদেরকে ইসলামের শেকড় উপড়ানোর সুযোগ দিতে হবে। এ সমঝোতার ভিত্তিতেই একনায়ক সরকার তাদেরকে সুযোগ প্রদান করে, সকল সংবাদ মাধ্যম, প্রচার ও প্রকাশনা মাধ্যমের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। এছাড়া তাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়। এভাবে দশ বছরের মধ্যে আস্কারা পেয়ে তারা সারাদেশে নিজেদের শেকড় ছড়িয়ে দেয়। তারা চেয়েছিল যে, একনায়কতন্ত্র আরো কিছু দিন দীর্ঘায়িত হোক। কিন্তু গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত ছিল। অবশেষে এক ডিক্টেটরকে উৎখাত না করতেই তারা পুরোপুরি ময়দানে অবতীর্ণ হলো এবং এমন বিশৃংখলা বাধালো যে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে না হতেই মার্শাল' ল জারী হলো এবং অন্য এক ডিক্টেটর ক্ষমতাসীন হয়ে গেল।

এটা বিগত বছরের কথা, যখন এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তুতি চলছিল, সে সময় দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হলো। হত্যা, লুণ্ঠন ও রক্তপাত ঘটানো হলো। এতোটাই নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করা হয়েছিল যে, শেষ পর্যন্ত মার্শাল' ল এলো এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারলো না। কারণ ঐ চক্রটি বুঝেছিল, যদি এখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তবে তাদের জন্য জনগণের রায়ের বিপরীত দ্বিতীয় কোন আদর্শ আমদানীর সুযোগ থাকবে না। প্রথমত তাদের আদর্শ বিশ্বের কোথাও গণতান্ত্রিক পন্থায় প্রতিষ্ঠিত হয়নি। যেখানেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানেই একটি সুসংগঠিত সংখ্যালঘু দলের দাংগা-হাংগামার মাধ্যমে এবং দেশের অর্থনৈতিক অস্থিরতা বাড়িয়ে

রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নিয়েছে। এটাই এদের চিরন্তন পদ্ধতি। তাদের দৃষ্টিভংগি হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এখানে এ কাঙ্খিত বিপ্লবের জন্য ময়দান অনুকূল না হবে, ততক্ষণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে দেয়া যাবে না। গণতন্ত্রের আগমন দৃষ্টিগোচর হলেই তার পথ বন্ধ করা হবে। আর যদি এসেই যায়, তবে তা অচল করে দেয়া হবে। যে আদর্শ তারা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তার উপর পাকিস্তান কোনক্রমেই টিকে থাকতে পারে না। মুসলমানদের মধ্যে গোত্রীয়, আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক দ্বন্দ্ব তারা জেনে বুঝেই-সৃষ্টি করেছে, যেন এ দেশকে বিভক্ত করা যায়। টুকরো টুকরো করে দেয়া যায়। অতপর এর এক একটিকে সহজেই গ্রাস করা সম্ভব হয়। এটা সম্পূর্ণ এ রকম, যেমন একটি আস্ত রুটিকে গিলে ফেলা সম্ভব নয়, তবে কেটে কেটে একটি একটি টুকরো খুব পরিতৃপ্তির সাথে খাওয়া যায়। এরা ধারাবাহিকভাবে কয়েক বছর ধরে এ দেশে আঞ্চলিক এবং গোত্রীয় দ্বন্দ্ব বাধিয়ে রেখেছে, যাতে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি না হয়। তারা যেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং এরপর সহজভাবে বিচ্ছিন্ন অংশের ভেতর তাদের কাঙ্খিত বিপ্লব ঘটাতে পারে। একনায়কত্বের আঁচলে লালিত হয়ে তারা স্বীয়শক্তির অহমিকায় এমন ভ্রান্ত ধারণায় পতিত হয়েছিল যে, এ ভূখন্ডে ইসলামের নামে মুরদাবাদের শ্লোগানও দেয়া যায়। কালেমা তাইয়েবার ব্যানার ছিঁড়ে ফেলে এ যমীনে প্রকাশ্য ঘোষণা দেয়ার সাহস করে যে, আমরা ইসলামের পরিবর্তে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবো। কিন্তু তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা খুব শীঘ্রই দূর হয়ে গেছে। তাদের এটা বুঝা হয়ে গেছে যে, এখানে নগ্ন সমাজতন্ত্র নর্তন-কূর্দন করতে পারবে না।

তাদের একথাও জানা হয়ে গেছে যে, এ জাতি কখনো এখানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। এটা অনুভব করার পর তারা সমাজতন্ত্রের ইসলামী নাম রেখেছে। উদ্দেশ্য সেই সমাজতন্ত্রই, যা লেনিন ও মার্কসের কাছ থেকে তারা শিখেছে। ইসলামী সমাজতন্ত্র নাম এজন্য রেখেছে যে, এ জাতি খাঁটি সমাজতন্ত্র গিলবে না। সে কারণে ইসলামের জুব্বা তার গায়ে চড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তাদেরকে একথা জিজ্ঞেস করলে কোন জবাব দিতে পারবে না যে, এটা যদি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে গৃহীত হয়ে থাকে, তবে একে সমাজতন্ত্র বলার প্রয়োজন কি? কুরআন ও সুন্নাহতে যা আছে, তাতো শুধু ইসলামই। আপনারা কেন একথা বলছেন না যে, আমরা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা চাই? কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আদর্শ যদি প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাহলে আবার এই কুফরী আদর্শের উপর ইসলামের লেবেল লাগিয়ে কিভাবে জাতিকে ধোঁকা দিচ্ছেন? এটা পুরোপুরি ইসলামী খৃষ্টবাদ অথবা ইসলামী

বৌদ্ধ ধর্মের মতো। যখন এসবও চলতে দেখা যায়, তখন তাকে ইসলামী সাম্য এবং কখনো মুহাম্মদী সাম্য বলা হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য, সেই খাঁটি সমাজতন্ত্রই।

এটা আরেক প্রকার অকৃতজ্ঞতা। আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে সেই দ্বীন প্রদান করেছেন, যার চেয়ে বেশী ইনসাফ–সুবিচার অন্য কোন দীন–ধর্মে নেই। পৃথিবীতে এমন কোন জীবনব্যবস্থা নেই, যা আদলের ক্ষেত্রে ইসলামের নিকটবর্তীও হতে পারে, সমতুল্য হওয়া তো দূরের কথা। অথচ এ দীনকে পরিত্যাগ করে এমন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হচ্ছে, যা সরাসরি কুফরী। আর যার ভিত্তিই কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা এ চেষ্টায় নিয়োজিত, তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে আল্লাহ ছাড়বেন না। আমাদের জীবিতাবস্থায় যদি এ আদর্শ প্রতিষ্ঠা হয়, তবে এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে আমরা আল্লাহর আযাবে নিমজ্জিত হয়ে পড়বো। এটা সম্ভবই নয় যে, ইসলামের পরিবর্তে এখানে ভিন্ন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হবে, আর পাকিস্তান টিকে থাকবে। পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশগুলোকে কোন শক্তি যদি সংযুক্ত রাখতে সক্ষম থেকে থাকে, তবে তা ইসলাম ছাড়া আর কিছু নয়। একবার ইসলামকে মাঝখান থেকে সরিয়ে দেয়ার পর পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে কোন শক্তি একীভূত রাখতে সক্ষম হবে না এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলোকেও সংযুক্ত রাখতে পারবে না।

কঠিন পরীক্ষার সময়

বর্তমান সময় একটা কঠিন পরীক্ষার সময়। তেইশ বছর পর এখানে সাধারণ নির্বাচন হচ্ছে। এরপূর্বে কখনো নির্বাচন হয়নি। এবার পাকিস্তানের অধিবাসীদের তাদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করার সুযোগ এসেছে যে, কারা তাদের দেশ পরিচালনা করবে, কারা সংবিধান তৈরী করবে এবং তাদের ভবিষ্যত রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন্ মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এ সুযোগে সেই লোকেরাও নিজেদেরকে পেশ করছে, যারা সর্বদা এই ধারণায় মগ্ন যে, তাদের যমীদারী, পুঁজিবাদী কর্তৃত্ব আত্মীয়তার বন্ধন এবং অন্যান্য উপকরণ তাদেরকে স্বাভাবিকভাবেই এ অধিকার প্রদান করে যে, তারাই এখানে শাসন চালাবে। এরাই ইংরেজ এবং আইয়ুব খানের দোসর ছিল। এখন এ লোকেরাই আবার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। এজন্য পাকিস্তানের মুসলমানদের অত্যন্ত সতর্কতার সংগে চিন্তা করা দরকার যে, কারা দেশকে একীভূত করে অখন্ড রাখতে পারবে এবং কোন্ লোকেরা এখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে

সক্ষম এবং কারা ব্যক্তি স্বার্থ জলাঞ্জলী দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে দেশের কল্যাণে কাজ করছে।

আমি আপনাদেরকে কখনো একথা বলবো না যে, আপনারা জামায়াতে ইসলামীকে সমর্থন করুন। আমি বলতে চাই, চোখ খুলে নিজেরাই দেখুন, এখানে কোন্ ব্যক্তি এমন আছে, যে এ দায়িত্ব পালন করছে। যাকেই আপনারা এ রকম মানদণ্ডে দেখতে পান, সে জামায়াতে ইসলামীর হোক বা অন্য কোন দলেরই হোক, তাকে সফল করে তোলার জন্য আপনারা চেষ্টা করুন। পাশাপাশি এটাও দেখা দরকার যে, কোন্ লোকদের ব্যক্তিজীবন এবং অতীতের কর্মকাণ্ড একথার সাক্ষ্য দেয় যে, তারা এখানে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার উপযোগী। যারা ইসলামের নামে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করতে চায় এবং আগে যা করে এসেছে তাই করতে চায়, তাদের দ্বারা কারো প্রতারিত হবার ইচ্ছা থাকে, তো প্রতারিত হোক। আমাদের দায়িত্ব সতর্ক করে দেয়া। ঠিক তেমনিভাবে এটাও দেখা প্রয়োজন, কারা এখানে প্রকৃতপক্ষে ইনসাফপূর্ণ রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম—যারা স্বীয় স্বার্থ রক্ষায় রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলী দেয় না। বরং নিজ স্বার্থকেই রাষ্ট্রের জন্য উৎসর্গ করে থাকে। জামায়াতের প্রতি আস্থাশীল হওয়ার সিদ্ধান্ত যাদের রয়েছে, আমি তাদেরকে বলবো যে আপনাদের সিদ্ধান্ত যদি এটাই হয়, তবে আপনারা আপনাদের সময়, সম্পদ ও শ্রম জামায়াতকে সফল করার জন্য ব্যয় করুন। জামায়াতের পেছনে কোন বড় পুঁজিপতি অথবা যমীদার নেই। বিগত বাইশ বছর ধরে জামায়াত এ দেশে কাজ করে আসছে। বড় বড় পুঁজিপতি এবং বড় বড় জায়গীরদাররা কখনো এ জামায়াতকে পছন্দ করেনি। যদি আল্লাহর এমন কিছু বান্দাহ এ দলে পাওয়া যায়, তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এটা আল্লাহরই অনুগ্রহ হবে যে, এদের মধ্য থেকেও এমন কিছু লোক বেরিয়ে এসে এখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ শক্তি—সামর্থ ব্যয় করবে।

আমি আপনাদেরকে বলতে পারি, এখানে যদি ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সহায়তায় হবে। এই পুঁজিপতিদের সম্পদের দ্বারা হবে না। এখানে ইসলামী রাষ্ট্র হারাম অর্থ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। হারাম অর্থ এ কাজে জড়িতই হতে পারে না। ঘটনাক্রমে যদি হয়েই যায়, তবে তা হবে বরকতহীন। সর্বস্তরের মুসলমানকে এ কাজে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের জান-মাল ও সময় ব্যয় করতে হবে এবং সম্মিলিত সংগ্রামের মাধ্যমে শক্তি নিয়োজিত করে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে,

যেন এখানে সত্যিকার অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এ দেশ আপনাদেরই দেশ থাকে এবং এখানে ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত থাকে।

সম্মানিত ভাইয়েরা!

এ ভূখণ্ডে যদি আল্লাহ না করুন আসন্ন নির্বাচনের সুযোগে আমাদের ভুলের কারণে এখানে এমন লোক কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংসদের সদস্য হয়ে আসে, যারা এ দেশকে ঐক্যবদ্ধও রাখতে সক্ষম নয়, এখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতেও আগ্রহী নয়, এখানে ইনসাফের ভিত্তিতে কাজও করতে সক্ষম নয়; তাহলে আমাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আর কোন সুযোগ আসবে না। সুতরাং এ সুযোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করবেন। এটা নিতান্তই সংকটপূর্ণ সময়। আর এ সংকটপূর্ণ অবস্থায় নিজের মন ও বিবেককে ভালমত জিজ্ঞেস করা দরকার যে, এ মুহূর্তে তার কর্তব্য কি?*

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

[সাপ্তাহিক এশিয়া, লাহোর, ২১ জুন, ১৯৭০]

১ ১৩ জুন ১৯৭০ রাতে করাচীর নিশতর পার্কে অনুষ্ঠিত জনসভায় জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের আমীর মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর (রহঃ) ভাষণ।

ইসলামী সমাজ গড়ার কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণের গুরুত্ব

মুসলমানদের পাড়াগাঁর প্রতি তাকালে আমার বড়ই দুঃখ হয় যে, তাদের নৈতিক অধপতন কত চরমে গিয়ে পৌছেছে! তাদের বসতিগুলোতে আল্লাহর আইন অমান্যকারীরা সদম্ভে চলাফেরা করে। আর আল্লাহর আইনের অনুসারী এবং তাঁর দিকে আহ্বানকারীরা তিরস্কারের পাত্র।

ভগ্নি ও কন্যাগণ!

আপনারা জানেন, ইদানিং আমার স্বাস্থ্য বেশ খারাপ যাচ্ছে এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানোর জন্যই করাচী এসেছি। এ সময় দীর্ঘ বক্তৃতা করা আমার জন্য কষ্টকর। সংক্ষেপে আপনাদের উদ্দেশে কয়েকটি কথা আরয করতে চাই। বক্তব্যের পর আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবো।

উপমহাদেশে ইংরেজদের গোলামী এবং হিন্দুদের প্রাধান্যের কারণে মুসলমানদের সভ্যতা–সংস্কৃতি ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। তাই এগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্যই মুসলমানদের জন্য পৃথক আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ দেশটি প্রতিষ্ঠার পেছনে এ উদ্দেশ্যও ছিল যে, এখানে মুসলমান পুরুষ ও নারীরা সেই বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করবে, যা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, বিগত বছরগুলোতে সেই সভ্যতা–সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা তো দূরের কথা, বরঞ্চ তাকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যেই চেষ্টা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার এতোটা বলিষ্ঠ প্রচলন করা হয়েছে, যতোটা ইংরেজদের আমলেও ছিল না। তাদের সংস্কৃতির এই প্রচলন আমাদের পারিবারিক জীবনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং সামাজিক জীবনে রীতিমতো অগ্রগতি লাভ করছে এবং দেশবাসী দিন দিন ইসলাম থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আফসোস, এই সভ্যতা এখন মুসলমান নারীদেরকেও ভীষণভাবে প্রভাবিত করছে। এই প্রভাব এতোই মারাত্মক রূপধারণ করেছে যে, শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আমাদের নারী সমাজ থেকে এমন সব বালিকা ও বয়স্কা নারী বের হয়ে আসছে, যাদের মন–মস্তিষ্কে নাস্তিকতা চেপে বসেছে। তারা প্রকাশ্যে ইসলামী সভ্যতা, ইসলামের মাহাত্ম্য এবং ইসলামী আদর্শ ও দৃষ্টিভংগির সাথে বিদ্রূপ করছে।

সবচেয়ে বড় রক্ষক

পৃথিবীতে নারীরাই নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতা–সংস্কৃতির সব চেয়ে বড় রক্ষক হয়ে থাকে। তারা নিজেদের পারিবারিক পরিবেশে সেই সভ্যতা–সংস্কৃতিকেই প্রতিষ্ঠিত রাখে, যাতে তারা নিজেরা বড় হয়েছে। পুরুষরা খুব দ্রুত ভিনদেশী আদর্শ ও সভ্যতা–সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

কিন্তু নারীরা হিমাচলের মতো সেই ঝড়ের প্রতিরোধ করে। পরিবারে ভিনদেশী আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার বিরুদ্ধে তারা লৌহ দূর্গ বলে প্রমাণিত হয়। মুসলিম নারীরা সবসময়ই নিজেদের আদর্শ ও ঐতিহ্যের ব্যাপারে এরূপ অনমনীয় নীতি প্রদর্শন করেছে এবং নিজের পরিবার ও সন্তানদের ভিনদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির আক্রমণ থেকে রক্ষা করেছে। কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সভ্যতার অবিরাম আক্রমণ এবং ভ্রান্ত শিক্ষাব্যবস্থার কারণে তাদের মধ্যে এমন কিছু নারী সৃষ্টি হয়েছে, যারা নিজেদের ধর্ম ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে অপরিচিত থেকে যাচ্ছে। নাস্তিকতার স্তরে এসে পৌছার চাইতে বড় অধপতন মুসলিম নারীর জন্য আর কি হতে পারে। তারা এখন বিচার দিনকে প্রতারণা বলে অভিহিত করছে এবং ইসলামী নৈতিকতা ও সভ্যতাকে প্রতিক্রিয়াশীলতা বলে আখ্যায়িত করে লজ্জা শরমের শেষ বিন্দুটুকু পর্যন্ত খুইয়েছে। যতোদিন কেবল পুরুষদের মধ্যে এই বিকৃতি সীমাবদ্ধ ছিল, ততোদিন জাতির ধ্বংস এতোটা কঠিন বিপদজ্জনক ছিল না। সন্তানরা মায়ের কাছ থেকে কালেমা শিখতো, কুরআন শিখতো, ইসলামের রীতিনীতি ও বিধি-বিধান পালনে বাধ্য-বাধকতার শিক্ষা গ্রহণ করতো এবং তারা এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতো যে, তারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে। এর প্রভাব এতোটা কার্যকর ছিল যে, ইউরোপ-আমেরিকার চরম বস্তুবাদী পরিবেশে থেকেও তাদের সেই চেতনা নিবৃত্ত হতো না, যা প্রথম দিন থেকে তাদের মা তাদের মন-মগজে অংকিত করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন নারীদের মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং নাস্তিক্যবাদী বস্তুপুজা ছড়িয়ে পড়ার ফলে মুসলিম জাতি হিসেবে আমাদের অধপতনের বিপদ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছেছে। এখন আমাদের জন্য এটা বড়ই ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, মায়ের কোলও যদি মুসলমান না থাকে, তবে শিশুরা ইসলামী নৈতিক চরিত্র ও সভ্যতা-সংস্কৃতির পাঠ কোথা থেকে গ্রহণ করবে?

এ বিকৃতি রোধ করা নারীদেরই দায়িত্ব

নারীদের মধ্যে যে মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক রোগ ছড়িয়ে পড়ছে, তা প্রতিরোধ করা মুসলিম নারীদেরই কাজ। নারীদের মধ্যে কাজ করা পুরুষদের জন্য কঠিন। তাছাড়া একটি বিকৃতি দূর করার জন্য আরেকটি বিকৃত পথে অগ্রসর হবার অনুমতিও ইসলাম প্রদান করে না। যেসব নারী ইসলাম থেকে বিচ্যুত হতে চান না, তারা যদি জেগে উঠেন এবং অটলভাবে প্রতিরোধ করতে শুরু করেন, তবেই এ বিকৃতি ঠেকানো সম্ভব। নারীদের মধ্যে যারা

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করছে, আল্লাহর শোকর, তাদের মধ্যে বিপুল সংখ্যক নারী দীন ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়নি। তারা আল্লাহ এবং রাসূলকে মানে এবং ইসলামী বিধি-বিধান পালন করা নিজেদের কর্তব্য মনে করে। এরা যদি ইসলামী আন্দোলনে এগিয়ে আসে এবং ভ্রান্ত সভ্যতা-সংস্কৃতি দ্বারা যেসব নারীরা প্রভাবিত হচ্ছে, তাদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করে, তবে অতি শীঘ্রই নারীদের মধ্যে একটি সংস্কার বিপ্লব বা রেনেসাঁ সাধন হতে পারে।

পুরুষদের মধ্যে কাজ করে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, খুব কম লোকই বিকৃতিকে বিকৃতি হিসেবে পছন্দ করে। বিরাট সংখ্যক লোক বিকৃতিকে গ্রহণ করেছে ফ্যাশন হিসেবে। এ সংখ্যা পুরুষদের চাইতে নারীদের মধ্যে কম। বিকৃতিকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে, এরূপ সংখ্যা পুরুষদের তুলনায় নারীদের মধ্যে অনেক কম। নারীদের মধ্যে যতোটা বিকৃতি ছড়িয়ে পড়েছে, তা ছড়িয়েছে কেবল অজ্ঞতা, মূর্খতা, শিক্ষার অভাব এবং ফ্যাশনের অন্তরালে। নতুবা তারা ধর্ম বিরোধী নয়। যেসব নারী নারীমহলে কাজ করছেন, তারা বলছেন, বুদ্ধিমত্তার সাথে নারীদের সামনে কুরআন-হাদীসের বিধান উপস্থাপন করতে পারলে এবং ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা প্রদান করেছে, তা বুঝিয়ে দিতে পারলে খুব দ্রুত তারা তা গ্রহণ করে এবং নিজ পরিবেশে তা প্রচার ও কার্যকর করার জন্য জান-প্রাণ দিয়ে কাজ করে। তাই নারীদের মধ্যে যে বিকৃতি দেখা দিয়েছে, তার জন্য হতাশ হবার কারণ নেই। প্রয়োজন হলো দীনের কাজ করতে আগ্রহী নারীদের এগিয়ে আসা এবং বিকৃতির গতি সুকৃতির দিকে ঘুরিয়ে দেয়া। কিন্তু এ কাজ যারা করবেন, তাদের পহেলা কাজ হচ্ছে, দীন সম্পর্কে নিজেদের যথার্থ জ্ঞান লাভ করা। তাদের উচিত, মনোনিবেশের সাথে ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করা। তারপর নারীদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা, তাদের জন্য সামষ্টিক পাঠের ব্যবস্থা করা এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাত ও সহজ সহজ ইসলামী সাহিত্যের মাধ্যমে তাদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করা। একইভাবে স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরতা নারীদেরও উচিত, নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করা এবং সহপাঠিনীদের মধ্যে দীনি কাজের সূচনা করা। কিছু সংখ্যক নারী সংশোধনের দিকে এগিয়ে আসতে থাকলে আল্লাহর ইচ্ছায় সহসাই এ কাজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে।

নির্বাচনে নারীদের কর্তব্য

আরেকটি কথা আপনাদের বলতে চাই। সহসাই এ দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আপনারা জানেন, নির্বাচনে নারীদেরও সেরূপই মতামত

প্রদানের অধিকার রয়েছে, যেমনটি রয়েছে পুরুষদের। আর যেহেতু আমাদের জনসংখ্যার অর্ধেকই নারী, সে কারণে যতোক্ষণ না নারী-পুরুষ উভয়ই সমভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার জন্য কাজ করবে এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য ভোট দেবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমাদের উদ্দেশ্য হাসিল হতে পারবে না। ইসলামের হিতাকাংখী পুরুষরা যেমন ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ ব্যয় করে কাজ করছেন, তেমনি ইসলামের হিতাকাংখী মহিলাদেরকেও নিজেদের শক্তি-সামর্থ কাজে লাগাতে হবে এবং জনসংখ্যার এই অর্ধেককে ইসলামের পক্ষে ভোটদানের জন্য মানসিকভাবে তৈরী করতে হবে। পুরুষদের জন্য নারী মহলে গিয়ে কাজ করা সম্ভব নয়, এটা নারীদেরই কাজ। তাই এ দায়িত্ব তাদেরকেই পালন করতে হবে।

এমন সব নারী কর্মী তৈরী করা আপনাদের কর্তব্য, যারা ঘরে ঘরে গিয়ে সাধারণ নারী সমাজকে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে রায় দিতে রাজী করাতে সক্ষম হবে। এ কাজের জন্য প্রয়োজন বিরাট চেষ্টা-সাধনা ও পরিশ্রমের। আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। তাদের মধ্যে যদি ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার জযবা সৃষ্টি হয়, তবে দেশে ইসলামী বিপ্লবের মঞ্জিল খুব সন্নিকটে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন : ইসলামে নারী স্বাধীনতার স্বরূপ কি? ইসলামী সমাজে নারীকে কি মর্যাদা দেয়া হয়েছে? জামায়াতে ইসলামী ক্ষমতায় এলে নারীকে কি মর্যাদা প্রদান করবে এবং তাদের চাকরীর ব্যাপারে কি নীতি অবলম্বন করবে?

উত্তর : প্রশ্নটি ছোট হলেও বিস্তারিত জবাবের দাবী রাখে। আমি সংক্ষিপ্তভাবে এখানে প্রশ্নটির বিভিন্ন দিকের জবাব দিচ্ছি :

প্রথমত নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন। আজ পর্যন্ত কোন সমাজেই কোন প্রকার বন্ধনহীন স্বাধীনতা দেখা যায়নি। যে মানুষ কোন সমাজে বাস করে, সে বন্ধনহীন ও লাগামহীন স্বাধীন থাকতে পারে না। তাকে অবশ্যি সমাজের পক্ষ থেকে কিছু না কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হয়। সমাজের অর্থই তো হলো এর সদস্যদের কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং তাদের কর্মকাণ্ড কিছু নিয়ম-নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। পৃথিবীর প্রতিটি সমাজই মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেছে। আফ্রিকার জংলী সমাজ আর পাশ্চাত্যের বস্তুপূজারী সমাজ নিজ নিজ লোকদের উপর যে ভিন্ন ধরনের নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে, তার কথা আলাদা।

ইসলামী সমাজ মানুষের মৌলিক অধিকার এবং তার জন্মগত স্বাধীনতার প্রতি লক্ষ্য রেখে পুরুষ ও নারীর উপর কেবল সেই সব নিয়ন্ত্রণই আরোপ করে, যেগুলো তাদের সত্তার জন্য কল্যাণকর এবং সামগ্রিকভাবে গোটা মানবতার জন্য সাফল্যের চাবিকাঠি। ইসলামী সমাজ পুরুষ ও নারী উভয়কেই সর্বাধিক মানবাধিকার প্রদান করে এবং কোন প্রকার অমানবোচিত নিয়ন্ত্রণ তাদের উপর আরোপ করে না। এই আলোচনা থেকে ইসলামে নারী স্বাধীনতার স্বরূপ স্পষ্ট হয়েছে আশা করি।

নারীর মর্যাদা

আপনার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ ইসলামী সমাজে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে। ইসলামী সমাজ নারীকে ঠিক সেই মর্যাদাই প্রদান করে, যা তার প্রকৃতি (ফিতরাত) তাকে প্রদান করেছে। পৃথিবীতে পূর্বেও এমন সমাজের অস্তিত্ব ছিল এবং বর্তমানেও আছে, যেখানে নারীর মর্যাদা দাসী কিংবা চাকরাণীর চেয়ে বেশী নয়। কোন কোন সমাজে তাকে থালা–পাত্রের চাইতে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এমন সমাজও আছে, যেখানে নারীকে সম্পূর্ণ পশু মনে করা হয়। সেখানে তাদের সাথে সেই আচরণই করা হয়, যা করা হয়ে থাকে পশুর সাথে। তথাকথিত আধুনিক সভ্য সমাজে ততোক্ষণ পর্যন্ত নারীর গুরত্ব স্বীকারই করা হয় না, যতোক্ষণ না সে নিজেকে পুরুষ বানিয়ে দেখায়। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার উপর যে প্রকৃতিগত দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন, তা পালন করা যেহেতু পুরুষের জন্য অসম্ভব, সে জন্য তথাকথিত আধুনিক সভ্য সমাজের পুরুষরা চাচ্ছে, নারী নিজের প্রকৃতিগত দায়িত্বও পালন করুক, আবার পুরুষেরও অর্ধেক দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নিক। এটা নারীর উপর একটা বিরাট নির্যাতন ও যুলুম। এটা নারীর জন্য প্রগতি নয়, প্রবঞ্চনা। পক্ষান্তরে, ইসলাম নারীকে ঐ মর্যাদাই প্রদান করে, যা তার প্রকৃতিই তার জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছে। ইসলাম পুরুষের দায়িত্ব নারীর উপর চাপায় না। আবার নারীর দায়িত্বও পুরুষের উপর চাপায় না।

আপনি এ সম্পর্কে জামায়াতের নীতি জানতে চেয়েছেন। জামায়াতে ইসলামী তো প্রতিষ্ঠিতই হয়েছে আল্লাহর যমীনে আল্লাহ প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থাকে বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। আল্লাহ তায়ালা যদি জামায়াতে ইসলামীকে দেশ পরিচালনার পরীক্ষায় ফেলেন, তবে সে সমাজে নারীকে ঠিক সেই মর্যাদাই প্রদান করবে, যা ইসলাম তাকে প্রদান করেছে।

নারী ও চাকরী

আপনি নারীদের চাকরীর ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন। আপনার প্রশ্নের এই অংশের সরাসরি জবাব দেবার পরিবর্তে আপনাকে আমি জিজ্ঞেস করছি, সত্যিই কি ঐ মহিলার অবস্থা ঈর্ষা করার যোগ্য, যাকে স্বামীর সেবাও করতে হয়, ঘরের দায়িত্বও পালন করতে হয়, সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্বও পালন করতে হয়, আবার রুটি-রুজির ধান্দায়ও ফিরতে হয়? যে ঘরে স্বামী-স্ত্রী দু'জনই উপার্জনের জন্য বের হয়ে যায়, সন্তানদেরকে রাস্তা-ঘাটে ভবঘুরে অবস্থায় রেখে যায়, কিংবা কোন নার্সারীতে সঁপে যায়, অতপর সন্ধ্যায় যখন শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায় ঘরে ফেরে, তখন তাদেরকে আদর করা এবং তাদের দুঃখ-সুখ শোনার পরিবর্তে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে, আর রাত শেষ হবার সাথে সাথেই পুনরায় ডিউটিতে হাজিরা দিতে চলে যায়, সে সংসারকে কি সুখের স্বর্গ বলা যেতে পারে? খোদা না করুন, নারীদের উপর কখনো এ বিপদ চেপে বসলে, সন্তানদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর এসে পড়লে ইসলামী সমাজ তাকে এমনি অসহায় ফেলে রাখবে না, তাকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে এবং প্রয়োজন হলে সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ উপার্জনের ব্যবস্থা করে দেবে।

আমরা কখনো নারীদের চাকরীর বিরোধী নই। যেসব বিভাগ নারীরাই চালানোর উপযুক্ত, সেগুলো তাদের উপরই ন্যস্ত করা হবে। যেমন, নারীদের চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তারদের প্রয়োজন হবে, নীচ থেকে উপর পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষিকার প্রয়োজন হবে। এসব বিভাগে কেবল নারীদের নিকট থেকেই সেবা গ্রহণ করা হবে। আর এ সেবা তাদের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভেরও মাধ্যম হবে। তবে একথা মনে রাখবেন, আমরা সকল প্রকার চাকরীর ময়দানেই নারীদেরকে নিয়োগ করতে চাই না। ঐ সমাজকে বেহেশতী সমাজই মনে করা উচিত, যেখানে নারীদের উপর তাদের প্রকৃতি বিরোধী বোঝা চাপানো হবে না এবং তাদেরকে সংসারের রাণীর মর্যাদা প্রদান করা হবে।

পাশ্চাত্য সমাজের রেখাচিত্র

আমাদের দেশে নারী স্বাধীনতা এবং নারীর চাকরীর ধারণা পাশ্চাত্য থেকে আমদানী হয়েছে। যারা স্বচক্ষে পাশ্চাত্যের সমাজ জীবন অবলোকন করেছেন, তারা জানেন, সেখানকার নারীরা কতোটা করুণার পাত্রী।

জনৈক লেখক তার বইতে একটি ঘটনা লিখেছেন। তিনি প্যারিসে একজন স্থানীয় লোকের সাথে সাক্ষাত করতে যান। সিঁড়ি বেয়ে উঠার সময় দেখেন, সিঁড়িতে বসে একটি নারী কাঁদছে। তিনি যখন লোকটির সাথে সাক্ষাত করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলেন, তখনো দেখেন সে বসে বসে কাঁদছে। বললেন, কেন তুমি কাঁদছো? সে জবাব দিল, আপনি যার সাথে সাক্ষাত করতে গেলেন, তিনি আমার বাপ। তার ঘরের একটি কক্ষ ভাড়া নেয়ার জন্য আমি তার কাছে এসেছি। কিন্তু তিনি আমাকে ভাড়া দিতে অস্বীকার করলেন। বললেন, অন্য জায়গায় ভাড়া দিলে তিনি বেশী ভাড়া পাবেন। সুতরাং আমার কাছে ভাড়া দিয়ে অর্থনৈতিক ক্ষতি বরদাস্ত করতে পারবেন না। সে কাঁদতে কাঁদতে লোকটিকে বলল, এখন আমি কোথায় মাথা গুঁজবো?

এই হচ্ছে পাশ্চাত্য সমাজের চিত্র। যেখানে পিতা-মাতা নিজ সন্তানদেরকে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং কোন খোঁজ খবরও নেয় না। সেখানে কতোটা বিপদে নিমজ্জিত হয়ে নারীরা উপার্জনের পথ ধরে, তা সহজেই অনুমেয়।

আপনারা কেন চাচ্ছেন যে, আমাদের দেশের নারীদের উপরও সেই বিপদ চেপে বসুক। ঐ সমাজকে তো বিরাট অনুগ্রহই মনে করা উচিত, যেখানে পিতা-মাতা সন্তানের লালন পালন ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত কন্যা সন্তানের দায়িত্ব বহন করে, যতক্ষণ না একটি উপযুক্ত ছেলে খুঁজে বের করে মেয়েকে তার দায়িত্বে ন্যস্ত করতে পারে ; যেখানে স্বামীরা স্ত্রীদের যাবতীয় বোঝা বহন করে তাদেরকে রুটি-রুজির চিন্তা থেকে মুক্ত করে তাদের উপর সংসারের কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেছে। প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের সমাজই আপনাদের জন্য জান্নাত সমতুল্য। পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী প্রগতির লোভে নিজেদের হাতে এ জান্নাতকে খুইয়ে বসবেন না।

জীবনের নজরানা

প্রশ্ন ঃ মাওলানা, আপনি দীন ইসলামের যে মহান খেদমত করছেন, তার স্বীকৃতির হক আদায় করা আমাদের জন্যে সম্ভব নয়। কিন্তু আমার মতো নারীর জীবন কি কাজে আসবে? আমার বাসনা, আমার বাকী জীবনটা যদি আল্লাহ তায়ালা আপনাকে দান করেন এবং আপনার দ্বারা দীন ইসলামের সেই কাজ করিয়ে নেন, যদ্বারা কেবল পাকিস্তানেই নয়, বরঞ্চ সারা বিশ্বে পুনরায় ইসলামী বিপ্লব সাধিত হবে।

উত্তর : এ ব্যাপারে কেবল এতোটকুই আরয করবো যে, আমার নগণ্য খেদমতের যে কদর আমার ভাই-বোনদের অন্তরে রয়েছে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এর পুরস্কার প্রদান করুন। আল্লাহর দরবারে কোন কিছুরই কমতি নেই। তিনি যদি আমাকে দীর্ঘ জীবন এবং সামর্থ দান করতে চান, তবে তাঁর অদৃশ্য ভাণ্ডার থেকেই প্রদান করবেন। এজন্য আপনার জীবনের নজরানা গ্রহণ করার প্রয়োজন তাঁর নেই। আপনার জীবন আপনার জন্যে আর আমার জীবন আমার জন্যে। আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাঁর দীনের কাজের জন্য শান্তি ও সুস্থতা দান করুন এবং আমাকেও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দীনের খেদমত করার তাওফীক দান করুন।

অপবাদ-অভিযোগের জবাব

প্রশ্ন : জামায়াতে ইসলামী এবং আপনার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন রকম অপবাদ দেয়া হচ্ছে। অনেক রকম প্রশ্ন ও অভিযোগ তারা উত্থাপন করছে। অনেক সময় এসব অপবাদ ও অভিযোগের জবাব আমাদের জানা থাকে না। এমতাবস্থায় আমরা কি করবো?

উত্তর : এমন কোন অভিযোগ বা প্রশ্ন নেই, যার জবাব আমাদের সাহিত্যে বর্তমান নেই। সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমে সেগুলোর জবাব দেবেন। আর তারা যে মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদ রটাচ্ছে, সেগুলো এক কানে শুনবেন, আরেক কানে উড়িয়ে দেবেন। এ ধরনের মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদের জবাব দেবার কোন প্রয়োজন নেই।

পর্দা ও সহশিক্ষা

প্রশ্ন : মাওলানা, আমি মেডিকেল কলেজের ছাত্রী। পর্দা করার পক্ষপাতি। কিন্তু মেডিকেল কলেজে রয়েছে সহশিক্ষা। এমতাবস্থায় আমি কি করবো?

উত্তর : নারীদেরকে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করা হোক, এটা আমরা চাই। কিন্তু তাদের জন্যে অবশ্যি পৃথক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যতোদিন এটা হচ্ছে না এবং নারীদেরকে সহশিক্ষার অধীনেই মেডিকেল কলেজে পড়তে বাধ্য হতে হয়, ততোদিন তাদেরকে ইসলামের সীমাসমূহের প্রতি অধিক অধিক দৃষ্টি রাখা উচিত। পর্দার সাথে কলেজে যাওয়া-আসা উচিত। মুখ এবং হাতের কেবল ততটুকুই খোলা উচিত, যেটুকু খোলা ছাড়া

কোন অবস্থাতেই শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না। শিক্ষক এবং ছাত্রদের সাথে মেলা-মেশা করা উচিত নয়। এরচেয়ে বেশী কোন পরামর্শ দিতে পারছি না।

স্বামীর বিরোধিতা

প্রশ্ন ঃ আমি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থক। কিন্তু আমার স্বামী জামায়াত বিরোধী। আমাকে বলুন, তাকে কিভাবে সঠিক পথে আনবো?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আপনার পক্ষ থেকে যতোটা উত্তম প্রচেষ্টা চালানো যায়, তা চালিয়ে যান। কিন্তু মনে রাখবেন, কোন অবস্থাতেই ঘরের পরিবেশ যেন বিষাক্ত না হয়। আপনার স্বামী যদি ইসলামকেই সত্য মনে করেন আর জামায়াতে ইসলামী যে পন্থায় কাজ করছে, তা পছন্দ না করেন, তবে তাকে তার অনুসৃত পথেই চলতে দিন। দাম্পত্য জীবনকে তিক্ত ও বিরক্তিকর করার প্রয়োজন নেই। আর তিনি যদি ইসলামের পরিবর্তে কুফরী সমাজকে সঠিক মনে করেন, তবে আপনাকে আপনার মতের উপর অটলতা প্রদর্শন করা উচিত এবং এমতাবস্থায় তার মত মেনে নেয়া ঠিক হবে না।

ইসলামের প্রথম যুগে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। স্ত্রীরা ঈমান এনেছেন আর স্বামীরা থেকেছেন কাফির। এমতাবস্থায় তারা স্বামীদের যুলুম-নির্যাতন সহ্য করেছেন। কিন্তু আল্লাহর পথ ত্যাগ করা পছন্দ করেননি।*

(সাপ্তাহিক এশিয়া, লাহোর, ২৮ জুন, ১৯৭০)

* ১৯৭০ সালের ১৪ জুন বাদ মাগরিব মাওলানা করাচীতে এক মহিলা সমাবেশে ভাষণ দেন এবং ভাষণের পর মহিলাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। এটি সেই ভাষণ ও প্রশ্নোত্তরের সার সংক্ষেপ।

করাচীবাসীর অভিনন্দনপত্র
ও
তার জবাবে মাওলানার ভাষণ

আমার সারা জীবনের অধ্যয়ন আমাকে বলছে, যাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় মিথ্যা, ধোঁকাবাজী ও ষড়যন্ত্রের ভিত্তিতে এবং যাদের জন্যে সত্য–সততার আলোকে আসা বিপজ্জনক, এসব নৈতিক কাপুরুষদের কাঠের হাড়ি চুলোয় চড়ানোর পর কখনো টিকে থাকেনি এবং কখনো টিকে থাকতে পারে না।

আমরা অংগীকার করছি, হক ও বাতিলের এ জেহাদে আমরা আপনার ঘনিষ্ঠ সৈনিক হয়ে লড়াই করবো।

সম্মানিত অতিথি!

জীবনের এক মনোরম এবং স্মরণীয় মুহূর্তে, পরম সৌভাগ্যবশতঃ আজ আমরা যে আপনার সাথে মিলিত হতে পেরেছি, সেজন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করতে পারবো না। প্রকৃতপক্ষে সকল প্রশংসার যোগ্য কেবল আল্লাহ তায়ালাই। সেই আল্লাহই যিনি প্রত্যেক যুগে তাঁর দীনের হিফাজতের ব্যবস্থা করে থাকেন এবং যিনি কুফর ও খোদাদ্রোহিতা, নাস্তিকতা, রাজনৈতিক পরাভব ও মানসিক গোলামীর এ যুগে স্বীয় দীনের খিদমাত ও ইসলামের শক্তিমত্তা ও পরাক্রমের রক্ষণাবেক্ষণের বিরাট মর্যাদা আপনাকে দান করেছেন। ইসলামের ওহে মহান সেবক! আমরা আপনার দীনী খিদমাত ও অবদানকে স্বীকার করি এবং আপনার শুভাগমনের জন্য আন্তরিকভাবে শুকরিয়া আদায় করছি। সেই সাথে সুগভীর ভালবাসা ও আন্তরিকতার নযরানা পেশ করছি।

মহান মেহমান!

নিসন্দেহে মুসলমানরাই একমাত্র জাতি, যারা জাতি হিসেবে গুমরাহীকে কখনো মেনে নেয়নি। এরা অন্যায় ও পাপাচারকে জাতিগতভাবে কখনো নীরবে সহ্য করেনি। এদের সমাজ সত্যের দিকে আহবানকারী এবং সমাজ সংস্কারের প্রচেষ্টাকারী থেকে কখনো শূন্য ছিল না। হে মহান নেতা, আমরা স্বীকার করছি যে, আপনার দাওয়াত এবং তার হৃদয়গ্রাহী ভংগী, জামায়াতের সাংগঠনিক শৃংখলা এবং এর কর্মপদ্ধতি আমাদের জাতির জন্যে প্রেরণাদায়ক প্রমাণিত হয়েছে। গোটা জাতির মাঝে এটা নবচেতনার সৃষ্টি এবং নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছে। নতুন আশা, উদ্যম এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

জাতির পরম বন্ধু!

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় জীবন অধপতনের যে চরম সীমায় পৌঁছেছিল, তা দেখে কল্পনাই করা সম্ভব হয়নি যে, ইসলামী রাষ্ট্র-ব্যবস্থার চিন্তাধারা কোন মুসলমানের মাথায় আসতে পারে। কিন্তু আমরা

দেখেছি, আপনি অবিরাম প্রচেষ্টার দ্বারা সমগ্র জাতিকে শুধু এ পথের সন্ধানই দেননি, বরং তা অর্জনের জন্যে সমগ্র জাতির মনে এমন অস্থিরতা ও আগ্রহ জাগিয়ে দিয়েছেন, যাকে দুনিয়ার কোন মোহ পরাজিত করতে পারবে না। কোন ভীতি ও প্রলোভন দ্বারা এ আকাংখা দমন করা সম্ভব হবে না।

হে মহান নেতা!

এটা সত্য যে, খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতা মুসলমানদের মন ভেংগে দিয়েছিল। সমগ্র জাতি বিপর্যয় এবং নিষ্ক্রিয়তার শিকারে পরিণত হয়েছিল। তাদের চিন্তা ও কর্মশক্তি পংগু ও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজদের প্রতিপত্তি এবং হিন্দুদের ষড়যন্ত্র তাদের শক্তি–সামর্থকে ধ্বংস করে ফেলেছিল। চতুর্দিক থেকে আমাদের তাহযীব, তামাদ্দুন, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার উপর আক্রমণ চলছিল। মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়েছিল যে, কি করবে। সেই সংকটময় মুহূর্তে আপনি নিজ কলম দ্বারা যে প্রতিরোধব্যূহ রচনা করলেন, সত্যের দিকে যে উদাত্ত আহবান জানালেন, যে জামায়াত গঠন ও তার যে শৃংখলা প্রতিষ্ঠা করলেন, তা কেবল আপনার উদ্যম, একনিষ্ঠতা, আল্লাহর জন্য নিবেদিত হওয়া, দৃঢ়তা এবং প্রজ্ঞা ও দূরদর্শীতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

হে সত্যের নিশানবাহী!

আমরা আপনার আল্লাহপ্রদত্ত যোগ্যতা ও প্রতিভার প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং আপনার সময়োপযোগী উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করছি। ইংরেজরা এ দেশ ছেড়েছে ঠিকই, কিন্তু গোটা জাতিকে তাদের গোলামদের হাতে সমর্পণ করে গেছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বটে, কিন্তু একে 'নাপাকিস্তান' বানানোর ষড়যন্ত্র চতুর্দিক থেকে চলে এসেছে। ইংরেজদের পাকিস্তানী ক্রীড়নকরা নিজ জাতিকে পদানত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল। নাস্তিকতার প্রেতাত্মারা নাস্তিক্যবাদের প্রচারে অগ্রসর হয়েছিল। ধর্মহীনতার ঝনঝাবাত্যা বইছিল চতুর্দিকে। আর পাপাত্মারা অশ্লীলতার প্রকাশ্য মহড়া প্রদর্শন করছিল। হে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মরদে মু'মিন! আমরা অবলোকন করেছি, আপনি পূর্বাহ্নেই সেইসব অনাগত আপদের আগমনের কথা অনুমান করতে পেরেছিলেন, যা অনেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি আজও দেখতে পায়নি। আপনি যদি এ

সংকটাপন্ন সময়ে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে এগিয়ে না আসতেন, তবে জানিনা আজ আমাদের পরিণাম কি দাঁড়াতো।

ইসলামী আন্দোলনের হে বীর সেনানী।

আমরা আমাদের জাতীয় জীবনের সেই বেদনাদায়ক অধ্যায়কে কখনো ভুলে যেতে পারি না, যখন সারাদেশ ছিল সংকটাপন্ন, যখন দেশের একটি অংশে সামরিক শাসন জারী ছিল এবং সত্যের অনুসারীদের জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলা হয়েছিল। তাদের দিয়ে জেলখানা ভরে দেয়া হয়েছিল। যুলুম ও নিস্পেষণে গোটা দেশ তারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল এবং দেশের সেনাবাহিনী নিজ জাতিকে লক্ষ্য করেই বন্দুক তাক করছিল। সেই সংকটকালে আপনি যে কর্মসূচী পেশ করেছেন, যে উদ্দীপনার প্রমাণ দিয়েছেন এবং সমগ্র জাতিকে যে পথনির্দেশনা দিয়েছেন, তা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। আমরা সেই মুহূর্তগুলোকে কিভাবে ভুলে যেতে পারি, যখন দীনে হকের জন্য আপনি ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন এবং ফাঁসীর হুকুম শুনেও মুচকী হাসি হেসেছিলেন। আল্লাহর ইচ্ছার উপর সর্বাবস্থায় সন্তুষ্ট হে মহান নেতা! আমরা আপনার কাছে চির ঋণী। সমগ্র জাতি মিলিতভাবেও যদি আপনার এই দানের প্রতিদান দিতে চাই, তাহলে নিসন্দেহে তা সম্ভব নয়। আপনার দৃঢ়তা ও সাহসিকতা এ সময় জাতিকে কোথা থেকে কোথায় পৌছে দিয়েছিল এবং সত্যের জন্যে বাঁচা ও মরার যে মহান শিক্ষা আপনি দিয়েছিলেন, তা আজো অনুকরণীয় আদর্শ হয়ে রয়েছে। আমরা এজন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ফাঁসির মঞ্চ বিজয়ী হে দুঃসাহসী।

আইয়ুব খানের একনায়কত্ব সমাজতন্ত্রের সাপকে দুধকলা খাইয়ে স্বজাতিকেই দংশন করাবার জন্য লালন পালন করছিল। আমরা আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে; আপনি সঠিক সময়ে সেই সাপ ও তার গর্তগুলোকে সনাক্ত করেছেন। অতপর আপনার দক্ষ চেষ্টা–সাধনা দ্বারা একনায়কত্বের শিকড়ও কেটে দিয়েছেন। আপনি কেবল মস্তকই চূর্ণ করেননি, বরং তার গহ্বরগুলোকেও চিরতরে বন্ধ করে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন, যেখান থেকে আর কখনো এ বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে আর ছোবল দিতে না পারে।

হে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন অতিথি।

এটা বাস্তব যে, ইউরোপের অশ্লীল অপসংস্কৃতি, ধর্মহীন রাজনীতি, নোংরা সমাজজীবন এবং খোদাভীতিহীন সভ্যতার তান্ডব এ দেশেও বইতে শুরু করেছিল। এর প্রতিটি ঝাপটা এতোই বিপজ্জনক ছিল যে, আগে থেকেই ভগ্নপ্রায় আমাদের সমাজতরী প্রায় ডুবু ডুবু হয়ে যাচ্ছিল। বিদগ্ধ মহল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। চিন্তাশীল লোকেরা ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং কল্যাণকামীদের হৃদয় কেঁপে উঠেছিল। প্রত্যেকে অসহায় হয়ে পড়েছিল এবং চরম অসহায়ত্বের কারণে একে অপরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করছিল। হে প্রাজ্ঞ জননেতা! আপনাকে অভিনন্দন যে, আপনি কোন বাঁধ নির্মাণ করে সেই বন্যার মুকাবিলা করেননি বরং বন্যার মুকাবিলায় আরেক বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, যার ঢেউগুলো শয়তানী বন্যার স্রোতের গতিই শুধু পাল্টে দেয়নি, বরং আজ সেই সত্যের সয়লাব এত উঁচু দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে যে, অদূর ভবিষ্যতে ইনশাআল্লাহ তা সকল বাতিলের সয়লাবের উপরে বিজয় লাভ করবে।

ইসলামী চিন্তাবিদ!

আপনার একনিষ্ঠতা এবং আন্তরিকতা কার্যকর অবদান রেখেছে। আমরা জানি যে, ছাত্র ও যুব সমাজ আপনার সংগে রয়েছে। শিক্ষকদের অধিকাংশই আপনার সংগে গভীর সম্পর্ক ও ভালবাসা পোষণ করেন। মজুর ও শ্রমিক শ্রেণী আপনার অনুসারী। আইনজীবী সমিতি আপনার ও আপনার সংগঠনের প্রতি আস্থাশীল। উলামাদের বিরাট অংশ আপনার সংগে রয়েছে। শিক্ষিত ও সুধীমহল আপনার অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞ। রাজনীতিবিদেরা আপনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টির স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। দেশের সকল শ্রেণীর মানুষ আপনাকে একজন শীর্ষস্থানীয় প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ মনে করে। সর্বোপরি সকল শিক্ষিত এবং বিবেকবান মানুষ আপনার সহযাত্রী। প্রত্যেকে আপনাকে জাতীয় আশা-আকাংখার রক্ষাকবচ বিবেচনা করে। আমরা মনে করি, জাতির লাগাম আপনার হাতেই রয়েছে। এখন আপনি আমাদেরকে সেই কাংখিত সামগ্রী ফিরিয়ে দিন—যা হারিয়ে পৃথিবীতে আমরা অবহেলিত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কেননা হে জাতির প্রহরী! সারা বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে আজ কেবল আপনিই এ যোগ্যতার অধিকারী।

সাইয়েদ মওদূদী।

আপনি, আপনার জামায়াত এবং জামায়াতের শৃংখলা ও সংহতি মানুষের হৃদয়ের জগতকে পাল্টে দিয়েছে। শুরুতে ইসলাম উপলক্ষে যে শৃংখলা ও সংঘবদ্ধতা প্রদর্শিত হয়েছিল, তা মানুষকে এ বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করেছিল যে, আপনি এবং আপনার জামায়াতের হাতে দেশ ও জাতির ভবিষ্যত নিরাপদ। আমরা করাচীবাসীর পক্ষ থেকে আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, আমরা আপনার সাথে রয়েছি এবং এ চূড়ান্ত সংগ্রামে যাতে বর্তমানে আপনার জামায়াত জড়িত, অংগীকার করছি যে, তা শুধুমাত্র নীরব দর্শকের মতোই তাকিয়ে দেখবো না। বরং আপনার পার্শ্বে থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এ সংগ্রামে অংশ নেবো। আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকে এ অংগীকার পালন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

আমরা আপনাকে জানাই সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

মাওলানা সাইয়েদ আবদুল জব্বার
সভাপতি, সম্বর্ধনা কমিটি
ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ
১৭ জুন, ১৯৭০।

অভিনন্দন পত্রের জবাব

কুফরী শক্তির মুকাবিলায় আপনাদেরকে কমপক্ষে পাঁচ গুণ শক্তি সঞ্চয় করতে হবে।

সম্মানিত সুধীমণ্ডলী।

আমর জন্য সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো অভিনন্দন পত্রের জবাব দেয়া। বস্তুত আমার নিজের সম্পর্কে কখনোই এ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়নি যে, আমি আল্লাহর দীনের কোন বড় খিদমাত আঞ্জাম দিয়ে ফেলেছি। আমি তো এটাই মনে করি যে, আমি নিজের কর্তব্য পালন করতে পারিনি। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহ তায়ালারই অনুগ্রহ এবং তাঁরই ইহসান যে, আমার দ্বারা দীনের যে যৎসামান্য খিদমাত হচ্ছে, আল্লাহর নেক বান্দারা এর খুবই উচ্চ মূল্যায়ণ করেছেন। এ থেকে এটাই আশা করা যায় যে, আল্লাহর কাছেও আমার এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মর্যাদা দেয়া হবে। কোন বান্দার মাগফিরাত লাভেরও এটা একটা উপায় যে, তার কোন অবদান আল্লাহর নেক বান্দাদের মাঝে এতোটা গৃহীত হয়ে যায় যে, আল্লাহর কাছেও তা পুরস্কার লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

আমি সংক্ষিপ্তভাবে আপনাদের কাছে বলতে চাই যে, পৃথিবীতে শুধু যে বর্তমানেই আর এমন কোন দেশ নেই, যা ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বরং বিগত বহু শতাব্দীর ইতিহাসেও এমন কোন রাষ্ট্রের সন্ধান পাওয়া যায়নি, যা একান্তভাবে ইসলামের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তানই এ ক্ষেত্রে এমন একটি দেশ, যাকে মুসলমানরা ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠা করেছিল এবং এই আকাংখা পোষণ করেছিল যে, এখানে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ হবে এবং তারা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করতে সক্ষম হবে। আমি বিশ্বের বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছি এবং প্রত্যেক এলাকার মুসলমানদের সংগে মিলিত হবার সুযোগ ঘটেছে। প্রত্যেককে আমি একথাই বলতে শুনেছি যে, পাকিস্তানই একমাত্র দেশ, যেখানে ইসলামের পুনরুত্থানের সূচনা হতে পারে। পাকিস্তানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন হলে আশা করা যায় বিশ্বের অন্যান্য মুসলিম দেশেও ইসলামী শাসনব্যবস্থা কায়েম হবে এবং

সমগ্র বিশ্বে ইসলামের নবযুগের সূচনা হবে। এ মুসলমানরা একথাও বলে যে, আল্লাহ না করুন, যদি আপনারা ব্যর্থ হন, তবে এটা শুধু পাকিস্তানেরই ব্যর্থতা হবে না, বরং পৃথিবীর সকল মুসলিম দেশেও এর মন্দ প্রভাব ছড়িয়ে পড়বে এবং কার্যত সর্বত্রই ইসলামের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে।

ঘুমন্ত জাতির জন্য চাবুক

যে মূলনীতির উপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তার স্বাভাবিক দাবী ছিল, এখানে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন আদর্শ কায়েম হবে না। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য যে, এখানে এমন লোকেরা ক্ষমতাসীন হলো, যারা এখানে ইসলামী সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কোন গুরুত্বই অনুভব করেননি। পুরো ২৩ বছর মুসলমানদের গুমরাহ ও ইসলাম থেকে নিরাশ করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করা হয়েছে। উপরন্তু সম্ভব হলে এরা গোড়া থেকেই ইসলামকে খতম করে দিতে দ্বিধা করতো না। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি তবে ক্রমান্বয়ে অবস্থা এত দুর গড়িয়েছিল যে, কিছু লোক ইসলামের মুকাবিলায় এক কুফরী মতাদর্শ নিয়ে মাঠে নেমেছে এবং প্রকাশ্যে এ ঘোষণা দিতে শুরু করেছে যে, এবার পাকিস্তানে নতুন করে সমাজতন্ত্রের পরীক্ষা চালানো হবে। এটা আল্লাহ তায়ালারই অনুগ্রহ ছিল যে, সমাজতন্ত্রের শ্লোগান ঘুমন্ত জাতির বিবেকে এক কষাঘাত প্রমাণিত হয়েছে এবং তারা তড়াক করে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। বস্তুত সমাজতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ যদি সামনে না আসতো, তবে প্রবল আশংকা ছিল যে, বিগত বাইশ বছর যাবত এ জাতিকে নৈতিক অবক্ষয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অধপতন, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ এবং চিন্তা ও কর্মের পশ্চাদপদতার যে আফিম খাওয়ানো হয়েছিল, তা হয়তো তাদেরকে এতোটাই মাতাল করে রাখতো যে, তাদের উপর কোন বিপর্যয় নেমে আসলে তারা তা অনুভবই করতে পারতো না।

কোন জাতির মধ্যে যদি নিজের ক্ষতির অনুভূতিও অবশিষ্ট না থাকে, তবে সে জাতির জীবিত থাকার কোন প্রমাণ যে খুঁজে পাওয়া যাবে না, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এটা আল্লাহ তায়ালার বিরাট অনুগ্রহ যে, সমাজতন্ত্রের চ্যালেঞ্জ আসার দেড় বছরের ব্যবধানে এ জাতি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, তারা মৃতও নয়, ঘুমন্তও নয়। নিজ দীন সম্পর্কে গাফিলও নয়। বরং সকল প্রকার বিপদের মুকাবিলায় পূর্ণরূপে সতর্ক এবং প্রস্তুত।

কুফরী শক্তি এবং ইসলামী শক্তির মুকাবিলা

বিগত দেড় বছরে আমাদের সামনে এ সত্যও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, যারা এ দেশে ভিন্ন আদর্শ কায়েম করতে চায়, তারা সংখ্যায় অত্যন্ত নগণ্য। তেমনিভাবে আমাদের এটাও জানা হয়ে গেছে যে, যারা আঞ্চলিক, গোষ্ঠীগত এবং ভাষাভিত্তিক সংকীর্ণতায় দুষ্ট জাতীয়তাবাদী মতবাদের ধারক-বাহক, তারাও অতি নগণ্য। কিন্তু এ লোকেরা শুধু এজন্য বিপদের কারণে পরিণত হয়েছে যে, দেশের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এদেরকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে এবং আন্তর্জাতিক শক্তি এদের মদদ দিয়ে থাকে। এ ধরনের লোকদের মুকাবিলায় কাজ করার জন্য আমাদের কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ হলেই চলবে না, বরং বৈষয়িক ও আর্থিক উপকরণে সুসজ্জিত হওয়াও প্রয়োজন। আমার এ পর্যন্তকার অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কুফরী শক্তি যদি একশোভাগ শক্তির অধিকারী হয় আর এদের মুকাবিলায় ইসলামী দলের শুধুমাত্র পাঁচভাগ শক্তি থাকে, তবে এ পাঁচভাগ শক্তিই একশো ভাগ শক্তির উপর বিজয় লাভ করতে সক্ষম। দৃঢ় সংকল্প, সংঘবদ্ধতা এবং শৃংখলার গুরুত্ব অপরিসীম। কিন্তু বৈষয়িক সরঞ্জামাদির প্রয়োজনও যথেষ্ট রয়েছে এবং একশো ভাগের মুকাবিলায় অন্তত পাঁচভাগ শক্তি সঞ্চয় করা আপনাদের জন্য অপরিহার্য।

পাকিস্তানের আদর্শ হেফাজত তহবিল

এ বিষয়টি সামনে রেখে আমি আবেদন করেছি যে, যারা এখানে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে দেখতে চায়, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনের সাথে ঐকমত্য পোষণ করে এবং জামায়াতের ওপর আস্থা রয়েছে যে, তারা জামায়াতকে যা কিছু প্রদান করে, এর প্রত্যেকটি পয়সা সে উদ্দেশ্যেই খরচ করে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে জামায়াতকে আর্থিক সহায়তা দান করা। জামায়াতকে বর্তমানে অসংখ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর মুকাবিলা করতে হচ্ছে। আর প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থের প্রয়োজন অত্যধিক। পাকিস্তানে এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে, যেখানে কর্মীর অভাব নেই, অথচ আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো পর্যাপ্ত অর্থ তাদের হাতে নেই। আমাদেরকে কেন্দ্র থেকে তাদেরকেও সাহায্য পাঠাতে হবে। এছাড়া একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, অর্থাভাবে যেন আন্দোলনের গতি স্তিমিত ও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। করাচী শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়িক কেন্দ্র। এখানে আল্লাহর এমন বান্দাও রয়েছেন, যারা সম্পদশালী হওয়ার পাশাপাশি

ঈমানদারও। আমি আশা করি, তারা সাধ্যানুযায়ী পাকিস্তানের আদর্শ রক্ষা তহবিলে চাঁদা দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।

আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, যারা এ তহবিলে অংশগ্রহণ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং আমাদেরকেও এ ব্যাপারে তাওফীক দান করুন, যেন আমরা পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে এ তহবিলের অধিক থেকে অধিকতর ও উত্তম ব্যবহার করতে পারি। যে অর্থ এ পর্যন্ত জমা হয়েছে, তা যদিও বিরোধীদের বিপুল পরিমাণের মুকাবিলায় অনেক কম, তবু যে ইখলাসের সংগে এ অর্থ দেয়া হয়েছে, আল্লাহর কাছে এর মর্যাদা ও মূল্য অপরিসীম। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, সাড়ে সাত লক্ষ টাকা দিয়ে আমরা এত কাজ করতে পারবো, যা বিরোধী শক্তি সাড়ে সাত কোটি দিয়েও করতে সক্ষম হবে না।*

(এশিয়া, ২৮ জুন ১৯৭০)

১. ১৭ জুন করাচীবাসীর সম্বর্ধনার জবাবে মাওলানা মওদূদীর ভাষণ।

আইনজীবীদের সম্বর্ধনার জবাবে মাওলানা মওদূদী

আমি ব্যক্তিগতভাবে এটা মেনে নিতে পারি যে, একজন লোক, কিছু লোক বা একটা শ্রেণী সমাজের কল্যাণের জন্য জীবন বিসর্জন দিতে পারে, এজন্য বন্দী হতে পারে, কঠোর কষ্ট স্বীকার করতে পারে; কিন্তু কোন ব্যক্তি সর্বোত্তম উদ্দেশ্যের জন্যও নিজের খুশী ত্যাগ করুক, ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিক, নিজের প্রকৃতি এবং সত্তা বিসর্জন দিক, আমি তা মেনে নিতে পারিনা।

বুদ্ধিজীবী মহলই দেশকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে সক্ষম

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

সম্মানিত সুধীমন্ডলী।

আমাকে বসে বক্তৃতা করতে হচ্ছে, এ কারণে সর্বপ্রথম আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। অসুস্থতা এবং ক্রমাগত পরিশ্রমের কারণে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা বা কিছু দূর হাঁটা আমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়েছে। এমনকি বসে আলোচনা পেশ করাটাও আমার জন্য একটা পরীক্ষার চেয়ে কম নয়। কিন্তু যে ভালবাসা দ্বারা আমাকে এ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তা আমাকে এখানে উপস্থিত হতে বাধ্য করেছে। আপনারা অভিনন্দনপত্রে আমার সম্পর্কে যে উচ্চ আশা প্রকাশ করেছেন এবং যে সুধারণা পোষণ করেন, আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করি, যেন তিনি আমাকে সেই প্রত্যাশার মানে উত্তীর্ণ হওয়ার তওফীক দান করেন এবং আমাকে সত্যিকারভাবে আপনাদের সুধারণার উপযুক্ত বানান। বাস্তব সত্য এই যে, বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশের আইনজীবীরা এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তারা আমাদের জাতির সর্বাপেক্ষা সচেতন গোষ্ঠী। এ দেশে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বহাল রাখতে এবং ইসলামের নৈতিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাতে তাদের অবদান কোন অংশেই কম নয়। বিগত বছরগুলোতে এক চরম নাজুক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল এবং আইনজীবীদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও লোভ-লালসার কঠিন পরীক্ষা অতিক্রম করতে হয়েছে। এটা অত্যন্ত প্রশংসার যোগ্য যে, আইনজীবীদের এক বিরাট অংশ ভয়ভীতি ও লোভ-লালসার প্রতি কোন তোয়াক্কা না করে দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং তা রক্ষার জন্যে মূল্যবান ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এছাড়া তারা ঐ সমস্ত লোকদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করেছেন, যারা এ দেশে গণতন্ত্রের সংগ্রামে কাজ করে যাচ্ছে।

আমি আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেও এর উদাহরণ পেশ করছি। সকলেই একথা জানেন যে, বিগত কয়েক বছরে যে ব্যক্তি এবং যে দলটি সবচেয়ে বেশী যুলুম-নির্যাতনের শিকার হয়েছিল, তা ছিল আমার ব্যক্তি সত্বা এবং আমার জামায়াত। যুলুম-নির্যাতনের সেই দিনগুলোতে আইনজীবীগণ শুধু যে বলিষ্ঠভাবে আমাদের সহযোগিতাই করেছেন, তা নয় বরং ঐ অন্যায়ের বিরুদ্ধে তারা আমাদের পক্ষে একটি প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলেন। আইনজীবীগণ যদি আমাদের পক্ষে এগিয়ে না আসতেন, তাহলে স্বৈরশাসক এ দেশে আমাদের জন্য কাজ করা একেবারেই অসম্ভব করে তুলতো।

স্বৈরাচারের যুগ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু অবস্থা বর্তমানে আরো নাযুক আকার ধারণ করেছে। এখন এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে, এ দেশ একক দেশ হিসেবে টিকে থাকবে কি থাকবে না, অথবা যে মূলনীতির ভিত্তিতে এ দেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে মূলনীতির উপর তা প্রতিষ্ঠিত থাকবে কি না। বড়ই পরিতাপের কথা যে, মুসলমানরা তাদের হাজার হাজার প্রাণ উৎসর্গ করে, সম্ভ্রম বিনষ্ট করে এবং কোটি কোটি টাকার সহায় সম্পদ ত্যাগ করে যে আদর্শের জন্য পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করেছিল, আজ তেইশ বছর পর পাকিস্তানে সেই মূলনীতিকেই চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। এসব হলো আমাদের দু'টো ভুলের পরিণাম।

একটি হচ্ছে, আমরা ইসলামের সংগে মুনাফিকী আচরণ করেছি। পাকিস্তান সৃষ্টির জন্যে আমরা ইসলামের নাম ব্যবহার করেছি এবং এ উদ্দেশ্যে ভারতের সেইসব মুসলমানদেরকেও ডাক দিয়েছি, পাকিস্তানের সংগে যাদের কোন স্বার্থ জড়িত ছিল না। কিন্তু পাকিস্তান যখন সৃষ্টি হলো তখন সেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করা থেকে পিঠটান দেয়া হলো। ইসলামকে পিছনে ঠেলে দিয়ে এখানে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেয়া হলো। ইংরেজী আমলে যে জায়গীরদারী প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইসলামকে পেছনে ফেলে তা আরো সম্প্রসারিত করা হলো। ইসলাম থেকে দূরে সরে গিয়ে এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার আমদানী ঘটানো হলো এবং ইসলামী আইনের প্রচলনের পথে বাধা সৃষ্টি করা হলো। ইসলামের সংগে ইংরেজদের গোলামী যুগে আমাদের যে দূরত্ব ছিল, তারচেয়ে অনেক বেশী দূরত্ব এ আযাদীর যুগে সৃষ্টি হয়েছে। এ মুনাফিকী আচরণ যদি অবলম্বন না করা হতো এবং ঈমানদারীর সাথে ইসলামকে বাস্তবায়িত করা হতো, তবে কখনো এ সমস্যার সৃষ্টিই হতো না, আজ আমরা যার সম্মুখীন হয়েছি।

দ্বিতীয় ভুলটি যার পরিণাম আমরা ভোগ করছি, তাহলো, আল্লাহ তায়ালা আমাদের মাঝে যাদেরকে কর্তৃত্ব দান করেছেন, তারা মনে করে যে, এ জাতি

যেভাবে ইংরেজদের গোলাম ছিল, এখন তাদের গোলাম হয়ে থাকবে। স্বাধীন চিন্তার আলোকে নিজেদের ভবিষ্যত নির্ধারণের কোন অবকাশই যেন তারা না পায়। তেইশ বছর ধরে এ দেশে এই সংঘাত চলে আসছে। এ সময়ের মাঝে একটি দিনও এখানে জাতীয় নির্বাচনের সুযোগ আসেনি। অথচ গণতন্ত্রের অর্থ হলো, দেশে বারবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং জাতি তার প্রতিনিধি নির্বাচিত করার সুযোগ পাবে। একবার যদি তারা কোন ভুল করেই বসে, তবে পরের নির্বাচনে তা সংশোধন করে নেবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এখানে এমন একটি দল সদা তৎপর থাকে, যারা নির্বাচন রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। আমলাতন্ত্রও এটা চায়, যেন নির্বাচন হতে না পারে। পুঁজিবাদী গোষ্ঠীও নির্বাচনে বাধার সৃষ্টি করে। আমাদের সেনাবাহিনীর একটি শ্রেণীও চেষ্টা চালায়, যেন জাতি স্বাধীনভাবে দেশ চালাতে না পারে।

এ দু'টি ভুলের পরিণাম এই দাঁড়ালো যে, দেশ খন্ডবিখন্ড হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হলো এবং বারকোটি মুসলমানের দেশে—যাকে প্রকৃতপক্ষে ইসলামের নিবাস বলা উচিত, স্বয়ং ইসলামকে চ্যালেঞ্জ করে এর মুকাবিলায় ভিন্ন মতবাদ পেশ করা হচ্ছে। এ মতবাদ ফাঁকা জায়গায় পেশ করা হলে কোন কথাই ছিল না। তা এমন জায়গায় পেশ করা হচ্ছে, যেখানে শুরু থেকে আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) প্রতি ঈমানদার লোকেরা বর্তমান রয়েছে এবং তারা আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ)-কে হিদায়াতের উৎস মনে করে। মার্কস এবং লেনিনের আদর্শ তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এ মুহূর্তে আমাদের চিন্তাশীল ও বিবেকবান মহলের সামনে অগ্রসর হয়ে জনগণকে সকল অন্তর্নিহিত তথ্য অবগত করানো অত্যন্ত জরুরী কাজ। আল্লাহর অনুগ্রহে আমাদের জনগণ সরল প্রকৃতির মানুষ। তাদের কাছে যদি সত্য পৌঁছে দেয়া হয়, তবে আমার বিশ্বাস, তারা সত্যের পক্ষেই আসবে। যারা জনগণকে ধোঁকা দেয়ার চিন্তা করে অথবা টাকার বিনিময়ে জনগণের বিবেক কিনতে চায়, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা অতিশীঘ্রই দূর হয়ে যাবে। অবশ্য শর্ত হচ্ছে, আমাদের প্রতিভাবান শ্রেণীটি যেন পূর্ণ একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাথে জনগণের মধ্যে কাজ করে।

যদি আমরা জনগণকে শিক্ষিত করে তোলার কাজে (EDUCATE) সফল হই, তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে এবং দেশ আজকে যেসব বিপদ মুসিবত ও সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, তা থেকে দেশকে মুক্ত করাও সহজ হবে।

(সাপ্তাহিক এশিয়া, ১২ জুলাই, ১৯৭০)

দেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা ও তার সমাধান

আইনজীবীদের সম্বর্ধনা সভায় প্রশ্নোত্তরের আসর

আইন কাঠামোর পাঁচটি মূলনীতি

প্রশ্ন ঃ আইন কাঠামোতে প্রদত্ত পাঁচটি মূলনীতি কি ইসলামী রাষ্ট্র গঠন করার পথ সুগম করতে পারবে?

উত্তর ঃ যখন লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্ক প্রকাশিত হয়, আমরা তখনি বলেছিলাম, এতে প্রদত্ত পাঁচটি মূলনীতি কমপক্ষে এটুকুর গ্যারান্টি দেয় যে, এখানে কোন অনৈসলামিক আইন তৈরী হবে না। আইন কাঠামোর এই পাঁচটি মূলনীতির কোনটিই অপ্রয়োজনীয় নয়। আর যদি সংসদে অনৈসলামিক আইন প্রণয়ন প্রতিহত করার জন্যে কমপক্ষে এতোটুকু বিধি-নিষেধও আরোপ করা না হয়, তবে যে অবস্থায় নির্বাচন হতে যাচ্ছে, আর যারা এ নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছে, তার পরিণাম এই দাঁড়াবে যে, হয় একেবারেই সংবিধান প্রণীত হবে না, নয়তো সংবিধান প্রণীত হলেও তাতে ইসলামের নামগন্ধও থাকবে না।

প্রশ্ন ঃ আইন কাঠামোর ২৫ এবং ২৭ দফা কি সংসদের উপর অগণতান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা আরোপ করবে না?

উত্তর ঃ আমি বিস্মিত হচ্ছি, সামরিক শাসনের সময় প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক যখন সিদ্ধান্ত প্রদান করে যে, পূর্বের সকল সংবিধান রহিত করা হলো, আমরা নতুন সংসদ গঠন করবো, তখন সেটা কিভাবে গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হয়? একটা সংসদ দাঁড় করানো এবং এজন্য একশ বিশ দিন নির্দিষ্ট করা তার এ সবকিছুই অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত। এখন একদিকে এসব সিদ্ধান্ত মেনে নেয়া এবং অন্যদিকে একই আইন কাঠামোর ২৫ ও ২৭ দফা অস্বীকার করা কোন্ যুক্তিতে বৈধ হয়? যদি আপনারা দেশের রাজনীতিকে গণতন্ত্রের ওপর পুনর্বহাল করতে চান, তবে লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কেরও সকল দফা মেনে নিয়ে কোন না কোনভাবে একটি যুক্তিসম্মত সংবিধান প্রণয়ন করুন এবং প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সাহেবকে একথা জানিয়ে দিন যে, আমরা আইন ও যুক্তির সমস্ত দাবী পূর্ণ করেছি। এখন জনগণের প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করা আপনার নৈতিক দায়িত্ব।

সংসদ গঠনের পরও যদি আমরা এভাবে বিতর্কে লিপ্ত হই, যেমন আজ এক একটি বিষয়ে বিতর্ক করছি, তবে একশো বিশ দিনের মধ্যে সকল রাজনৈতিক দলের ভাবমূর্তি এত কলংকিত হবে যে, জাতি স্বয়ং করজোড়ে এ সেনাবাহিনীকে বলবে যে, আমাদের রাজনৈতিক দলের প্রয়োজন নেই। ক্ষমতা আপনারাই গ্রহণ করুন।

২৫ ও ২৭ দফায় গণতন্ত্রের যে প্রসংগ তোলা হয়েছে, তা আসলে শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য নির্ধারিত এ পাঁচটি মূলনীতির ভিত্তিতেই তোলা হয়েছে। নতুবা অগণতান্ত্রিক ঘোষণাবলী তো সামরিক আইন জারীর শুরু থেকেই দেয়া হয়েছে। যদি এ ব্যক্তিদের অন্তরে গণতন্ত্রের প্রতি কোন দরদ থাকতো, তবে তাদের তৎক্ষণাত দাঁড়িয়ে এটা বলা উচিত ছিল যে, আমরা তোমাদের অগণতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত মানি না।

সংবিধান রচনা

প্রশ্ন ঃ জামায়াতে ইসলামী প্রস্তাব পেশ করেছে যে, সরকার একটি খসড়া সংবিধান তৈরী করে সংসদে পেশ করুক। এটা কি অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব নয়?

উত্তর ঃ আসল কথা হলো, আসন্ন সংসদকে মাত্র ১২০ দিন সময় দেয়া হয়েছে। যদি এরা নতুন করে সংবিধান রচনার কাজ শুরু করে, তবে একশ বিশ দিন কেন বারশ' দিনও তাদের জন্য যথেষ্ট হবে না। এজন্যই আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, আইন মন্ত্রণালয় ১৯৫৬ সালের সংবিধানে বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা সংশোধনী এনে এটাকে একটা খসড়া সংবিধান হিসেবে পেশ করুক। যাতে করে সংসদ আলোচনার ভিত্তিতে এ দ্বারা কাজের সূচনা করতে পারে এবং এতে তারা কোন বিষয়ে পরিবর্তনের প্রয়োজন মনে করলে তাও করবে। যদি এভাবে না করা হয়, তবে কমিটি গঠন এবং আইন সংগত বিল পেশ করতেই গোটা সময় পার হয়ে যাবে, তবু কোন খসড়া পর্যন্ত তৈরী হবে না।

লক্ষ্য করুন, যদি আমরা সংসদে এক'শদিন ধরে লড়তে থাকি, দেখা যাবে বিশদিন বাকী থাকতেই সরকার তার পক্ষ থেকে একটা মনগড়া সংবিধান আমাদের সামনে পেশ করে বলবে, আপনারা এটা মেনে নিলে কোন কথা নেই, নতুবা এ সংসদ ভেংগে দেয়া হলো। সেটা কি ঠিক হবে ? আল্লাহ

না করুন, এ সরকার যদি তাই করে, তবে তারা বিগত স্বৈরাচারের চেয়েও বেশী বিকৃত নাম ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করাবে।

প্রশ্ন : একশ' বিশ দিনের মধ্যেই কি সংবিধান রচনার কাজ সমাপ্ত হতে পারে?

উত্তর : এ ব্যাপারে অনুমান করে কিছু বলা খুব কঠিন। সংসদে কি ধরনের লোক নির্বাচিত হয়ে আসে, পুরো বিষয়টা তার উপরই নির্ভরশীল। আপনারা লক্ষ্য করছেন, অনেক দলই নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্যে একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে। কতক দল বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে প্রভাবশালী এবং তারা এটা আশা করে যে, নিজ নিজ অঞ্চল থেকে তারা কিছু আসন লাভ করবে। এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংকীর্ণমনা দল সংসদে গেলে তারা যে দেশকে অখন্ড রাখার মত কোন সংবিধান রচনা করবে, সে আশাই নেই। এরাতো দেশকে বিভক্ত করার জন্যেই মাঠে নেমেছে। দেশকে রক্ষা করতে হলে, এ অবস্থায় সেসব দলের বিজয়ী হয়ে সংসদে আসা দরকার, যাদের সংগঠন সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত, যারা কোন অঞ্চল ভিত্তিক নয়, বরং গোটা দেশ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে এবং যাদের দ্বারা কোন অঞ্চলের অধিকার হরণের আশংকা থাকবে না। আশা করা যায়, এ দলগুলো একটি সংবিধান রচনায় সফল হবে। কিন্তু যদি এ দলগুলোও সংবিধান রচনার কাজ নতুন করে শুরু করে, তবে তারা কখনো সফল হতে পারবে না। সংবিধান যদি তৈরী করতেই হয়, তবে তা এভাবেই সম্ভব যে, পূর্বপ্রণীত কোন সংবিধানে কতিপয় প্রয়োজনীয় সংশোধনীর মাধ্যমে তা গ্রহণ করে নেয়া হবে।

ইসলামী রাষ্ট্র ও অনৈসলামিক রাষ্ট্রের পার্থক্য

প্রশ্ন : রাষ্ট্রব্যবস্থার এমন কি মাপকাঠি রয়েছে, যার ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্র ও অনৈসলামিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করা যায়?

উত্তর : ইসলামী রাষ্ট্র এবং অনৈসলামিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য হলো, ইসলামী রাষ্ট্র আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। দেশের সংসদ, বিচার বিভাগ এমনকি সমগ্র জাতি একত্রিত হয়েও এ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বৈধতা রাখে না যে, আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নায় যে জিনিসকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তা তারা নিজের ইচ্ছায় হালাল সাব্যস্ত করবে। যখনই তারা এ পদক্ষেপ নেবে, ইসলামের গন্ডী

থেকে বহিষ্কৃত হয়ে যাবে। ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনস্থ সকল অফিস-আদালত এবং এককথায় গোটা সমাজ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সীমারেখার মধ্যে কাজ করে।

অপরদিকে অনৈসলামিক রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতা (SOVEREIGNTY) জনগণের। জনগণ এবং তাদের প্রতিনিধিগণ যে হারামকেই ইচ্ছা হালাল এবং যে হালালকে ইচ্ছা হারাম সাব্যস্ত করতে পারে। যে মন্দ কাজ হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের যুগ থেকে হারাম গণ্য হয়ে আসছে, বর্তমান যুগের অনৈসলামিক রাষ্ট্রগুলো তাও হালাল করে দিয়েছে। ইসলামী রাষ্ট্র ও অনৈসলামিক রাষ্ট্রের মধ্যে এটাই পার্থক্য।

ইসলামে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সংযোগ

প্রশ্ন ঃ কিছু লোক ইসলামকেই একমাত্র সত্য দীন মনে করে। কিন্তু আন্তরিকতার সংগে আবার এ মতও প্রকাশ করে যে, যদি ইসলামের সংগে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটানো যেতো, তবে দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হতো।

উত্তর ঃ আন্তরিকতা থাকলেই যে নির্ভুল মত দেয়া যাবে, সেটা ঠিক নয়। যারা নিজের কোন মতের উপর অটল থাকে এবং খোলাখুলিভাবে সেই মত প্রকাশ করে, আমি তাদেরকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু ইসলামের সংগে সমাজতন্ত্রের সংযোগ স্থাপনের ব্যাপারটা হচ্ছে, যদি কোন ব্যক্তি আন্তরিকভাবে এটা বুঝে থাকে যে, বাস্তবে ইসলামের সংগে সমাজতন্ত্রের সংযোগ স্থাপন সম্ভব, তবে হয়তো সে ইসলাম সম্পর্কে অধ্যয়ন করেনি, অথবা সমাজতন্ত্র অধ্যয়ন করেনি, অথবা সে এ দু'টির কোনটাই পড়েওনি বুঝেওনি। যদি সে এ দু'টি অধ্যয়ন করতো, তবে কখনো আন্তরিকতার সংগে একথা বলতো না যে, ইসলামে সমাজতন্ত্রের সংযোগ স্থাপন সম্ভব।

একথা ভাল করে বুঝে নিন যে, এ দু'টি ব্যবস্থার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। এছাড়া সমাজতন্ত্র কোন অর্থনৈতিক কর্মসূচী পেশ করে না, বরং রাজনৈতিক কর্মসূচী পেশ করে। যদি সকল জাতীয় সম্পদ এবং উপায়-উপকরণ একত্রিত করে কমিউনিষ্ট অথবা সোস্যালিষ্ট পার্টির হাতে ছেড়ে দিয়ে সেগুলো ব্যবহারের স্বাধীনতা দেয়া হবে, তবে প্রশ্ন হলো, এটা অর্থনৈতিক না রাজনৈতিক কর্মসূচী ? এটা বলা একেবারেই ভুল যে, আমরা

সমাজতন্ত্র থেকে তার অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে চাই। প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ করাই লক্ষ্য।

এবার লক্ষ্য করুন, সমাজতন্ত্র ইসলামের সাথে কিভাবে একীভূত হতে পারে। সমাজতন্ত্রের কর্মসূচীকে গণতান্ত্রিক উপায়ে বাস্তবায়ণ তো সম্ভব নয়। ব্যক্তি মালিকানা পরিত্যাগ করার জন্য লোকদের উপর শক্তি প্রয়োগ করতেই হবে, ইসলাম যার অনুমতি দেয় না। এটা ইসলামের আইনগত বিধানের সংগে সাংঘর্ষিক। কুরআন ব্যক্তির মালিকানা স্বত্বাকে শ্রদ্ধা করে এবং এতোটা শ্রদ্ধা করে যে, চোরকে হাত কাটার শাস্তি প্রদান করে। তাছাড়া একটি গোষ্ঠীর এই মতবাদ চালু করে তা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া কোন্ দিক থেকে বৈধ হতে পারে? এ নীতি ইসলামের নৈতিক বিধানের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ কারণে এটা সম্ভব নয় যে, আপনি মুসলমানও থাকবেন এবং সমাজতন্ত্রকেও গ্রহণ করবেন। আল্লাহ, রাসূল (সাঃ) এবং স্বীয় আকীদা-বিশ্বাস ছেড়েই আপনাকে তা বেছে নিতে হবে।

ইসলামের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর চমৎকারিত্ব

প্রশ্ন ঃ ইসলামের অর্থনৈতিক কর্মসূচীর এমন কোন্ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা তাকে সমাজতন্ত্র থেকে বিশিষ্টতা দান করে?

উত্তর ঃ ইসলামের পয়লা বৈশিষ্ট্য হলো, সে মানুষের সংগে সুধারণার ভিত্তিতে লেনদেনের সূচনা করে। পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্র করে কুধারণার ভিত্তিতে। সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারা হচ্ছে, মানুষ মৌলিকভাবে অসৎ ও দুষ্কৃতি প্রবণ। যদি তার হাতে উপায়-উপাদান অর্পণ করা হয়, তবে সে লুটতরাজ করবে এবং মানুষের হক নষ্ট করবে। এর বিপরীত ইসলামের বক্তব্য হলো, আল্লাহ্ তায়ালা মানুষকে সৎ প্রকৃতির উপর সৃষ্টি করেছেন। যদি তার যথার্থ নৈতিক শিক্ষা অর্জিত হয়, তবে সে স্বীয় যুগের উসমান গনীও (রাঃ) হতে পারে, আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) এবং ইমাম আবু হানিফাও (রঃ) হতে পারে। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) কোটিপতি ছিলেন। ইসলাম যখন গোলামদের মালিকানা অধিকার রহিত করা ছাড়াই তাদেরকে আযাদ করতে উদ্বুদ্ধ করলো এবং এটাকে বিরাট পুণ্যের কাজ হিসেবে স্বীকৃতি দিলো, তখন হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) একাকী তাঁর জীবনে ত্রিশ হাজার গোলাম ক্রয় করে আযাদ করে দেন। হযরত ইমাম আবু হানিফা (র) তাঁর সময়কার বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর বাণিজ্যিক

প্রতিষ্ঠানে পাঁচ কোটি দিরহামের পূঁজি বিনিয়োগ করা হয়েছিল। অথচ সততার পরাকাষ্ঠা এমন ছিল যে, একবার তিনি তাঁর এক এজেন্ট কর্তৃক চল্লিশ হাজার দিরহাম মূল্যের মাল বাজারে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি একথা বলতে ভুলে গিয়েছিলেন যে, এ মালগুলোর মধ্যে অমুক অংশ ত্রুটিপূর্ণ এবং তুমি ক্রেতাকে এ বিষয়টি জানিয়ে দিও। এজেন্ট অজ্ঞাতসারে সম্পূর্ণ মাল বিক্রি করে মুনাফাসহ এক বড় অংক নিয়ে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়। তিনি শুধু যে মুনাফাই গ্রহণ করলেন না, তা নয়; বরং সমস্ত টাকা কেবলমাত্র এ কারণে আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিলেন যে, মালের ত্রুটি ক্রেতার নিকট ব্যক্ত করা হয়নি।

এটাই হলো ইসলামের ব্যবসায়িক আদর্শ। এখন প্রশ্ন হলো, মানুষের কল্যাণ তার স্বাধীনতার মধ্যেই নিহিত এবং অনুশীলনের মাধ্যমে তাকে এভাবে গড়ে তুলতে হবে যে, সে এই স্বাধীনতাকে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করবে। অথবা শুরু থেকে তাকে আদৌ স্বাধীনই রাখা হবে না।

লক্ষ্য করুন, যদি উৎপাদনের উপায়-উপকরণ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের মালিকানায় চলে যায় এবং সমগ্র জাতির জীবিকা গুটি কয়েক লোকের নিয়ন্ত্রণে থাকে, আর এ লোকেরা অত্যাচারী হয়ে উঠে, তবে এদেরকে উৎখাতের উপায় কি আছে? স্টালিন রুশ জনতার উপর চরম নির্যাতন চালিয়েছিল, অথচ সমগ্র জনতা ছিল অসহায়। তারা এ যুলুমের বিরুদ্ধে কোন শ্লোগান পর্যন্ত উচ্চারণ করতে পারেনি। ক্রুশেভ যখন এলেন, তখন তিনি স্টালিনের নির্যাতনের সমালোচনা করলেন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি স্টালিনকে হত্যা করে নিজে ক্ষমতা দখল করতো, তবে সে তার চেয়ে বড় স্টালিন হতো। মোটকথা, যেখানে দল গঠনের কোন সুযোগ নেই, যেখানে প্রচার ও প্রকাশনা মাধ্যমগুলো রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং যেখানে বাক স্বাধীনতার কথা কল্পনা করাটাও অসম্ভব, সেখানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করাটা অনেক গুণ বেশী কঠিন।

আমি বলতে চাই কোন চেংগিজ, হালাকু অথবা নেপোলিয়নেরও অত ক্ষমতা ছিল না, যা একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একনায়কের হাতে থাকে। এ রাষ্ট্র ব্যবস্থা দূর থেকে বড় সুন্দর মনে হয় এবং লোকেরা প্রত্যাশা করে তাদের দেশেও এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু তা প্রতিষ্ঠার পূর্বে পৃথিবীও কাঁদে, আকাশও অশ্রু বিসর্জন করে। তবু তাদের দুঃখের অবসান হয় না। কারাগারের কয়েদীদেরও কিছুটা স্বাধীনতা ভাগ্যে জুটে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের জীবন এই বন্দীদশার চেয়েও শোচনীয় হয়ে থাকে।

ইসলাম আপনাকে এমন জীবনব্যবস্থার সন্ধান দেয়, যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতা বহাল থাকে এবং সে অর্থনৈতিক ইনসাফ দ্বারাও লাভবান হয়।

জামায়াতে ইসলামী একটি বিপ্লবী আন্দোলন

প্রশ্ন : জামায়াতের সদস্যপদ এতোটা নিয়ন্ত্রিত কেন?

উত্তর : জামায়াতে ইসলামী কোন জাতীয়তাবাদী দল নয়। এ হচ্ছে একটি আন্দোলন। আদর্শিক বিপ্লব সংঘটিত করা এর উদ্দেশ্য। জামায়াতের প্রতিষ্ঠা লগ্নেই আমরা একথা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি, এমন একটি আন্দোলনের জন্যে আমরা এ দল গঠন করেছি, যা সমাজে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত করতে সক্ষম। এ ধরনের আন্দোলনের স্বাভাবিক দাবীই হলো এই যে, তার সদস্যপদ কেবল ঐসব লোকই গ্রহণ করতে পারবে, যারা তার আদর্শিক মানদণ্ডে উতরে যাবে। যারা এ আন্দোলনের প্রকৃতি এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে শুধু ভালভাবে হৃদয়ংগমই করবে না, বরঞ্চ সেই সাথে তাদের প্রতিটি আমল ও কার্যক্রম একথার সাক্ষ্য প্রমাণ করবে যে, তারা এ আন্দোলনের খাঁটি ও নিখাঁদ অনুসারী। যেমন ধরুন, কোন ব্যক্তি যদি জামায়াতে ইসলামীরও সদস্য হয় এবং সুদী কারবারের সাথেও জড়িত থাকে, তবে তার দ্বারা তো জামায়াতের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। কারণ, জামায়াত তো চায় সুদী ব্যবস্থার পরিবর্তন। সুতরাং তার কোন সদস্য সুদী ব্যবস্থার সাথে সম্পর্ক রাখতে পারে না।

জামায়াতে ইসলামী এ যাবত যা কিছু করেছে, তা এজন্যই করতে পেরেছে যে, সে যাচাই বাছাই করে এমনসব লোকদেরই তার সদস্য করেছে, যারা তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে ভালভাবে হৃদয়ংগম করেছে এবং নিজেদের চরিত্র ও আচরণকে সে অনুযায়ী গড়ে নিয়েছে। কেউ কেউ নিজেদের দলের সদস্য সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ বলে দাবী করছে। একটি মহান ইসলামী বিপ্লব যদি আমাদের উদ্দেশ্য না হতো, তাহলে আমরা জামায়াতের সদস্য সংখ্যা দেড় কোটি বলে দাবী করতে পারতাম।

জামায়াতের বিরুদ্ধে চরমপন্থী হবার অভিযোগ

প্রশ্ন : লোকেরা জামায়াতে ইসলামীকে চরমপন্থী বলে গালি দেয়। এ অভিযোগ কি ঠিক?

উত্তর : জামায়াত কখনো লোকদেরকে কোন প্রকার উচ্ছৃংখল কাজ করতে উত্তেজিত করেনি। জামায়াতের গঠনতন্ত্রে একথা পরিষ্কারভাবে লেখা রয়েছে যে, জামায়াত সবসময় আইন-শৃংখলার ভিতরে থেকে কাজ করবে। জামায়াত কোন চরমপন্থার উশৃংখল কাজ করেছে কিংবা এরূপ করার জন্যে লোকদের উস্কিয়ে দিয়েছে, এরূপ কোন নজীর জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাসে নেই। কিন্তু বিষয়কর ব্যাপার হচ্ছে, একজন লোক প্রকাশ্যে গেরিলা যুদ্ধের হুমকি দেয়। তার কাছে ত্রিশ হাজার গেরিলা রয়েছে বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করে। সে বলে, আল্লাহর নামে গোটা দেশ কবজা করে নেবো। এ কাজে সেনাবাহিনীও তাকে সাহায্য করবে বলে সে ঘোষণা করে। —এতোসব প্রকাশ্য ঘোষণা শুনার পরও তাকে চরমপন্থী আখ্যায়িত করা হয় না। কিন্তু তার হিংস্রতা ও আগ্রাসন থেকে যদি কেউ আত্মরক্ষাও করতে চায়, সংগে সংগে তার প্রতি চরমপন্থী হবার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। অথচ আত্মরক্ষা করা মানুষের মৌলিক অধিকার, যা আইনগতভাবে স্বীকৃত। নৈতিকতা এবং শরীয়তও আত্মরক্ষার স্বীকৃতি এবং অনুমতি প্রদান করে।

এ অভিযোগ হচ্ছে ঠিক সে রকম, যেমন—একজনের ঘরে ডাকাত ঢুকে তাকে আক্রমণ করলো এবং সে বেচারা আত্মরক্ষার জন্যে ডাকাতের মোকাবিলা করলো। অতপর লোকেরা এ আক্রান্ত লোকটির বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ উত্থাপন করলো যে, সে কেন আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করলো। কেন সে ডাকাতদের সাথে মোকাবিলা করলো। সুতরাং সে একজন চরমপন্থী।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য এতোটুকুই যে, আত্মরক্ষার জন্যে ডাকাতের মোকাবিলা করা যদি চরমপন্থী কাজ হয়ে থাকে, তবে আমরা গর্বের সাথে এ অভিযোগ গ্রহণ করছি এবং সাথে সাথে দোয়া করছি, সকল মুসলমান যেন চরমপন্থী হয়ে যায়। যারা আজ মধ্যপন্থা অবলম্বনের পাঠদান করছে, তাদের জিজ্ঞেস করছি, তাদের ঘরে যদি ডাকাত হামলা করে, তবে তারা কি সত্যি মধ্যপন্থা অবলম্বন করবেন?

ভারতীয় মুসলমান ও কাশ্মীর সমস্যা

প্রশ্ন : জামায়াত ক্ষমতায় এলে ভারতীয় মুসলমান এবং কাশ্মীর সমস্যার কিভাবে সমাধান করবে?

উত্তর : ভারতীয় মুসলমানদের প্রসংগটি সে সময় থেকেই জটিল অবস্থায় ছিল, যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রসংগ উত্থাপিত হয়েছিল। একথা সুস্পষ্ট যে,

পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছে। আমরা যখন পাকিস্তান আন্দোলনে সংখ্যালঘু এলাকার মুসলমানদের শামিল করেছিলাম, তখন একথা বুঝে নেয়া উচিত ছিল যে, আমরা ইউপি সিপি এবং মহারাষ্ট্রের চার পাঁচ কোটি মুসলমানকে বন্ধক রাখছি। কেননা একথা স্পষ্ট যে, যে অঞ্চলের মুসলমানেরা পাকিস্তান আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল, হিন্দুদের আক্রমণের শিকারে পরিণত হওয়া ছিল তাদের জন্য অবধারিত।

একদিকে ভারতের মুসলমানরা এ যুলুম-নির্যাতনের শিকার। অপরদিকে আমাদের সীমান্ত তাদের জন্য বন্ধ। তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে আমাদের সীমান্তে আসে; কিন্তু তাদেরকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না।

আমি ভারতীয় মুসলমানদের সমস্যার উপর একটি পূর্নাঙ্গ পরিকল্পনা তৈরী করে দেশের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কাছে উপস্থাপন করেছি। কিন্তু এ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি। আমি দেশের বাইরে গেলে আন্তর্জাতিক বৈঠকাদিতে ভারতীয় মুসলমানদের প্রসংগ অবশ্যই উত্থাপন করে থাকি। অথচ আমাদের মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা এমন যে, তারা এ সমস্যা নিয়ে ভারত সরকারের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করতে চায় না। এ কারণেই সমস্যাটি চরম জটিল আকার ধারণ করেছে এবং এ পথে বহু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।

নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য আমরা বিবেক বিরুদ্ধ কোনো দাবী করতে চাই না। যেভাবে হোক, আমাদেরকে অনেক চিন্তা-ভাবনা করে পদক্ষেপ নিতে হবে। তেমনিভাবে কাশ্মীরের সমস্যাও বড় জটিল। তবু এটা বুঝে নিন যে, যারা শক্তির জোরে তা দখল করেছে, আমরা তাদের নিকট থেকে কেবল শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেই তা ফেরত পেতে পারি। মামলা করে তা আদায় করতে পারবো না।*

[এশিয়া, লাহোর, ১২ জুলাই, ১৯৭০]

* লাহোরে আইনজীবীদের সম্বর্ধনা সভায় মাওলানা মওদূদীর ভাষণ। ৩ জুলাই, ১৯৭০।

শোরেশ কাশ্মীরীর
৩১টি প্রশ্নের জবাবে
মাওলানা মওদূদী

আমার অন্তর প্রতিটি মুহূর্ত সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত। যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক প্রমাণের মাধ্যমে যে কেউ আমার যেকোন মত পাল্টে দিতে পারে। কিন্তু আমার ঈমান এবং একীন বেচাকেনা কিংবা বন্ধক রাখার জিনিস নয়। এরূপ চেষ্টা আগেও যারা করেছে, ব্যর্থ হয়েছে। ভবিষ্যতেও যারাই এরূপ চেষ্টা করবে, ইনশাআল্লাহ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হবে।

আল্লামা ইকবাল (আল্লাহ তাঁর কবরকে আলোকময় করুন) বলেছিলেন, ইসলামের পুনরুজ্জীবন এতে নিহিত নেই যে, ইউরোপের অন্ধ অনুকরণে আমরা কতদূর এগিয়ে যাবো। বরং ইসলামের পুনরুজ্জীবন নিহিত রয়েছে তার চিন্তাধারার হামলা থেকে আমরা কতটা মুক্তি লাভ করতে পারি, তার মধ্যে।

তিনি আরো বলেছেন, প্রাচ্যে মুসলমানদের মানসিক নেতৃত্ব এমন ব্যক্তির হাতে থাকবে, যিনি ইউরোপের জ্ঞান বিজ্ঞানের নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। যিনি সাহস করে একথা বলতে পারেন যে, মানুষের রকমারী দুর্ভোগ-দুর্দশার সমাধান কেবল একটাই এবং তা হচ্ছে ইসলাম।

মাওলানা মওদূদী নিঃসন্দেহে ইসলামের এক মহান স্কলার। তিনি ইউরোপীয় দর্শনের যাদুকারিতা নিয়ে নিতান্ত আস্থা আর দৃঢ়তার সঙ্গে পর্যালোচনা করেছেন এবং নব প্রজন্মের মন-মানসে বাসা বাঁধা চিন্তাধারার জাল ছিন্ন করেছেন। তাঁর সবচেয়ে বড় কীর্তি এই যে, তিনি ইউরোপের জ্ঞানের অহমিকার জাল ছিন্ন করেছেন এবং নব প্রজন্মকে চিন্তাধারার বিভ্রান্তি থেকে তুলে এনে সিরাতে মুস্তাকীমের দাওয়াত দিয়েছেন।

মাওলানার জবাব থেকে তাঁর চিন্তার গভীরতা আর জ্ঞানের প্রসারতা সম্পর্কে অনুমান করা যাবে।

-শোরেশ কাশ্মীরী

আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারি যে, আবেগ দ্বারা তাড়িত হওয়ার লোক আমি নই। কোমলতা-কঠোরতা—যা কিছুই অবলম্বন করি, তা আবেগের ভিত্তিতে করিনা, বরং ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার পর এ মত স্থির করি যে, এ ক্ষেত্রে এটাই করা উচিত।

প্রশ্ন ১ : সম্প্রতি দেশব্যাপী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে যে গণ-আন্দোলন সৃষ্টি হয়েছিলো এবং তা শেষ পর্যায়ে যে বিচিত্ররূপ ধারণ করেছিলো, আপনি কি তার সবটার সাথে সমভাবে ঐকমত্য পোষণ করেন, না এর বিশেষ অংশের সাথে? আপনার কাছে এ আন্দোলনের কোন্ অংশটি কল্যাণকর এবং কোন্ অংশ অকল্যাণকর মনে হয়েছে?

উত্তর : দেশে একনায়কত্বের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে যে গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা হয়েছে, তা প্রথম অবস্থায় সঠিক পথেই অগ্রসর হয়েছিলো। ১৯৬৮ সালের আগষ্ট মাসে আমি যখন চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে যাচ্ছিলাম, তখনও আমার এ ব্যাপারে পূর্ণ আস্থা ছিলো যে, আন্দোলন সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পথ ধরেই চলছে। অতপর আমি যেহেতু দেশের প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দূরে ছিলাম, তাই এটা আমার জন্যে বলা মুশকিল যে, ঠিক কোন সময় থেকে আন্দোলন ভুল পথের দিকে ধাবিত হয়েছে। ৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি ইংল্যান্ড থেকে দেশে ফিরে আসি। দেশে এসে আমি দেখতে পেলাম যে, একদিকে পিডিএম ও এর সাথে যোগদানকারী দলসমূহ, যাদের নিয়ে পরবর্তী সময়ে 'ডাক' গঠিত হয়েছে শান্তিপূর্ণ ও নিয়মাতান্ত্রিক পথেই আন্দোলন চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু অপর দিকে বাইরের কিছু লোক এটাকে হিংসাত্মক পথে ধাবিত করার জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছে। আন্দোলনের এ দ্বিতীয় অংশটাই ছিলো মূলত অকল্যাণকর। আমি এ জন্যে বলেছি যে, যারা এ আন্দোলনের গতিকে হিংসাত্মক পথে ঠেলে দিতে চেয়েছে, তাদের এক দলের উদ্দেশ্য ছিলো এই যে, হিংসাত্মক কার্যকলাপের অজুহাত দিয়ে সরকার গোটা আন্দোলনকেই বানচাল করার সুযোগ পাবে। এদের দ্বিতীয় দলটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি আপনার পরবর্তী প্রশ্নে আলোচনা করবো।

প্রশ্ন ২ : আপনি কি আমার সাথে এ ব্যাপারে একমত যে, এ গণ-আন্দোলনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে গুটি কতেক সমাজতন্ত্রী লোক দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে যুবকদের মনমগজে বিশেষ বিশেষ কতগুলো পরিভাষা ও শ্লোগানকে বদ্ধমূল করার প্রচেষ্টা ছাড়া একে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে তারা এমন এক অরাজকতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে, যা কমিউনিষ্টরা অকমিউনিষ্ট দেশে সর্বদাই করে থাকে।

উত্তর : প্রথম প্রশ্নের জবাবে আমি যে দ্বিতীয় দলের কথা বলেছিলাম, তাদের সম্পর্কে আমার ধারণা হচ্ছে এই যে, এতে সমাজতন্ত্রী ও ফ্যাসিবাদী উভয় শ্রেণীর লোকই শামিল রয়েছে। এদের লক্ষ্য হচ্ছে একটি শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে রক্তাক্ত বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়া।

দেশে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলছিলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে। এটা দেখে এরা ভাবতে শুরু করলো যে, যদি এ পথেই আন্দোলন চলতে থাকে, তবে অবশ্যই গণতন্ত্র কায়েম হয়ে যাবে—যা কোন অবস্থায়ই এদের কাম্য নয়। আর এটা সত্যকথা যে, রক্তাক্ত বিপ্লবের দ্বারা কোনদিন গণতন্ত্র কায়েম হতে পারে না—এতে ফ্যাসিবাদ, সাম্যবাদ কিম্বা স্বৈরতন্ত্রের মাধ্যমে দেশ ধ্বংসের কেবল দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

প্রশ্ন ৩ : সমাজতন্ত্রীদের প্রকৃতি হচ্ছে এই যে, যেখানে তাদের অনুসারীদের সংখ্যা নেহাত কম, সেখানে তারা প্রথমত ডানপন্থী দলগুলোর ভেতরে ঢুকে নিজেদের শক্তি-সামর্থ যাঁচাই-পরখ করে, এ জন্যে তারা যে শুধু জনসাধারণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক অসন্তোষেরই আশ্রয় গ্রহণ করে তাই নয়, মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন একটাকে বেছে নিয়ে তার ওপর আঘাত হানে এবং নিজেদের শক্তির একটা চূড়ান্ত পরীক্ষা করে নেয়। সাথে সাথে নিজেদের গৃহীত আদর্শেরও প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যায়। কিছুদিন আগে আমাদের দেশে কুরআন অবমাননার ন্যক্কারজনক ঘটনার মাধ্যমে তারা ঠিক এ কাজই করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। এতে করে তারা এ ঘৃণ্য কাজের প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম জাতির প্রতিবাদী মানসিকতাকে দুর্বল করা এবং তাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করার চেষ্টা চালায়। এ ধরনের কার্যকলাপে তাদের লক্ষ্য থাকে কয়েকটি :

১। জাতির ধর্মীয় অনুভূতি অনুমান করা।

২। এটাও পরখ করা যে, দীনকে আকড়িয়ে থাকার ব্যাপারে এ জাতি কদ্দূর তৎপর?

৩। প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর শক্তি পরীক্ষা করা।

৪। জনসাধারণের মধ্যে এসব কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা।

৫। কোন্ কোন্ হাতিয়ার দিয়ে এসব প্রতিক্রিয়া রোধ করা যায়, তারও একটা যাচাই-বাছাই করে নেয়া।

উত্তর : আপনি আপনার প্রশ্নে যে 'ডানপন্থী' পরিভাষাটি ব্যবহার করেছেন, তার সাথে আমাদের মতবিরোধ রয়েছে। বামপন্থী ও ডানপন্থী পরিভাষাগুলো

পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমাদের এখানে আমদানী করা হয়েছে। আমরা একথা মানতে রাজী নই যে, ইসলামের সম্পর্ক বামপন্থীদের মুকাবিলায় ডানপন্থীদের সাথে রয়েছে। ডানপন্থী পরিভাষাটি পুঁজিবাদী, সামন্তবাদী, সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী ও রক্ষণশীলদের জন্যেই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু মুসলমান যারা এ দেশে ইসলামী জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা এক মধ্যমপন্থী উম্মত (উম্মাতে ওসাত) এদের দৃষ্টিতে ডানপন্থী, বামপন্থী সবই ভ্রান্ত। ইসলামের প্রদর্শিত পথ সহজ ও সরল, ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। ডান বা বাম কোন দিকেই এর গতি ধাবিত নয়। ইসলামের সেরাতে মুস্তাকীম হচ্ছে মধ্যম ও সত্যাশ্রয়ী পথ। ডান-বাম কোন দিকেই তা ঝুঁকে পড়ে না। দুনিয়ায় একজন মুসলমানের স্থান হচ্ছে জজ বা বিচারপতির স্থান।

আমি অস্বীকার করি না যে, আমাদের দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে কিছু বামপন্থী লোক অবশ্য ঢুকে পড়েছিলো। কিন্তু এদের সংখ্যা ছিল নেহাত নগণ্য। এ আন্দোলনে এ ধরনের লোকের সংখ্যাই ছিলো বেশী, যারা দেশে সত্যিকারভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যেই সংগ্রাম করছিল। এদের সাথে এ দেশের সাধারণ মুসলমানদের একটি বিরাট অংশও ছিলো, যারা কামনা করতো যে, দেশে ইসলামই প্রতিষ্ঠা লাভ করুক এবং সর্বোপরি তারা নিজেদের জান-মাল বিপন্ন করে ইসলামী আদর্শের জন্যেই এ দেশ হাসিল করেছিল।

সমাজতন্ত্রী ও ফ্যাসিবাদী চক্র যখন বুঝতে পারলো যে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে যদি একবার দেশে সত্যিকারের গণতন্ত্র কায়েম হয়েই যায়, তবে আজ হোক আর কাল, একদিন অবশ্যই এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এজন্যই তারা চাইলো আন্দোলনকে হিংসাত্মক পথে পরিচালিত করতে। অতপর তারা যখন দেখতে পেলো, তাদের উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না বরং সরকার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হতে রাজী হয়ে গেলেন এবং গণতন্ত্র কায়েমের সম্ভাবনা ক্রমেই নিশ্চিত হয়ে উঠলো, তখন তারা প্রকাশ্যভাবেই কমিউনিষ্ট বিপ্লবের প্রচেষ্টা শুরু করে দিল। পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ধ্বংসাত্মক ও বিভীষিকাময় কার্যকলাপ সবারই জানা। সেখানে তারা হিংস্রতার বশবর্তী হয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, অরাজকতা ও নির্মম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। আর এ ধরনের পরিস্থিতিই হচ্ছে, যে কোন দেশে কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সুবর্ণ সুযোগ।

পশ্চিম পাকিস্তানে যেহেতু তারা ইসলামের ভিত্তিকে সুদৃঢ় বলে মনে করে তাই এখানে তারা ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের সরাসরি সংঘর্ষের মাধ্যমে নিজেদের যাত্রা শুরু করে।

আপনার এ অনুমান একান্ত সত্য যে, কুরআন অবমাননার দ্বারা তারা এটাই পরীক্ষা করতে চেয়েছিল যে, এ যমীন কদ্দুর তাদের অনুকূলে রয়েছে। এর উদাহরণ হচ্ছে ঠিক এইরূপ, যেমন কোন বাড়ীতে চোর ঢুকে প্রথমত ঘরে একটি পাথর নিক্ষেপ করে এটা পরীক্ষা করে নেয় যে, গৃহস্বামী কি জেগে আছে, না গভীর ঘুমে অচেতন রয়েছে। তাদের এই কার্যকলাপের বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখে তারা জনসাধারণের মনে নানারূপ বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে কি কি হাতিয়ার ব্যবহার করেছে, তাও আজ দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারা মুলতানে কুরআন অবমাননার এক মিথ্যা ও কাল্পনিক কাহিনী রচনা করে ফেলে। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তাদের এ মুখোশ জনসমক্ষে খসে পড়ে। অতপর শাহীওয়ালে ভাসানী সাহেবের উপর হামলার আরেকটি কল্পিত কাহিনীও রচনা করা হলো। এসব কাজের দ্বারা মূলত তারা নিজেদের হিংসাত্মক কার্যকলাপের দায়িত্ব অন্যের উপর চাপিয়ে নিজেদের অপকর্মের বৈধতা প্রমাণ করতে চাইলো। অবশ্য এই শেষ মুখোশটিও ইদানীং খসে পড়েছে। কারণ তারা যে দলগুলোর উপর অভিযোগ চাপাতে চেয়েছিলো, অনুসন্ধানে এদের কাউকেই এ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিন্তু দেশের প্রচার-যন্ত্র তাদের প্রভাবাধীন থাকায় তারা এর কল্যাণে বেশ কিছু লাভবান হয়েছে। গত দশ বছরের স্বৈরাচারী শাসনের ফলে সংবাদপত্র, সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান, রেডিও ইত্যাদিতে এই লালদেরই অধিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এরি মাধ্যমে তারা প্রতিটি মিথ্যাকে সত্যের লেবেল লাগিয়ে ও প্রতিটি সত্যকে মিথ্যার আবরণে প্রকাশের প্রয়াস পেয়েছে।*

প্রশ্ন ৪ ঃ একথা আজ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে, এ দেশে দু'টো দল হিংসাত্মক কার্যকলাপে বিশ্বাস করে এবং একথাও ঠিক যে, এরা সমাজতন্ত্রকে তার আভিধানিক অর্থেই ব্যবহার করে থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঃ

১। এ উভয় দলই কি নিজেদের মধ্যে সব ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে, না উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দিক থেকে এদের মধ্যে কোন রকম পার্থক্য রয়েছে?

---

* শাহিওয়ালে এই মামলার শুনানীর সময় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, মূলত হামলার কাহিনীটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং একটি বানোয়াট ঘটনা। প্রধান সাক্ষী জনৈক ডাক্তারের সাক্ষ্য থেকেও এটা প্রমাণিত হয়েছে। তাছাড়া ঘটনার পরপরই শাহিওয়ালের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ বিবৃতির মাধ্যমেও একথা বলেছেন যে, এমন কোন ঘটনাই সেদিন ওখানে ঘটেনি।—অনুবাদক।

২। এদের একটি দল কি সত্যিকারভাবেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে, না এদের সামনে রয়েছে ব্যক্তি কেন্দ্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন? "ইসলাম আমাদের ধর্ম, সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি ও গণতন্ত্র আমাদের রাজনীতি"—এই শ্লোগানটিকে আপনি কি যথার্থ বলে মনে করেন? আমার মনে হয় এরা এই আকর্ষণীয় শ্লোগানের মাধ্যমে আমাদের যুব-মানসে একটা চিন্তার দৈন্য ও মায়া-মরিচিকা সৃষ্টি করতে চায়।

৩। এই 'ত্রিমুখী শ্লোগান' কি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী?

৪। আপনি কি মনে করেন যে, এই দলটি সেই আসল সমাজতন্ত্রই প্রতিষ্ঠা করতে চায়—যার প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ও জ্ঞান গুরু ছিলেন ষ্টালিন, লেনিন ও মাও সেতুং? না তাদের এ কর্মতৎপরতার পেছনে অন্য কোন উদ্দেশ্য লুকায়িত আছে? থাকলে তা কি?

৫। ইসলাম ও সমাজতন্ত্র কি সত্যিই দু'টি পরস্পর বিরোধী আদর্শ? সমাজতন্ত্রের অর্থনীতিকে কি ইসলামের পরিপন্থী বলে আখ্যায়িত করা যেতে পারে?

৬। যদি ইসলাম ও সমাজতন্ত্র দু'টো পরস্পর বিরোধী মতাদর্শ হয়ে থাকে, তবে পুঁজিবাদের নিস্পেষণের ফলে গোটা সমাজ জুড়ে যে দুঃখ-দুর্দশা দেখা যাচ্ছে এবং যার অক্টোপাশ থেকে মানুষ মুক্তি পাওয়ার জন্য নিজেদের ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতিও দিন দিন অবিশ্বাসী হয়ে উঠছে—আপনার দৃষ্টিতে এর কি সমাধান রয়েছে?

৭। আপনি কি এই মত সমর্থন করেন যে, সাম্যবাদের প্রথম অবস্থা থেকে পুঁজিবাদের চরম বিকাশ পর্যন্ত মানব সন্তান একাধারে শ্রম-শোষণ ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অগণিত দোষ-ত্রুটির দ্বারা নিপীড়িত হয়েছে এবং আজিকার যুব-সমাজের মানসিক অস্বস্তির এটা কি অপরিহার্য পরিণাম নয়?

৮। আপনি কি একথার সাথে একমত যে, সমাজতন্ত্রের অনুসারীরা সবাই নিরেট বস্তুবাদী (Materialist) ও খোদাদ্রোহী (Athiest) নয়; বরং আমাদের দেশের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা তাদের মধ্যে বিশেষ ধ্যান-ধারণার জন্ম দিয়েছে, তারা পুঁজিবাদের (Capitalism) বিরুদ্ধে তাদের অসন্তুষ্টি ও সংগ্রামকে সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করার জন্য সমাজতন্ত্রের পরিভাষাটিকে ব্যবহার করছে। তাই এটা তাদের কাছে খোদাদ্রোহিতা নয় বরং পুঁজিবাদের যাবতীয় অপকারিতা ও দোষ-ত্রুটি মিটিয়ে দেয়ারই নামান্তর। অন্য কথায়, এটা হচ্ছে সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বন্টন, শ্রম-শোষণের বিলুপ্তি ও শ্রেণী বৈষম্যেরই মূলোৎপাটনের উপায়।

৯। ইসলাম কি সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন, শ্রম–শোষণ রহিত করন ও শ্রেণী বৈষম্যের অবসান অনুমোদন করে?

১০। ইসলামে কি পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদের কোন অবকাশ রয়েছে? থাকলে তা কতদূর? না থাকলে সমাজতন্ত্রের সাথে এর মতবিরোধ কোথায়?

১১। একথা কি ঠিক যে, ইসলামী রাষ্ট্র এমন সব বিধি–বিধান রহিত করে দিতে পারে, যা আকীদা–বিশ্বাস ও এবাদতের পর্যায়ে পড়ে না? অথচ এর ফলে কোন জাতি, দেশ বা রাষ্ট্রে শ্রেণী সংগ্রাম ও সামগ্রিক বিশৃংখলা দেখা দেয়।

১২। ইসলামের দৃষ্টিতে পুঁজি ও শ্রমের মূলে যদি কোন শ্রেণী–সংগ্রামের অস্তিত্ব না থাকে, তবে পুঁজি ও শ্রমের ভিত্তিতে শ্রেণী–পার্থক্য সৃষ্টির অবকাশ কোথায় রয়েছে? অতএব এ শ্রেণী পার্থক্যের বৈধতাই বা কি করে প্রমাণিত হতে পারে?

১৩। একথা কি সত্য নয় যে, এই শ্রেণীব্যবস্থাই গত কয়েক শতাব্দি যাবত ইসলাম ও মুসলমানদের অসংখ্য বিপদ–মুসিবতের মুখে ঠেলে দিয়েছে? যদি একথাই সত্য হয় তবে এ অবাঞ্ছিত ব্যবস্থাকে চিরতরে খতম ও বিলুপ্ত করে দিতে দোষটা কি?

১৪। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য যদি ঃ

ক) সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বন্টন হয়,

খ) রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে মানব জাতির জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করা হয়,

গ) উৎপাদনের উপায়–উপকরণকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়, তবে ইসলামের সাথে এর বিরোধটা কোথায়?

১৫। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আজ সর্বত্র যে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছে, তা সবই পুঁজিবাদের আধুনিক সংস্করণগুলো থেকেই সৃষ্টি হয়েছে। এক কথায় ইউরোপীয় শিল্প বিপ্লবের ফলেই শ্রম শোষণের এই সমস্যাটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সামন্ত সমাজেও একটা বিশেষ দলের এটি ছিলো ঐতিহাসিক অনুভূতি (অবশ্য সবাইর নয়)। অতপর এ সামন্ত সমাজের বিরুদ্ধে যে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠেছিলো, তা–ই পরে ইউরোপীয় পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে এশীয় জনগণের রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের রূপ নিয়েছে। এরি অপরিহার্য পরিণাম হিসেবে 'জমির মালিক চাষী'র মতো আকর্ষণীয় শ্লোগান জন্ম লাভ করেছে।

আপনার মতে এই শ্লোগানটির সাথে ইসলামের কোন্ দিকটার বৈপরিত্য প্রকাশ পেয়েছে?

উত্তর : আপনি যেহেতু ভাগ ভাগ করেই প্রশ্নগুলো পেশ করেছেন, তাই আমি জবাবও ভাগ ভাগ করেই দেয়ার চেষ্টা করবো।

১। এই দু'টো দলের মধ্যে একটি দলতো সত্যিকারভাবেই কমিউনিষ্ট বিপ্লবে বিশ্বাস করে, অবশ্য তাও আবার চীনা মার্কা (Chines brand)। এর দ্বিতীয় দলটি সম্পর্কে আমার ধারণা হচ্ছে যে, এদের ওপর ফ্যাসিবাদের প্রভাব বেশী, যদিও এরা কথায় কথায় সমাজতন্ত্রের বুলিই আওড়ায়। হিটলারও একদিন জাতীয়তাবাদের শ্লোগান নিয়েই আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তাই 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করার কারণেই উভয় দলকে এক মনে করা যেতে পারে না।

২। যে দলটির দিকে আপনি ইংগীত করেছেন, এদের কোন নির্দিষ্ট শ্লোগান নেই। সময় ও সুযোগ বুঝে এরা বিভিন্ন শ্লোগান তৈরী করে নেয়। গত কয়েক মাসে এ প্রতিষ্ঠানের নেতার মুখ-নিঃসৃত যেসব 'বাণী' পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, তার সব কয়টিকে একত্র করলে দেখা যাবে যে, এ যাবত প্রায় ডজন খানেক শ্লোগান তৈরী হয়েছে। এজন্যই এটা বলা মুশকিল যে, ইসলাম ও সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত ও সর্বশেষ রায় কোনটি? 'ইসলাম আমাদের ধর্মনীতি, সমাজতন্ত্র আমাদের অর্থনীতি ও গণতন্ত্র আমাদের রাজনীতি'—কথাটি যদি ধোঁকা না হয়ে থাকে, তবে, সুস্পষ্ট মূর্খতা নিশ্চয়ই, এতে কোন সন্দেহ নেই। একই নিঃশ্বাসে এই তিনটি কথা বলে দেয়ার পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, ইসলাম আমাদের জন্যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পেশ করেনি, না রাজনীতির ক্ষেত্রে আমাদের পথ প্রদর্শন করেছে। অতপর তা যদি নিছক কোন ধর্মই হয়ে থাকে, তবে তা অবশ্যই মসজিদ ও খানকাহতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ। একথাটি এমন কোন ব্যক্তি কখনো বলতে পারে না, যে ইসলাম সম্পর্কে সামান্যতম পড়াশোনাও করেছে এবং জেনে বুঝেই ইসলামকে নিজের জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। আসল কথা হচ্ছে এই যে, সমাজতন্ত্র হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শের নাম। ব্যক্তি জীবনের আকিদা-বিশ্বাস ও নৈতিক অনুশাসন থেকে শুরু করে সামাজিক জীবনের খুটিনাটি বিষয় পর্যন্ত ইসলামের সাথে এর বিরোধ রয়েছে। এভাবেই গণতন্ত্রকেও যখন ইসলাম থেকে আলাদা করে চিন্তা করা হবে, তখন তা-ই হবে পাশ্চাত্যের খোদাহীন গণতন্ত্র—যা ইসলামের দৃষ্টিতে কুফরীরই নামান্তর। কেননা ইসলামের সীমা-সরহদ ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত যে গণতন্ত্র, তার অর্থ

হচ্ছে এই যে, জনগণ কোন আল্লাহ-নির্ধারিত হালালকে হারামে পরিণত করতে পারবে, আবার হারামকেও ইচ্ছা করলে হালাল বানিয়ে নিতে পারবে, জনগণ এ ক্ষেত্রে কোন খোদা রাসূলের অনুগত হবে না। অতপর ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে সমাজতন্ত্রকে নিজেদের অর্থনীতি ও সমাজতন্ত্রকে নিজেদের রাজনীতি মনে করার স্পষ্ট মানে হচ্ছে, একই সময় তিনটি পরস্পর বিরোধী ও বিপরীতমুখী মতের সমন্বয় সাধনের ব্যর্থ চেষ্টা করা। এটা শুধু ঐ ব্যক্তির পক্ষেই করা সম্ভব, যে নিজে ধোঁকাবাজ ও প্রতারক কিংবা আস্ত একটা মূর্খ।

৩। এর জবাব প্রথম অংশের মধ্যেই রয়েছে।

৪। আমার ধারণা এই যে, এই দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে অনেকগুলো দর্শনের সমন্বয় রয়েছে। বিশেষ কোন একটার প্রভাবই এতে পরিলক্ষিত হয় না। এদের কর্মনীতিতে যে ধরন প্রকাশ পায়—যেমন একটু আগেই আমি বলেছি, তা হচ্ছে ফ্যাসিবাদ। যেভাবে স্বীয় অনুসারীদের এরা সংগঠিত করে এবং শপথ পড়ায়, তাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, প্রখ্যাত ফ্যাসিবাদী নেতা হিটলারের মতো কোন বিদ্যুতের গতিতে চলমান ফৌজ (Storm troopers) তৈরী করা হচ্ছে। এ পন্থায় কেবল এক ব্যক্তির একনায়কত্বই কায়েম হতে পারে, অন্য কিছু নয়।

৫। ইসলাম ও সমাজতন্ত্র—যেমন আমি ইতিপূর্বেই বলেছি—দু'টো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতাদর্শ। ইসলামের বুনিয়াদ এ আকিদার উপর প্রতিষ্ঠিত যে, আমরা এক খোদার বান্দাহ। তিনি তাঁর রাসূল ও কিতাবের মাধ্যমে আমাদের জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের জন্যে যে পথনির্দেশ দিয়েছেন, তার সত্যতা সম্পর্কে আমাদের পূর্ণ প্রত্যয় রয়েছে। মুসলমান হিসেবে আমাদের কাজ হচ্ছে এগুলোর অনুসরণ করা। মুসলমানদের দৃষ্টিতে এই দুনিয়ার জীবনটাই চরম লক্ষ্য নয়, পরকালে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভই তার একমাত্র কাম্য। আল্লাহর এ সন্তুষ্টি অর্জনে আমরা তখনই সক্ষম হতে পারবো, যখন আমরা এই দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ এবং তার রাসূলের নির্দেশ পালন করে চলবো।

এই মূল বিশ্বাসের উপরই ইসলাম আমাদের কাছে একটি পূর্ণ নৈতিক বিধি-বিধান ও এবাদত-বন্দেগীর একটা পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা পেশ করে, যাতে করে আমাদের গোটা জীবনটাই এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হতে পারে। এর সাথে ইসলাম আমাদের জীবনের খুঁটিনাটি দিক ও বিভাগের

জন্যে একটি ব্যাপক আইনব্যবস্থাও প্রদান করেছে, যার সীমারেখা পরিবার থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইন-আদালত, পার্লামেন্ট, হাট-বাজার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। ঠিক এই আকিদা-বিশ্বাসের বিপরীত হচ্ছে সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের যাত্রাই একথার উপর শুরু হয় যে, রাষ্ট্রীয় জীবনে আমাদের কোন আল্লাহ ও রাসূলের পথ প্রদর্শনের প্রয়োজন নেই। বরং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজ-কর্মের জন্যে নিজেদের সুবিধে মতো একটা জীবনদর্শন ও জীবনপদ্ধতি রচনা করার অধিকার আমরা নিজেরাই রাখি। এই মূল ভিত্তির উপর সমাজতন্ত্র তার নিজস্ব ইতিহাস দর্শন তৈরী করে, অর্থনৈতিক দর্শন পেশ করে। অতপর এ অর্থনৈতিক দর্শনকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে যতো অন্যায় উপায়-উপকরণের আশ্রয়ই গ্রহণ করার দরকার হয়, তা-ই সে নির্বিকার গ্রহণ করতে শুরু করে। যদি তার জন্যে মিথ্যা, ধোঁকা, নরহত্যা অথবা রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়ারও প্রয়োজন হয়, তবুও কোন আপত্তি নেই। অথচ ইসলামের উপস্থাপিত সামাজিক বিধান, সমাজতন্ত্রের এই দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামের সামাজিক বিধান ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর মৌলিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করে, কিন্তু ব্যক্তিকে একটি সীমারেখার অনুগত বানিয়ে দেয়, যাতে করে তা সমষ্টির জন্যে ক্ষতিকর না হয়ে কল্যাণকরই প্রমাণিত হতে পারে।

অন্যদিকে একটি কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার উপরও ইসলাম সমভাবে গুরুত্ব আরোপ করে। যার অভ্যন্তরে প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত গুণাবলীর বিকাশ সাধন সম্ভব হতে পারে। এই সমাজের ব্যক্তি, শ্রেণী ও সমষ্টি বিশেষও পারস্পরিক সংঘর্ষের পরিবর্তে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসেবেই গড়ে উঠে এবং এ ধরনের একটি সমাজ একত্রিত হয়ে অন্যায়-অনাচারকে নির্মূল করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। সমাজতন্ত্র ঠিক এর বিপরীত। সে মানুষ সম্পর্কে খৃষ্টীয় ধ্যান-ধারণার অনুসরণ করে। খৃষ্টানদের মতে মানুষ জন্মগতভাবে পাপী। এবং সে কোন মতেই বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল নয়। এই মত গ্রহণ করেই সমাজতন্ত্র বলে যে, এই অবিশ্বাসী মানুষকে কিছুতেই অর্থ-সম্পদের উৎপাদন ও উপায়-উপকরণের মালিক বানানো যেতে পারে না। এবং এটাও সম্ভব নয় যে, ব্যক্তি তার ইচ্ছে ও সুবিধে মতো তা ব্যয় করবে। সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিতে সম্পদের উপায়-উপকরণের ব্যক্তিগত মালিকানা ও তার ব্যয়-ব্যবহারের স্বাধীনতাই হচ্ছে যাবতীয় সামাজিক অনাচারের মৌল কারণ। এজন্যই সমাজতন্ত্র এমন এক সমাজব্যবস্থার প্রস্তাব করে, যেখানে যাবতীয় অর্থনৈতিক বিষয় ব্যক্তির হাত

থেকে কেড়ে নিয়ে সমাজের হাতে তুলে দেয়া হবে। ব্যক্তিকে শুধু সমাজযন্ত্রের এক একটা খুচরা অংশ হিসেবেই কাজ করতে হবে। কিন্তু এটা খুবই অদ্ভুত ও এক পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা। ব্যক্তি–মানুষকে অবিশ্বাসী ও অনির্ভরশীল হিসেবে গণ্য করে যে মতবাদ গড়া হলো, তারই এক পর্যায়ে আবার স্বীকার করা হচ্ছে যে, সমাজযন্ত্রকে যখন কেন্দ্রীয়ভাবে গুটিকয়েক ব্যক্তি পরিচালনা করবে, তখন তারা সাধারণ মানবীয় দোষ–ত্রুটি থেকে মুক্ত—পূত-পবিত্র মানুষরূপে পরিগণিত হবে এবং তাদেরই নিয়ন্ত্রণে দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে পরিচালিত হবে। আর সম্পদের বিলি–বন্টনও হবে ন্যায়–ইনসাফের ভিত্তিতে। একজন সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকও সামান্যতম চিন্তা করলে সমাজতন্ত্রের এ পরস্পর বিরোধী চিন্তাধারা ও বুনিয়াদী গলদ সহজেই অনুধাবন করতে পারবে।

উপরন্তু সমাজতন্ত্র গত পঞ্চাশ বছরে বাস্তবের কষ্টিপাথরে এটাকে আরো সপ্রমাণিত করে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনে এই সমাজব্যবস্থার এক্সপেরিমেন্টের বাস্তব ফলশ্রুতি আমাদের সামনে রয়েছে। উভয় দেশেই ব্যক্তি বিশেষকে প্রায় খোদার মর্যাদা দিয়ে রাখা হয়েছে। রাশিয়াতে এই মর্যাদা দেয়া হয়েছিলো ষ্টালিনকে, আর সারা দুনিয়া এর অবাঞ্ছিত পরিণাম দেখতে পেয়েছে। চীনে মাও সেতুং–এর ব্যক্তি পূজা (Personality cult) বর্তমানে এক চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে। তারও পরিণাম আজ দুনিয়াবাসীর কাছে প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। এককালের মাওবাদের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা বলে পরিচিত লিউ শাও চী'র মতো ব্যক্তিও আজ দু'বছর যাবত অভিশাপ ও তিরস্কারের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়েছেন, কিন্তু আজ পর্যন্ত জনগণের কাছে এর প্রকৃত কারণ ও তাঁর অবস্থা বিশ্লেষণের কোন সুযোগই তাকে দেয়া হয়নি। এই আলোচনার পর এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাবে যে, ইসলাম তার আকিদা–বিশ্বাস থেকে শুরু করে বাস্তব জীবনের খুটিনাটি বিষয়ে পর্যন্ত সমাজতন্ত্রের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে।

৬। পুঁজিবাদের আসল শত্রু কেউ থাকলে সেটা সমাজতন্ত্র নয়—বরং তা হচ্ছে ইসলাম। সমাজতন্ত্রের সাথে পুঁজিবাদের নামকাওয়াস্তে যে শত্রুতা রয়েছে, তা শুধু এ কারণে যে, সমাজতন্ত্র সমাজের অনেকগুলো লোক বা প্রতিষ্ঠানের হাতে জায়গা–জমি বা মিল–কারখানা ও ব্যবসায়–বাণিজ্য কুক্ষিগত থাকায় এই পদ্ধতিকে সঠিক বলে মনে করে না, তাই সে সমস্ত পুঁজি ও জায়গা–জমি একত্রিত করে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেয়। এর

সোজা অর্থ হচ্ছে, পুঁজিকে আরো অধিকতর এবং সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করে ফেলা। সমাজের পুঁজিপতি ও জমিদারের যে বিক্ষিপ্ত শক্তি সাধারণ মানুষকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়নি, সমাজতন্ত্র সেখানে একটি বৃহৎ পুঁজিপতি ও জমিদারী রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করে ব্যক্তিকে একান্ত অসহায় অবস্থায় তার হাতে ছেড়ে দেয়। অতপর এই ব্যবস্থার অধীনে একই প্রতিষ্ঠান আইন প্রণেতা হবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও সামরিক শক্তিরও পূর্ণ অধিকারী হবে, আবার যাবতীয় অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের মালিকানাও তার হাতেই নিবদ্ধ থাকবে। এর ফলে এমন এক জঘন্য ধরনের একনায়কত্বের সৃষ্টি হয়, যার তুলনায় আজ পর্যন্ত দুনিয়ার অপর কোন জীবনব্যবস্থা এমন একনায়কত্বের জন্ম দান করতে পারেনি।

ইসলাম এর সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মতাদর্শ। সে পুঁজিবাদের যেমন বিরোধী—যা আজকাল পাশ্চাত্য পুঁজিবাদ হিসেবে পরিচিত এবং অপর প্রান্ত সীমার সমাজতন্ত্রের সৃষ্ট বৃহৎ আকারে সম্পদ কেন্দ্রীভূতকরণ জাতীয় নিকৃষ্ট ধরনের পুঁজিবাদেরও তেমনি বিরোধী। ইসলাম এমন এক ধরনের স্বাধীন অর্থনীতি (Free Economy) কায়েম করতে চায়, যা একদিকে ব্যক্তিকে ব্যক্তি মালিকানার স্বীকৃতি দিয়ে তার ব্যক্তি-স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করে। অপরদিকে সম্পদ উপার্জন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে হারাম-হালালের বিধি-নিষেধ আরোপ করে ব্যক্তিকে তার পূর্ণ অনুসারী করে তুলে। অতপর ইসলাম তার নৈতিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিকে এমনভাবে তৈরী করে, যাতে করে ব্যক্তি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই একে অপরের সাহায্য-সহায়তা করবে। প্রয়োজনবোধে একে অপরকে হাত ধরে তুলে নেবে। এই নৈতিক বিধান পেশ করেই ইসলাম তার দায়িত্ব শেষ করে দেয়নি। আইনগত পন্থায়ও সে কঠোরভাবে এ ব্যবস্থা করে রেখেছে, যেন সম্পদ কোন দিনই কোন বিশেষ শ্রেণীর হাতে পুঞ্জিভূত হতে না পারে। বরং তা যেন প্রসারিত হয়ে সমাজের প্রতিটি দুর্বল ব্যক্তির হাতেও পৌঁছতে পারে, সে ব্যবস্থাও করে দিয়েছে। অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণের যাবতীয় ইজারাদারীকে ইসলাম বেআইনী ঘোষণা করেছে। এ কারণেই ইসলামী সমাজে কোন স্থায়ী সুবিধে প্রাপ্ত শ্রেণী (Privileged classes) গজিয়ে উঠতে পারে না। অপরদিকে সামাজিক জীবনে প্রতিটি ব্যক্তিকে ইসলাম উন্নতির সমপরিমাণ সুযোগ দান করে, যাতে করে প্রতিটি ব্যক্তিই নিজের যোগ্যতার দ্বারা যতদূর ইচ্ছা উন্নতি করতে পারে। কিন্তু সেটা অবশ্যই হালাল উপায়ে হতে হবে। রাতারাতি বা কৃত্রিম উপায়ে কোন শ্রেণী গজিয়ে উঠুক-এর অবকাশ ইসলাম মোটেই দেয়

না। স্বাভাবিকভাবে যে শ্রেণী জন্ম লাভ করে, ইসলাম তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঘৃণা ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে তাদের মধ্যে সাহায্য-সহানুভূতির একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলে। আমাদের দেশে যদি ইসলামের উপস্থাপিত এই ব্যবস্থার আলোকে অর্থনীতিকে পুনর্গঠিত করা হতো এবং মুখে ইসলামের নাম নিয়ে তার বিপরীত কাজ করার মত এই মোনাফেকী করা না হতো, তবে আজ নিশ্চয়ই এমন অবস্থা দেখা দিতো না যে, মানুষ পুঁজিবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের আশায় অপর একটি অনৈসলামী ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হতো।

৭। আপনার এই ধারণা একান্ত সত্য।

৮। আপনি যে অবস্থার কথা বলছেন, তা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থারই কুফল। এই শিক্ষা আমাদের যুবকদের ইসলাম থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রেখে শুধু ইউরোপীয় ধ্যান-ধারণা ও সভ্যতার 'অমৃত সুধা' পান করিয়েই প্রতিপালন করেছে। এজন্যই আজ যখন তারা প্রাচীনকালের সামন্তবাদ, আধুনিক কালের পুঁজিবাদ ও একটি অস্বস্তিকর আমলাতন্ত্রের অনাচার থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করে এবং সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিতে পারে—এমন কোন পথের সন্ধান করে, তখন তাদের মন-মগজ ইসলামের পরিবর্তে একটি বিশেষ মতাদর্শের দিকেই ঝুঁকে পড়ে। এই বিদেশী মতাদর্শের মধ্যে সমাজতন্ত্রই ছিলো এমন একটি ব্যবস্থা, যা পুঁজিবাদের যাবতীয় রোগ-শোকের চিকিৎসার দাবী করেছিলো। এসব কারণেই আমাদের যুবকরা পাইকারীভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে ধাবিত হতে শুরু করে। তবে এদের মধ্যে খুবই স্বল্প সংখ্যক এমন আছে, যারা প্রকৃতই সমাজতন্ত্রের বস্তুবাদিতা ও আল্লাহদ্রোহিতা গ্রহণ করেছে। আসলে ব্যাপার হচ্ছে, পুঁজিবাদী রোগের একমাত্র চিকিৎসাই সমাজতন্ত্র, এ দাবী শুনেই তারা ধোঁকা খাচ্ছে। সমাজতন্ত্রের অনুসারীদের একটি বিরাট অংশ এমনও আছে, যাদের এ অনুভূতিও নেই যে, সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক বন্টন ও শ্রম-নির্যাতন বন্ধ করার জন্যে তারা এমন একটি মতাদর্শের দিকে ধাবিত হচ্ছে, যেটা কেবল একটি বিস্তারিত দর্শন ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থাই নয়, বরং দুনিয়ার বিভিন্ন দেশে তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিতও রয়েছে। এর অনুসরণ করতে গিয়ে তারা আস্তে আস্তে সমাজতন্ত্রের অর্থনীতির সাথে তার বস্তুবাদী নীতি ও আল্লাহদ্রোহিতাকেও হজম করে নেবে। আল্লাহদ্রোহিতার পথে তাদের চলার ইচ্ছে থাক-বা না-থাক, তাদেরকে ঐ পথ ধরেই চলতে হবে।

৯। এই প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, একমাত্র ইসলামী জীবন বিধানের মাধ্যমেই সম্পদের সুষ্ঠু বন্টন ও শ্রম-নির্যাতন বন্ধ করার নিশ্চয়তা বিধান সম্ভব হতে পারে এবং এ ব্যাপারে যাবতীয় বৈষম্যের চিরতরে অবসান একমাত্র ইসলামই ঘটাতে পারে।

১০। পুঁজিবাদের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তির কোন সম্পদের মালিক হওয়া। কিন্তু পারিভাষিক দিক থেকে এটাকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার জন্যই প্রয়োগ করা হয়, যা আজকাল পাশ্চাত্য দেশসমূহে চালু রয়েছে। ইসলামে অবশ্য এর আভিধানিক অর্থটি বৈধ আর পারিভাষিক অর্থটি অবৈধ। এই প্রসঙ্গে একথা মনে রাখা দরকার যে, ইসলাম শুধু এতটুকু মালিকানাই জায়েজ রাখে, যেটুকু হলাল উপায়ে অর্জিত এবং নেসাবের মালিক হলে যাকাত আদায় করা হয়েছে। সর্বোপরি যে মালিকানাকে ইসলামের নিয়ম-নীতি অনুযায়ীই খরচ করা হবে।

এবার জায়গীরদারীর প্রসংগে আসা যাক। সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জমির মালিকানাকেই জায়গীর বলা হয়। এ ব্যাপারে ইসলাম শুধু ন্যায়ানুগ সরকার-গুলোর প্রদত্ত জায়গীরকেই জায়েজ মনে করে। আবার সে দান কোন বৈধ কাজের পুরস্কার অথবা কোন বৈধ কাজ করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত দেয়া হবে। এই যমীন কোন অনাবাদী এলাকা ও সরকারী তহবিল থেকেই দেয়া হবে। কোন ব্যক্তির যমীন কেড়ে নিয়ে আরেক জনের জায়গীর করে দেয়া ইসলামে সম্পূর্ণ হারাম। আবার বৈধ মালিকদের স্থলে পুরো যমীনে অন্য এক ব্যক্তিকে জায়গীর দেয়াও ইসলামে জায়েজ নেই। কারণ এতে করে বৈধ মালিকরা জায়গীরদারের চাষীতে পরিণত হয়। ইসলাম আবার জায়গীরের ক্ষেত্রে শর্ত আরোপ করেছে যে, কোন জায়গীর তিন বছর পর্যন্ত অনাবাদী থাকলে তা অবশ্যই বাতিল বলে গণ্য হবে। এসব শর্তাবলী সামনে রেখে চিন্তা করলে এটা স্পষ্টত বুঝা যাবে, বর্তমানের জালেম ও অত্যাচারী সরকারদের প্রদত্ত সমস্ত জায়গীরই ইসলামে অবৈধ।

আপনার প্রশ্নের এই অংশ-ইসলামের সাথে সমাজতন্ত্রের বিরোধটা কোথায়? এর জবাব হচ্ছে এই যে, সমাজতন্ত্র মৌলিকভাবেই সম্পদ ও যমীনের ব্যক্তিগত মালিকানার বিরোধী, অথচ ইসলাম বৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদে ব্যক্তিগত মালিকানা স্বীকার করে। সমাজতন্ত্রে সমস্ত পুঁজিপতি, জায়গীরদার ও জমিদারকে খতম করে তাদের জায়গায় একজন বৃহৎ পুঁজিপতির জন্মদান করে। সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাস যাদের জানা আছে, তারা একথা ভাল করেই জানেন যে, সেখানে বড় বড় জমিদারের সাথে সাথে

ছোট ছোট ভূস্বামীদেরকেও মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং এই সামষ্টিক মালিকানার জন্যে তারা লাখো লাখো কৃষক ও চাষীকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়েছে।

১১। যেসব কারণে দেশে সার্বিক বিশৃংখলা দেখা দেয় তা দূর করার সহজতম পদ্ধতি হচ্ছে, সমাজে পূর্ণাঙ্গভাবে ইসলামী আইন–কানুন প্রতিষ্ঠা করা এবং এরি মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন দিক ও বিভাগের সংস্কার করে সমাজটাকে একটা কল্যাণমূলক সমাজে পরিণত করা। এ উদ্দেশ্যে যদি পুরাতন কুসংস্কার দূর করার জন্যে কোন বিশেষ পন্থা গ্রহণ করতে হয়, তবে তা ঠিক ততোটুকুই করতে হবে, যতটুকু এর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অবশ্য এখানেও এই শর্ত রয়েছে যে, তা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী হবে না।

ইসলামী রাষ্ট্র শরীয়তের কোন আইন–কানুন রহিত করতে পারে না, যা আকিদা–বিশ্বাস ও এবাদতের পর্যায়ে পড়ে না। কারণ এগুলো ইসলামী বিধানেরই অন্তরভুক্ত। অবশ্য প্রয়োজনবোধে কোন অনাচার দূর করতে হলে কোন মুবাহ (যা করা না করা উভয়ই সমান) কাজের উপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে পারে। যেমন রাসূল (সাঃ) তার নবুওয়াতের প্রথম পর্যায়ে কবর জেয়ারতকে নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু পরে তিনি আবার এর অনুমতি প্রদান করেন। তার এই অনুমতি প্রমাণ করে যে, কবর জেয়ারতের কাজটি মূলত ছিলো মুবাহ, কিন্তু রাসূল (সাঃ) অস্থায়ীভাবেই তা নিষেধ করেছেন। সমাজ দেহ পূর্ববর্তী শিরকের যে কুসংস্কার আঁকড়িয়ে রেখেছিল, তাকে সমূলে উৎখাত করার জন্য এই নিষেধাজ্ঞা প্রয়োজনীয় ছিলো। এভাবেই মদ হারাম হয়ে যাবার পর তার বিশেষ কয়েকটি পাত্রের ব্যবহারও সাময়িকভাবে নিষেধ করে দেয়া হয়। এগুলোকে মদ প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করার কাজে ব্যবহার করা হত। পরে তার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়।

এ ঘটনা দু'টো থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, ইসলামী রাষ্ট্র কোন বৃহত্তর 'শরয়ী মুসলাহাতের' জন্যে সাময়িকভাবে কোন মুবাহকে রহিত করে দিতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ধরনের নিষেধাজ্ঞা শুধু সে রাষ্ট্রই আরোপ করতে পারবে, যে রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন বিদেশী মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়। এ ধরনের নিষেধাজ্ঞাকে স্থায়ীভাবে আইনের মর্যাদা দেয়া ইসলামে জায়েজ নেই। তাকে শুধু একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্তই চালু রাখতে হবে, যতোক্ষণ পর্যন্ত ইসলামী কানুন জারী করে সমাজের অবস্থা স্বাভাবিক রূপ না নেবে।

১২। শ্রম ও পূঁজির উপর ভিত্তি করে যে শ্রেণী-বৈষম্য গড়ে উঠে, তার অর্থ যদি এই হয় যে, দেশের আইন কানুন ও শাসনতান্ত্রিক বিধান দ্বারা তাকে স্থায়ীভাবেই জিইয়ে রাখতে হবে, তাহলে ইসলামে এর সামান্যতম অবকাশও নেই। অবশ্য এমন বৈষম্য, যা প্রকৃতিগত কারণেই জন্মলাভ করেছে, ইসলাম তাকে বিলুপ্ত করতে চায় না। কেননা এটা প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করারই নামান্তর। যেমন, এক ব্যক্তি কোন ধনীর ঘরে অথবা কোন উন্নত এলাকায় জন্মগ্রহণ করেছে— এখন এটা স্বাভাবিক যে, এই ব্যক্তি আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়েই তার জীবন যাত্রা শুরু করবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি তার স্বাচ্ছন্দ্য বাকি রাখতে অথবা একে আরো বাড়িয়ে তুলতে গিয়ে অযোগ্যতার পরিচয় দেয়, তবে প্রকৃতিগত কারণেই সে তার জন্মগত স্থান থেকে বিচ্যুত হবে। ঠিক এরই বিপরীত কোন ব্যক্তি কোন গরীবের ঘরে অথবা অনুন্নত এলাকায় জন্ম নিয়েছে, তবে নিশ্চয়ই সে অসচ্ছল অবস্থায় তার জীবন যাত্রা শুরু করবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি নিজের যোগ্যতা ও আল্লাহ্‌ তায়ালার মেহেরবানীতে নিজের অবস্থা পরিবর্তন করে নিতে পারে, তবে ইসলামী সমাজ কোন অবস্থায়ই তার ওপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। এটাই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি এবং সৃষ্টির অনুপাতে সমাজের প্রকৃতিগত শ্রেণী বৈষম্য। এই বৈষম্য কোন সময়ই এক রকম থাকে না ; বরং হামেশাই এটা পরিবর্তিত হতে থাকে। ইসলামের কোন কানুনই এই প্রকৃতিগত শ্রেণী বৈষম্যকে জিইয়ে রাখার পক্ষপাতি নয়। বরং ইসলাম বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করে, যাতে সবল ও দুর্বলের মধ্যে কখনো শ্রেণী সংগ্রাম সৃষ্টি না হয়। বরং সবল শ্রেণী হামেশাই দুর্বল শ্রেণীকে উন্নতি বিধানে ও আশ্রয় প্রদানে সাহায্যকারী হবে। এই ব্যবস্থার কল্যাণে সমাজে এমন কোন শ্রেণীই থাকবে না, যাদের কাছে মৌলিক মানবীয় প্রয়োজন—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা সহজলভ্য হবে না।

১৩। ইতিপূর্বে আপনার ১২নং প্রশ্নের জবাবে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম, তার ওপর চিন্তা করলেই এই অংশের জবাবও পাওয়া যাবে। মুসলিম জাতি যখনি ইসলামী মূলনীতিকে উপেক্ষা করে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ সৃষ্টি করেছে, তখনি তারা এর অবাঞ্ছিত পরিণাম ভোগ করেছে। কিন্তু এই অশুভ পরিণাম থেকে যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, জোর-জবরদস্তি একটা শ্রেণীহীন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা করতে হবে—যা সমাজতন্ত্রের ইপ্সিত লক্ষ্য এবং যেটা প্রতিষ্ঠা করতে কার্যত সমাজতন্ত্র চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে—তাহলে এটা হবে আমাদের আরেক ভুল। আগের

ভুলের চাইতে এটা আরও মারাত্মক হবে। প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম—তা প্রাচীন পুঁজিবাদের মাধ্যমে হোক কিংবা আধুনিক সমাজতন্ত্রের মাধ্যমেই হোক, সবই মানুষের জন্যে ক্ষতিকর। মানব সন্তানকে অতীতেও এর অনেক কুফল ভোগ করতে হয়েছে। অবশেষে প্রকৃতির সাথে সংগ্রাম করতে গিয়ে মানুষকে পরাজয়ই বরণ করতে হয়েছে। সমাজতন্ত্র একটা শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তোলাকে নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু কেন সে ব্যর্থ হয়েছে? কেন সে পুরাতন শ্রেণীর পরিবর্তে নতুন আরেক শ্রেণী সৃষ্টির কারণ হয়েছে? এর কারণ হচ্ছে, প্রকৃতির এই শ্রেণী বিন্যাসকে কোন অবস্থাতেই বিলুপ্ত করা যায় না। প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে সমাজতন্ত্র যা করেছে, তা হচ্ছে, সর্বহারাদের নামে সে জুলুম ও হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, দস্তুরমতো ডাকাতি করতেও প্রয়াসী হয়েছে। এরদ্বারা তারা পুরাতন সুবিধেভোগী একটি শ্রেণীকে অবশ্যই নির্মূল করেছে, কিন্তু তা হাজার হাজার মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দিয়ে। অতপর তারা নিজেরাই আরেকটি বিশেষ শ্রেণীর জন্ম দিয়েছে। আর এ নয়া শ্রেণীর দাপটে এই সর্বহারাই সবচেয়ে বেশী নির্যাতিত হয়েছে। অথচ এই শ্রেণীর দোহাই দিয়ে এই তথাকথিত শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। পুঁজিবাদের পুরাতন অভিজ্ঞতা ও সমাজতন্ত্রের নতুন অভিজ্ঞতা আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, আমাদেরকে ইসলামের নির্দেশিত পথের দিকেই ধাবিত হতে হবে।

১৪। সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য 'যদি এই হয়' বলে আপনি প্রশ্ন করেছেন, অতপর জিজ্ঞেস করেছেন—এই লক্ষ্যের সাথে ইসলামের বিরোধটা কোথায়? আমার দৃষ্টিতে প্রশ্নের এ ধরনটাই মূলত ঠিক নয়। কারণ, আপনি 'যদি'র মাধ্যমে যাকে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্য হিসেবে পেশ করেছেন, ওটা আসলে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যই নয়। সম্পদের ইনসাফ ভিত্তিক বন্টনের এই দাবি সমাজতন্ত্র কোন দিনই পেশ করেনি। বড়জোর এতদূর বলা যায় যে, সে সম্পদের সমবন্টন চেয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যখন এর ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে, তখন তারা নিজেদের ভোল পাল্টিয়ে নিয়েছে। অতপর তারা সম্পদ বন্টনের যে পদ্ধতি বের করেছে, তাকে আর যাই হোক, ইনসাফভিত্তিক কিছুতেই বলা যায় না। একে শুধু একটা নিবর্তনমূলক ব্যবস্থাই বলা যেতে পারে। কেননা, ইনসাফ-ভিত্তিক বন্টনের পূর্বশর্ত হচ্ছে, বন্টনকারীকে অবশ্যই নিরপেক্ষ হতে হবে। যাদের মধ্যে তিনি ইনসাফ করতে যাবেন, তারা সবাই তার দৃষ্টিতে সমান হবে। সমাজতন্ত্রে যাবতীয় সম্পদ বন্টনের একচেটিয়া অধিকার হচ্ছে একটি পার্টির হাতে। এমতাবস্থায় শেষ পর্যন্ত ন্যায়ানুগ বন্টনের পরিবর্তে সম্পদ আরো

কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। আর এটা সত্যিকথা যে, পক্ষপাতিত্বের উপরই সমাজতান্ত্রিক দর্শনের যাত্রা শুরু হয়। এই পক্ষপাতিত্ব হচ্ছে, বুর্জোয়াদের মোকাবিলায় সর্বহারাদের প্রতি। এই সর্বহারা ছাড়া সমাজের বাদ বাকি মানুষের প্রতি এই দর্শনের একটা স্থায়ী বিদ্বেষ ও যুদ্ধংদেহী মনোভাব রয়েছে। এরপর আপনিই চিন্তা করে বলুন, এদের দ্বারা কি করে সম্পদের ইনসাফপূর্ণ বন্টন সম্ভব হতে পারে?

এ ধরনের সমাজে আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, যে দলটির হাতে সম্পদ বন্টনের চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে—তারা বাস্তব জীবনে জুলুম-অত্যাচারের এমন এক নিকৃষ্টতম পর্যায়ে নেমে আসে, যা একমাত্র রাজতন্ত্রে রাজার, পুঁজিবাদে পুঁজিপতির ও সামন্তবাদী সমাজে ভূস্বামীর জন্যেই শোভা পায়। কেননা, এখানে যাবতীয় উপায়-উপকরণ তাদেরই কুক্ষিগত থাকে, যাদের হাতে আবার মানুষের নিরংকুশ রাজনৈতিক কর্তৃত্বেরও চাবিকাঠি নিবদ্ধ থাকে। ইতিহাসে কোন রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ এমন জুলুম-নির্যাতন করতে পারেনি, যা এই সমাজতন্ত্রের ফলে সম্ভব হয়েছে। এরপর যদিও সমাজতন্ত্র মানুষের জীবন ধারণের জন্যে দু'মুঠো অন্নের সংস্থান করে, তবে তার সাথে আর জেল-সুপারের সাথে কি পার্থক্য রয়েছে? জেল-সুপারও তো অন্ন, বস্ত্র ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। মোটকথা ইসলামের প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সাথে এর প্রতিটি অংশেরই বিরোধ রয়েছে।

১৫। এই অংশে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, আমি আমার 'ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ' বইয়ে তার বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাতে আমি বলেছিলাম যে, সামন্তবাদ থেকে সমাজবাদ ও ফ্যাসিবাদ পর্যন্ত—কতিপয় পাশ্চাত্য দেশে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের আপোষমূলক সমন্বয়ের ফলে সৃষ্ট প্রতিটি মতবাদ ও সমস্যাই মূলত পাশ্চাত্যের একটি খোদাহীন সমাজে জন্মলাভ করেছে। পাশ্চাত্যের জাতিসমূহ তখন সমাজ-সভ্যতার ক্ষেত্রে আল্লাহ-রাসূলের পথনির্দেশ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিলো। এরা নিছক হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তি হয়েই আল্লাহ-রাসূলকে অমান্য করেছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সাথে সাথে বস্তুতান্ত্রিক জগতেও তাকে সঠিক পথ দেখাবার জন্যেই এই পথনির্দেশ নাযিল করেছেন। এই খোদায়ী পথ থেকে বঞ্চিত হয়ে পাশ্চাত্যের জাতিগুলো কখনো এই প্রান্তসীমায় আবার কখনো বা আরেক প্রান্তিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। ভারসাম্যমূলক কোন জীবন দর্শনের তারা সন্ধান পায়নি। সামন্তবাদ যখন অত্যাচারের প্রান্তসীমায় গিয়ে পৌঁছে, তখন চারদিকে তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ধূমায়ীত হয়ে উঠে। অবশেষে এই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ পুঁজিবাদের রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। অতপর পুঁজিবাদ যখন শিল্প বিপ্লবের পর অত্যাচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌছে, তখন পাশ্চাত্য সমাজপতিরা শোক-দুঃখের একমাত্র চিকিৎসা মনে করে সমাজতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদের আরেক প্রান্তে গিয়ে উপনীত হয়। অতপর এসব দোষ-ত্রুটিও যখন কমিউনিষ্ট দেশসমূহে নিজেদের নগ্নরূপ প্রকাশ করলো, তখন দেখা গেলো যে, উভয় ব্যবস্থাতেই এক অত্যাচারের চিকিৎসা আরেকটি নিকৃষ্টতম অত্যাচারের দ্বারাই করা হয়েছে। এবার পাশ্চাত্যবাসী কিছু আপোষমূলক পন্থা উদ্ভাবন শুরু করে। কিন্তু কোন আপোষই ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়নি। বিভিন্ন দেশে এই আপোষের যেসব পদ্ধতি আবিষ্কার করা হয়েছে, তাতে মূল সমস্যার সমাধান তো হয়নি, বরং এ পন্থা আরো অগণিত নতুন সমস্যা ও অনাচারের জন্ম দিয়েছে।

এই মুহূর্তে আপনার প্রশ্নের জবাবে আমার পক্ষে এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু বলা সম্ভব নয়। আমি পাঠকদের পরামর্শ দেব, তারা আমার বইখানি ভাল করে পড়ে নিন। এখানে সংক্ষেপে আমি যা বলতে পারি, তাহলো এই যে, আমরা কেন নিজেদেরকে পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের ন্যায় ভাসমান তৃণখন্ডের মতো মনে করে নিয়েছি, যারা গত কয়েক শো' বছর পর্যন্ত আল্লাহ ও রাসূলের হিদায়াত থেকে বঞ্চিত থেকে এক প্রান্তিক থেকে আরেক প্রান্তিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। আমাদের কাছে আল্লাহর মেহেরবাণীতে নির্ভুল হিদায়াত মওজুদ রয়েছে, আমরা কেন পাশ্চাত্যের ধ্বংসকরী জাতিসমূহের ইতিহাস নিজেদের মধ্যে পুনরাবৃত্তি করতে যাচ্ছি?

এই সঠিক ও নির্ভুল পথ থেকে বঞ্চিত হয়ে আমরা যেসব আকর্ষণীয় শ্লোগানের দিক ধাবিত হয়েছি, তন্মধ্যে 'জমিনের মালিক চাষী' শ্লোগানটি অন্যতম। যদি বলা হয় যে, ঘরের মালিক মিস্ত্রী, খাদ্যের মালিক বাবুর্চি ও কাপড়ের মালিক দরজী, তাহলে এই কথাগুলোকে যেমনি অযৌক্তিক বলা হবে, তেমনি অযৌক্তিক এই আকর্ষণীয় শ্লোগানটা। আসল কথা হচ্ছে, সব জিনিসেরই অন্তত একটা সীমা থাকা দরকার, যেখানে দাঁড়িয়ে অন্তত আমরা এতোদূর চিন্তা করতে পারবো যে, আমরা যা বলছি, তা কতদূর সঠিক? চাষী যদি সত্যিকারভাবেই জমির মালিক হয় এবং নিজের যমীনেই সে চাষবাস করে, তবে নিশ্চয়ই জমি তার। কিন্তু যদি অন্যের জমি সে শ্রমের বিনিময়ে অথবা অন্য কোন চুক্তিতে চাষবাস করে, তবে কি চাষ করার কারণেই সে ব্যক্তি জমির মালিক হয়ে যাবে? যদি এই ভিত্তিতেই একজন লোক জমির মালিক হতে পারে, তবে কোন্ যুক্তিসংগত কারণে মিস্ত্রি বা ঘর-নির্মাতা

ঘরের মালিক হবে না? সে ব্যক্তিও তো অপরের জায়গায় অপরের টাকায় নিজের শ্রমের বিনিময়ে ঘর উঠিয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে একজন চাষীর কাছে এই শ্লোগানটা খুবই মধুর মনে হতে পারে। কিন্তু চাষীর যদি সামান্য বুদ্ধি-জ্ঞানও থাকে এবং মুহূর্তের জন্যেও এই শ্লোগানের সারবত্তা নিয়ে চিন্তা করে, তখন সে বুঝতে পারবে যে, এর পেছনে কত বিরাট রকমের প্রতারণা লুকিয়ে আছে। আগামীকাল সে যখন মরে যাবে এবং তার অসহায় এতীম শিশুরা বেঁচে থাকবে অথবা সে নিজেই অক্ষম, বৃদ্ধ ও অসুস্থ হয়ে পড়বে, যার ফলে নিজের যমীনে চাষবাস করার মতো তার কাছে আর যোগ্যতা থাকবে না, তখন তার অসহায় সন্তানরা আর তার পরিত্যক্ত যমীনের মালিক থাকতে পারবে না। কারণ তারা তো আর জমিতে চাষ করতে পারবে না। অতপর যে ব্যক্তি এসে এই যমীনে চাষবাস করবে, সেই তার মালিক হয়ে যাবে। শ্লোগানের ভেতরের এই প্রতারণা যখন কোন চাষী ভাই বুঝতে পারবে, তখন সে কান ধরে এ ধরনের শ্লোগান থেকে তওবা করবে।

প্রশ্ন ৫ : জমির মালিকানার ইসলামী সংজ্ঞা কি?

ক) বড় বড় জমিদারীগুলো কি ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ?

খ) জমির মালিকানা কি তার জন্যে নয়, যে ব্যক্তি তা চাষ করবে? যেমন ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী থেকে বর্ণিত হয়েছে?

গ) সরকারের দুর্নীতি, আইনের মারপ্যাচ ও অবৈধ টাকায় হাছিল করা জায়গা-জমি সম্পর্কে ইসলামের অভিমত কি? হাজার হাজার চাষীর চাষবাস করার পরও জমিকে জোর জবরদস্তি এক ব্যক্তি অথবা একটি পরিবারের হাতে তুলে দেয়ার এই ব্যবস্থাকে কিভাবে বৈধ মনে করা যেতে পারে? এ ধরনের মালিকানার পেছনে কোন শরয়ী ও নৈতিক কারণ রয়েছে কি?

উত্তর : জমির মালিকানার ইসলামী সংজ্ঞার বিস্তারিত আলোচনা আমি আমার রচিত 'ভূমি মালিকানার সমস্যা' বইতে করেছি। মালিকানার যেসব ধরনকে ইসলামী শরীয়ত হালাল করে দিয়েছে, তার যে কোন একটি পাওয়া গেলেই সে মালিকানা বৈধ বলে পরিগণিত হবে। শরীয়ত নির্ধারিত এ ধরনগুলো ছাড়া অন্য কোন উপায় অর্জিত মালিকানা ইসলামের দৃষ্টিতে অবৈধ। 'জমির আদৌ কোন ব্যক্তিগত মালিকানা নেই'-একথার সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। যারা এ খোঁড়া যুক্তি প্রমাণ করার জন্যে

কুরআনের—'আল আরদু লিল্লাহ' আয়াতটিকে পেশ করে থাকেন, তারা প্রথমত পুরো আয়াতটা পড়ে দেখেননি। আলোচ্য আয়াতটিতে বলা হয়েছে : 'জমি আল্লাহর' তিনি যাকে চান তাকে এর উত্তরাধিকারী বানান (আরাফ, আয়াত : ১২৮)। দ্বিতীয়ত তারা একথা চিন্তাও করে দেখেননি যে, যদি তাদের কথানুযায়ী ব্যক্তি–মালিকানার উচ্ছেদের জন্যেই এ আয়াতটি নাযিল হয়ে থাকে তবে এর দ্বারা তো রাষ্ট্রীয় মালিকানাও অবৈধ হয়ে যায়। দুনিয়ার কোন যুক্তিবিদ্যাই একথা প্রমাণ করাতে পারবে না যে, 'জমি আল্লাহ'র—একথা থেকে জমির মালিক এক ব্যক্তি তো হতে পারে না, কিন্তু একটি সমাজ সামষ্টিকভাবে এর মালিক হতে পারে।

ক) জমিদারী বড় না ছোট, এ দৃষ্টিতে ইসলাম তার বৈধতা বিচার করে না। ইসলামের বিচার্য হচ্ছে, মালিকানাটা কিভাবে অর্জন করা হয়েছে। বৈধ উপায়ে হাসিল করা মালিকানা ও অবৈধ উপায়ে অর্জিত মালিকানার ধরন কখনো এক হতে পারে না। অতপর বৈধ জমিদারীর ব্যাপারটাকে ইসলাম এভাবে চিন্তা করে যে, (জমিদারী বড় হোক কি ছোট) মালিক তার ব্যবস্থাপনা কিভাবে আঞ্জাম দেয়। যদি জমিদার শরীয়তের বিধিসম্মত উপায়েই তা ব্যবহার করে, তবে তা ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয। আর যদি শরীয়তের বিধি বহির্ভূত উপায়ে তা করা হয়, তবে কিছুতেই তাকে বৈধ বলে গ্রহণ করা যাবে না, বরং তা শাস্তির যোগ্য বলেই বিবেচিত হবে এবং জুলুমের মাত্রানুসারে তার ওপর বিভিন্ন ধরনের বিধি–নিষেধ আরোপিত হবে।

খ) জমির মালিকানা তার, যে ব্যক্তি তা চাষ করে, এই মত ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের মধ্যে কেউই সমর্থন করেননি, না কুরআন হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফেয়ীর প্রতি যদি কেউ এ ধরনের কথা আরোপ করে, তবে বলতে হবে যে, নিশ্চয়ই সে সত্য কথা বলছে না। এমন কি বর্গাতে চাষ করলেও তো যমীনের মালিক হওয়া যায় না। এই প্রসংগে অবশ্য মনে রাখা দরকার, ইমাম আবু হানিফা বর্গাতে জমি চাষকে নিষেধ করেননি, তাতে শুধু এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, জমির মালিককে জমির সাথে বীজ, হাল এবং চাষের উপায়–উপকরণও সরবরাহ করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ কিন্তু কোন শর্ত আরোপ করেননি। তাদের মতই এ ক্ষেত্রে হানাফী মাজহাবের চূড়ান্ত ও সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। ইমাম শাফেয়ী বলেন যে, এক ব্যক্তির জমিতে আরেক ব্যক্তির চাষের বৈধ উপায় দু'টি, এর যে কোন একটাকেই চাষী গ্রহণ করতে পারে। প্রথম উপায় হচ্ছে, জমির মালিক চাষীর কাছ থেকে তার শ্রমকে কোন

কিছুর বিনিময়ে গ্রহণ করবে। এমতাবস্থায় ফসল মালিকেরই হবে। দ্বিতীয় উপায় হল, চাষী একটি নির্দিষ্ট বিনিময়ের দ্বারা জমির মালিক থেকে জমি নিয়ে তা চাষ করবে (এটাকে ঠিকাও বলা হয়)। এমতাবস্থায় ফসলের মালিক চাষীই হবে। এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত বিবরণ প্রখ্যাত ফিক্হ গ্রন্থ 'আল-ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবায়াহ' (চার মাসহাবের ফিক্হ) বইতে আলোচনা করা হয়েছে।

গ) সরকারী দুর্নীতি, আইনের মারপ্যাচ ও অন্য কোন অবৈধ উপায়ে অর্জিত জায়গা-জমির মালিকানা মূলগতভাবেই কোন বৈধ মালিকানা নয়।

প্রশ্ন ৬ ঃ আজকের এই বিরাট বিরাট শিল্প-কারখানা ও মিল-ফ্যাক্টরীসমূহ, যেটা বর্তমান পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের কোটারি প্রিয়তা আইনের ওপর তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব ও ব্যাঙ্কসমূহের সুদী ব্যবস্থায় তাদের বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তিরই ফলশ্রুতি। এই শিল্প-কারখানা ও ফ্যাক্টরীসমূহ ইসলামের দৃষ্টিতে কতদূর বৈধ? এদের এই ব্যক্তিগত মালিকানাকে কি ইসলামের দৃষ্টিতে জায়েয মনে করা যেতে পারে? বিশেষ করে এটা যেহেতু ইতিহাসে সাক্ষ্য রয়েছে যে, এদের দ্বারা অনেক সময় ধর্মীয় স্থায়ীত্বের বিলোপ সাধন এবং দেশের সাধারণ মানুষের বিরাট ক্ষতি সাধিতও হয়েছে, বরং বলা যায়, এটা বর্তমান সমাজের ধর্মোদ্রোহিতার একটা কারণে পরিণত হয়ে গেছে।

উত্তর ঃ আজকের পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা, ভ্রান্ত আইন-কানুন এবং ত্রুটিপূর্ণ প্রশাসন ব্যবস্থার ফলে শিল্প-কারখানা ও ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সম্পদের উপায়-উপকরণ যেভাবে দিন দিন একটি বিশেষ শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে যাচ্ছে—ইসলামী শরীয়তে এটা সম্পূর্ণ অবৈধ। ইসলামী সমাজব্যবস্থায় সম্পদের এই কেন্দ্রীভূতীকরণ অব্যাহত রাখা হবে, না একে বিলুপ্ত করে দেয়া হবে—আসলে এটা তেমন কোন সমস্যাই নয়।

আসল সমস্যা হচ্ছে, এটা নির্মূল করার উপায় নিয়ে। যদি এর উপায় হিসেবে এটাই চিন্তা করা হয় যে, এদের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সরকারী তহবিলে দিয়ে দিতে হবে, তা হবে ছোট ছোট রোগের চিকিৎসার নিমিত্ত আরেকটি বড় রোগের কবলে পতিত হওয়া। আর দ্বিতীয় আরেকটি উপায় হচ্ছে এই, যেসব পথে সম্পদের কেন্দ্রায়ন সম্ভব হয়েছে—তেমন সব পন্থাকে আগামীতে আইনত নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। পূর্ব থেকেই যেসব স্থানে সম্পদ পুঞ্জিভূত হয়ে আছে, তাকে আস্তে আস্তে বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে এই কেন্দ্রীভূত সম্পদকে সমাজের বৃহত্তর অংশে ছড়িয়ে দিতে হবে। এর জন্যে এর

এমন সব বিধি প্রণয়ন করতে হবে, যার সাথে ইসলামী শরীয়তের কোন বিরোধ থাকবে না, আবার তাতে রোগীর স্বাস্থ্যকে উপেক্ষা করে এক রোগের চিকিৎসা আরেকটি বৃহৎ রোগের দ্বারাও করা হবে না।

জামায়াতে ইসলামী তার প্রকাশিত অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে এই দ্বিতীয় উপায়েরই কতোগুলো মূলনীতি পেশ করেছে। একে কি করে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার সাথে প্রয়োগ করা হবে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত একটা কর্মসূচী আমরা ইনশাআল্লাহ পেশ করবো। যাতে করে সমাজের অবাধ অর্থনীতি চালু রেখেও রোগের সঠিক চিকিৎসা সম্ভব হবে। ঠিক একথাটিই ক'দিন আগে একটি সংবাদ পত্রের প্রতিনিধিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলাম যে, ইসলামের অস্ত্র ডাক্তারের অস্ত্রের ন্যায়, এটাকে রোগীর চিকিৎসার জন্যেই প্রয়োগ করা হয়। যদি এই অস্ত্রোপচারে পুঁজিপতিরা অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন, তবে নিশ্চয়ই তাদেরকে ডাকাতের খঞ্জর বা খড়গাঘাতের জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। মোটকথা, তাদেরকে এ দু'টোর মধ্যে একটাকে অবশ্যই বাছাই করতে হবে।

প্রশ্ন ৭ ঃ ইসলামে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমানা কতদূর?

উত্তর ঃ ইসলাম ব্যক্তিগত মালিকানার কোন সীমা-সরহদ ঠিক করে দেয়নি। বরং সে মালিকানার ক্ষেত্রে বৈধ ও অবৈধ পন্থা বাতলিয়ে দিয়েছে ; ইসলাম বলে হালাল উপায়ে মানুষ যতটুকুই সম্পদ অর্জন করতে পারে, তা হবে একান্তভাবে তার প্রতি আল্লাহরই দান। আর আল্লাহ যাকে যতদূর চান এই দানে ভূষিত করেন। —হারাম কোন উপায়ে সম্পদ অর্জন করা অন্যায় ও জঘণ্য অপরাধ। এ ধরনের অপরাধের মাত্রানুসারে শাস্তিরও বিধান ইসলাম ঠিক করে দিয়েছে। অবৈধ মালিকানা তা যতোই ছোট হোক, ইসলামী শরীয়তে হারাম, আবার বৈধ মালিকানা তা যতো বড়ই হোক—ইসলামে হালাল। উপার্জনের মতো ব্যয়-ব্যবহারের পন্থাও ইসলাম নিজেই ঠিক করে দিয়েছে। মালিকানা ছোট না বড়, এটা ইসলামের দৃষ্টিতে আসল কথা নয়, মালিকানার বৈধ ও অবৈধতার বিষয়টি হচ্ছে ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সম্পদের ব্যয়-ব্যবহারের যাবতীয় অবৈধ উপায়কে ইসলামে হারাম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। উপরন্তু অবৈধ পথে ব্যয়ের জন্যেও শাস্তির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়েছে। এভাবেই ব্যয়ের বিভিন্ন খাতও নির্ধারণ করে দিয়েছে। এর মধ্যে এমন কিছু খাত আছে, যাকে অবশ্য করণীয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন যাকাত, (সম্পদের শতকরা ২.৫ ভাগ) আবার কিছু খাত রয়েছে, যার জন্যে ব্যক্তিকে উৎসাহ দেয়া হয়েছে, যেন ব্যক্তি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

হয়েই নিজের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় বের করে নিতে পারে এবং সমাজে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের পরিবর্তে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির সম্পর্ক কায়েম হতে পারে।

প্রশ্ন ৮ ঃ এই সীমা বহির্ভূত মালিকানায় কি রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করতে পারে?

উত্তর ঃ ৭নং জবাব নিয়ে একটু চিন্তা করলেই একথাটি পরিষ্কার হয়ে যাবে, অবৈধ মালিকানা অথবা বৈধ মালিকানার অবৈধ ব্যবহারের ব্যাপারে ইসলামী শরীয়ত যেসব বিধি প্রণয়ন করেছে, তন্মধ্যে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণেরও অবকাশ রয়েছে। এই প্রসংগে মনে রাখা দরকার যে, ইসলামে একটি ন্যায়ানুগ সরকারের মূল পরিচালক হচ্ছে 'মাজলিসে শূরা'। আর এই শুরাকে রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে সবসময়ই জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। জনগণের ওপর বিভিন্ন ধরনের ট্যাক্স ধার্য করার অধিকারও রাষ্ট্রের রয়েছে। এ ক্ষেত্রে কুরআন থেকে আমরা দু'টো মূলনীতি পেতে পারি। প্রথম কথা হচ্ছে, এই অর্থ-সম্পদ যাতে কেবল ধনীদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত না হয়। দ্বিতীয়ত এই ট্যাক্স عفو বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের উপরই ধার্য করতে হবে। এ দু'টো মূলনীতিকে সামনে রেখে ন্যায় ও ইনসাফের ভিত্তিতে এমনভাবে ট্যাক্স ধার্য করা উচিত, যাতে করে যার কাছে যতো বেশী অতিরিক্ত সম্পদ রয়েছে, সে ততো বেশী সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্যে তা ব্যয় করতে পারে। কিন্তু একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, হালাল উপায়ে সম্পদ অর্জনে উৎসাহই যেন মানুষের লোপ পেয়ে না যায়। আমি ইসলামী জীবন বিধান সম্পর্কে যতদূর পড়াশোনা করেছি, তাতে আমি কোথাও একথা পাইনি যে, মালিকানার (বৈধতা-অবৈধতা বিচার না করে) একটা সীমা নির্ধারণ করে দিতে হবে এবং তার সীমা ছাড়িয়ে গেলেই রাষ্ট্র তার ওপর এমনিই হস্তক্ষেপ করে বসবে।

প্রশ্ন ৯ ঃ আপনি কি একথা মনে করেন যে, রাজনীতির যাবতীয় ভুল-ভ্রান্তি ও চিন্তার দ্বন্দ্বের বড় একটা কারণ এই যে, ইউরোপের আধুনিক পরিভাষাগুলোর সাথে ইসলামের প্রাচীন পরিভাষাগুলোর কোন মিল নেই? উভয় পরিভাষার মধ্যে এই দূরত্বটা শুধু এজন্যই সৃষ্টি হয়েছে যে, ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের কাছে ব্যক্তিগত মালিকানার সংজ্ঞা দু'টো পৃথক পৃথক সময়েই সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণেই পরবর্তী সময়ে উভয় পরিভাষা একটা পারস্পরিক সংঘর্ষেরও রূপ নিয়েছে। নতুবা অর্থনীতি সম্পর্কে তো বলা যায় যে, ইসলামের সমষ্টি চেতনাও তো এক ধরনের সাম্যবাদ। আল্লাহ ও রসূলের প্রতি

বিশ্বাস অর্থনীতিকে যাবতীয় ক্ষতিকর দিকগুলো দূর করতে সাহায্য করে এবং এর ভাল অংশটাকেই শুধু জিইয়ে রাখে।

উত্তর ঃ যে রাজনৈতিক ভুল–ভ্রান্তি ও চিন্তার দ্বন্দ্বের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন, তার মূল কারণ এটা নয় যে, ইউরোপের আধুনিক পরিভাষা ও ইসলামের প্রাচীন পরিভাষাগুলোর মধ্যে একটা দূরতম সম্পর্ক বিরাজ করছে। আর এটাও কোন কারণ নয় যে, ইসলাম ও সমাজতন্ত্রের কাছে ব্যক্তিগত মালিকানা সংক্রান্ত ধারণা দু'টো আলাদা সময়ের সৃষ্টি। আসল কথা হচ্ছে, ইসলামের বিশ্ব–দর্শন ও জীবন–দর্শন সমাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। চিন্তার ক্ষেত্রে এ বৈপরিত্যের কারণে আকীদা–বিশ্বাস থেকে শুরু করে, সভ্যতা ও সমাজ জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি দিকেও উভয়ের গতি ও মনযিল সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ধাবিত হয়েছে। এরপর আসুন রাজনৈতিক ভুল–ভ্রান্তির কথা আলোচনা করা যাক। এ ধরনের কোন ভুল–ভ্রান্তি কখনো ইসলামের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এর জন্যে দায়ী তো স্বয়ং সমাজতন্ত্রীরা। এরা যেসব দার্শনিক তত্ত্ব ও পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে, তা মূলগতভাবেই ইসলামের পরীপন্থী, কিন্তু তা সত্ত্বেও নানান গোঁজামিল দিয়ে এই অনৈসলামী ব্যবস্থাটাকে ইসলামী করার অপচেষ্টা করা হচ্ছে।

একথা বলা মোটেই ঠিক নয় যে, অর্থনীতি সম্পর্কে যতদূর বলা যায় ইসলামের সমষ্টি–চেতনাও এক ধরনের সাম্যবাদ, এতে আল্লাহ–রাসূলের প্রতি বিশ্বাস অর্থনীতিকে তার ক্ষতিকর দিকগুলো থেকে দূরে রাখতে সাহায্য করে এবং শুধু এর ভাল অংশটাকেই জিইয়ে রাখে। চিন্তার ক্ষেত্রে যেসব ভুলের প্রতি একটু আগেই আমি ইংগিত করেছি, এটাও তার মধ্যে একটি। অর্থনীতিতে ইসলামের সামাজিক লক্ষ্য হচ্ছে এই যে, ব্যক্তিকে বৈধ সীমানার ভেতর যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা দিতে হবে। অপরদিকে শিক্ষা–দীক্ষার মাধ্যমে তাকে একজন ভাল ও সৎ মানুষ হিসেবেই গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সে আল্লাহ ও আল্লাহর সৃষ্টিকুলের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করতে পারে। এ ধরনের সমাজে আইনের নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষাকৃত কমই ব্যবহৃত হয়। আমি জানতে চাই যে, এটা কোন্ ধরনের সাম্যবাদ। সাম্যবাদ শব্দটি আজ আর আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয় না। এটি একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিভাষা। বিশেষ একটি ব্যবস্থার জন্যে একে ব্যবহার করা হয়। এই ব্যবস্থার সামষ্টিক কাঠামোটাই ইসলামী ধ্যান–ধারণার সম্পূর্ণ খেলাফ। সাম্যবাদ হচ্ছে, সমাজের সমস্ত কল্যাণকর কাজ সমাজ নামক যন্ত্রটিই আঞ্জাম দেবে এবং এ ব্যাপারে কোন ব্যক্তির ওপর এতটুকুও বিশ্বাস স্থাপন করা যাবে না।

যে, ব্যক্তি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোন ভাল কাজ করবে। আর করতে পারলেও আইনত তাকে এ কাজের কোন অধিকারই দেয়া হবে না। এ গোটা ব্যবস্থার সাথে মিছেমিছি আল্লাহ, রাসূলের একটা সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে একে মুসলমান বানাবার এতো প্রয়োজনটাই বা কেন দেখা দিলো?

ইসলাম নিজেই একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। এই বিধান ব্যষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে একটা ভারসাম্য ও ন্যায়ানুগ ব্যবস্থা ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে। ইসলাম প্রতিটি ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে ভাল মানুষ রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করে, যাতে করে ব্যক্তি সমাজের একটা ভাল অংশ (Part) হিসেবে কাজ করতে পারে। অপরদিকে সমাজকেও একটি কল্যাণমূলক সমাজ হিসেবে তৈরী করে নেয়, যাতে তার মধ্যে অবস্থান করে ব্যক্তি তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে। এই পুরো অবস্থাটাকে এক ধরনের সাম্যবাদ মনে করা, এর প্রতি একটা প্রকাশ্য অপবাদ। সাম্যবাদে যদি অহেতুক আল্লাহ-রাসূলের অস্তিত্বকে ঢুকিয়ে দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়, তাহলে হয়তো আগামীকাল মার্কসীয় দর্শনের একটা 'কুরআনী সংস্করণ' তৈরী করতে হবে। গত কিছুদিন যাবত অবশ্য আমাদের দেশে জনৈক ভদ্র লোক 'খোদায়ী বিধান' নামক একটি চমৎকার নাম দিয়ে এক এলোপাতাড়ি মতবাদ প্রচার করার অপপ্রয়াস শুরু করেছেন। *

প্রশ্ন ১০ : 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' পরিভাষাটিতে আপনি কি কি দোষ-ত্রুটি দেখতে পান? আজকাল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমরা তো ইউরোপীয় পরিভাষাই ব্যবহার করে থাকি এবং তা দ্বারা রীতিমত উপকৃতও হই।

উত্তর : নতুন পরিভাষা ব্যবহার করার সময় আমাদেরকে অবশ্যই এই মূলনীতি খেয়াল রাখতে হবে, কোন্ পরিভাষাটি মৌলিক ব্যাখ্যার দিক থেকে ইসলামী শিক্ষা মোতাবেক শুদ্ধ আর কোন্‌টি অশুদ্ধ। শুদ্ধ পরিভাষা আমরা অনায়াসেই ব্যবহার করতে পারি। কিন্তু যে পরিভাষাগুলো আমাদের দৃষ্টিতে ভুল, তা অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। আবার কিছু পরিভাষা এমনও আছে, যেগুলোকে একভাবে বললে তা শুদ্ধ হয়, আবার তাকেই অন্যভাবে ব্যবহার করলে অশুদ্ধ হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিভাষাগুলো ব্যবহার করার সময়

* এই ভদ্রলোক হচ্ছেন—গোলাম আহমদ পারভেজ, তিনি ও তার দল হাদীসের নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততাকে মানতে রাজী নন। নামায, রোযা ও অন্যান্য ধর্মীয় বিধি-বিধানের ব্যাপারেও তারা নতুন নতুন দর্শন আবিষ্কার করেন। এদের সম্পর্কে আরো জানতে হলে পড়ুন, মাওলানা মওদূদীর—'সুন্নাত কি আইনী হায়সিয়াত বা সুন্নাহর আইনগত মর্যাদা।'-অনুবাদক

অবশ্যই তার সাথে আমাদেরকে 'ইসলামী' শব্দটি যোগ করতে হবে। তাহলে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এই পরিভাষা দ্বারা আমরা তাই বুঝাতে চাচ্ছি, যা ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী নয়। ইউরোপীয় পরিভাষা ব্যবহার করার ব্যাপারে আমার একথাগুলো শুনার পর আপনি এমনিই বুঝতে পারবেন যে, আমরা কেন 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' পরিভাষাকে অশুদ্ধ এবং 'ইসলামী গণতন্ত্র' পরিভাষাকে শুদ্ধ মনে করি। সমাজতন্ত্র পরিভাষা হিসেবে একটি বিশেষ ব্যবস্থার নাম। ঈসায়ী মতবাদ ও বৃদ্ধ মতবাদের মতো আকিদা-বিশ্বাসের দিক থেকে এটা একটা ধর্মের মতোই। এর সাথে 'ইসলামী' শব্দটি যোগ করে ইসলামী সমাজতন্ত্র কথাটি বলা এক মারাত্মক রকমের ভুল, যেমনি ভুল ঈসায়ী মতবাদ ও বৃদ্ধ মতবাদের সাথে ইসলামী কথাটি যোগ করে 'ইসলামী ঈসায়ী ধর্ম' বা 'ইসলামী বৃদ্ধ ধর্ম'।

গণতন্ত্র কিন্তু ঠিক এর উল্টো। গণতন্ত্রের অর্থ যখন এই হবে যে, রাষ্ট্র জনগণের মর্জি অনুসারেই পরিচালিত হবে, আবার জনগণের মর্জি মোতাবেকই তার পরিবর্তন হবে, তাহলে এ ধারণা ইসলামের সাথে সংগতিপূর্ণ। কিন্তু এই গণতন্ত্রের মানে যখন এই হবে যে, জনগণ ইচ্ছা করলে কোন কিছুকে হালাল বা হারাম করতে পারবে—আল্লাহ-রাসূলের হেদায়াতের মুখাপেক্ষী হবে না—তখন এই সংজ্ঞাটি হবে ইসলামের দৃষ্টিতে এক মারাত্মক ভুল। এ পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করার জন্যেই আমরা পাশ্চাত্য গণতন্ত্র না বলে ইসলামী গণতন্ত্র বলতে পারি। তখন এতে কোন আপত্তির কারণ থাকে না। কারণ ইসলামী গণতন্ত্র বললে বুঝা যাবে যে, আমরা গণতন্ত্রের সে অর্থই বুঝিয়ে থাকি, যার সাথে ইসলামের সংগতি রয়েছে।

প্রশ্ন ১১ ঃ এই পরিভাষা বলার সাথে সাথে মানুষের মনে পুঁজিবাদের যাবতীয় শোষণ থেকে মুক্তিলাভের একটা ধারণা জেগে উঠে। তাই, এই পরিভাষাটিকে ব্যবহার করতে অসুবিধে কি?

উত্তর ঃ পূর্বের প্রশ্নের জবাবে আমি একথাটাও পরিষ্কার করে বলেছি যে, 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' পরিভাষাটিকে ব্যবহার করতে কি অসুবিধে রয়েছে। সমাজতন্ত্র শুধু পুঁজিবাদী শোষণের বিলুপ্তির নামই নয়, সাথে সাথে একটি বাস্তব কর্মসূচীও (Positive Programme) বটে। একটা ব্যবস্থাকে অস্বীকার করার সাথে সাথে এটি এক নতুন ব্যবস্থাও পেশ করে। এর এ নেতিবাচক অংশকে ইতিবাচক অংশ থেকে আলাদা করে কল্পনাই করা যায় না। এজন্যেই আমাদের কথা হলো এই যে, যখনি আমরা ইসলামী সমাজতন্ত্র কথাটি বলি, তখন পুঁজিবাদ শোষণের বিলুপ্তির চিন্তার সাথে সমাজতন্তের

বাস্তব চেহারাও আমাদের মনের পর্দায় ভেসে উঠে। বড়ো জোর সমাজতন্ত্রের সাথে 'ইসলামী' শব্দটি যোগ করে দেয়ার ফলে এটা বুঝা যায় যে, সমাজতন্ত্রের বিচিত্র চিন্তার (School of thaught) মধ্যে এটা অন্যতম। সমাজতন্ত্র থেকে কিছু অংশ নিয়ে ইসলামের এক নতুন সংস্করণ তৈরী করা হয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, এই নতুন মতবাদে যে অংশটাকে সমাজতন্ত্র থেকে নেয়া হলো, তার ধরনটা কি? যদি তার ধরন এই হয় যে, ইসলামে এমন কিছুর অভাব ছিলো, যা দূর করার জন্যে সমাজতন্ত্র থেকে এই অংশটি নেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এই যদি হয়, তবে এ ধরনের ইসলামকে মানার কোনই যুক্তি নেই, যাকে আমরা পূর্ব থেকেই অসম্পূর্ণ ও দোষ-ত্রুটিযুক্ত মনে করি। আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাসের সাথে সাম্যবাদী নিয়ম-নীতি গ্রহণ করে যারা উভয়টার মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করতে চান, তাদের উচিত মুসলিম সমাজভুক্ত থেকে মুসলমানদের প্রতারিত না করা। বরং অন্যদের মতো নতুন একটি ধর্মমত সৃষ্টি করে দুনিয়ার মানুষকে তার দিকে আহ্বান করা। কিন্তু তারা যদি একথা আন্তরিকভাবেই মনে করেন যে, তারা যা করবেন, তাকে অবশ্যই কুরআন-হাদীস থেকে প্রামাণিত হতে হবে, তাহলে তাদের কাছে আমার প্রশ্ন হচ্ছে—অযথা সমাজতন্ত্রের প্রতি ধাবিত হবার প্রয়োজনটাই বা কি? কুরআন-সুন্নাহ মুতাবিক যা, তা তো ইসলামই। ইসলাম কি এতোই অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়েছে যে, এর উন্নতি অগ্রগতি অন্য কোন মতবাদের আশ্রয় ছাড়া সম্ভব নয়?

প্রশ্ন ১২ ঃ আপনি কি সমাজতন্ত্রকে বেশী মারাত্মক মনে করেন, না এর নেতাদের?

উত্তর ঃ আমি এর উভয়টাকেই মারাত্মক বলে মনে করি। আমার জন্যে এটা বলা মুশকিল যে, উভয়ের মধ্যে কোনটা বেশী ক্ষতিকর। আসল কথা হচ্ছে, সমাজতন্ত্র জিনিসটাই মারাত্মক। তাই এর পরিচালনার দায়িত্ব তাদের ওপরই অর্পিত হবে, যারা নিজেরাও হবে মারাত্মক। অতপর একটা মারাত্মক চিন্তাধারা যখন কিছু মারাত্মক প্রকৃতির লোকের হাতে গিয়ে পড়ে, তখন তারা একে অপরকে আরো বেশী মারাত্মক করে তুলে। এখন এটা বলা মুশকিল যে, কে কাকে মারাত্মক বানাচ্ছে। তবে একথাটা একটু ভাল করে বুঝে নিন যে, যদি কোন মতবাদ পূত-পবিত্র হয়, তবে খারাপ চরিত্রের লোকদের তা গ্রহণ না করে অন্য কো পথের দিকে তাদের ধাবিত হওয়া এবং তার জন্যে চেষ্টা-সাধনা করাটা একথারই প্রমাণ দেয় যে, এই মতবাদেরর প্রকৃতিতেই এমন কোন দোষ আছে, যার কারণে আল্লাহর নেক

বান্দারা তার থেকে দূরে সরে যায় এবং নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোকেরাই এর দিকে বেশী ধাবিত হয়। একথাটা আরো ভাল করে বুঝার জন্যে আপনি দু'টো ঘটনাকে পাশাপাশি রেখে চিন্তা করুন। ইসলামের আহবানকারী এবং প্রথম অবস্থায় তার অনুসারীরা কোন্ চরিত্রের লোক ছিলেন এবং সাম্যবাদের উদগাতা কার্লমার্কস ও তার অনুগামীরা কোন্ ধরনের চরিত্রের অধিকারী ছিলেন? যতদিন মানুষের কাছে মৌলিক মানবীয় গুণ বাকি থাকবে, ততদিন মানুষ এ উভয় ধরনের লোককে একই পর্যায়ে রেখে চিন্তা করতে পারবে না। যদি কেউ তা করে এবং মার্কস ও মার্কসবাদকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং তাঁর অনুসারীদের উপর প্রাধান্য দান করে, তবে মনে করতে হবে যে, নিশ্চয়ই সে কোন নিকৃষ্টতম চারিত্রিক অধপতনের রোগে ভূগছে।

প্রশ্ন ১৩ ঃ বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থার কোন্ ধারণা বা এর কোন্ অংশের সাথে আপনি একমত? যদি একমত হন তবে কোন্ বিষয়ের সাথে এবং তা কেন?

উত্তর ঃ বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজকে আমি একটা বিষফোড়া বলেই মনে করি, তাই এর কোন অংশ বা ধ্যান-ধারণার সাথে একমত হবার প্রশ্নই আসে না, বরং ঐকমত্যের পরিবর্তে আমার তো চিন্তা হচ্ছে, এর চিকিৎসা কিভাবে করা যায়? সেজন্যে আমি আগেও বলেছি—ডাকাতের অস্ত্র ব্যবহারের পরিবর্তে ডাক্তারের অস্ত্র প্রয়োগ করাটাকেই আমি অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি।

প্রশ্ন ১৪ ঃ আমরা মুসলমানরা আল্লাহ তায়ালাকে এই সৃষ্টির স্রষ্টা ও মালিক বলে মনে করি। দুনিয়ার সমস্ত মানুষ তাঁরই সৃষ্টি ও তারই পরিবার। একই পরিবারের সদস্য হিসেবে মানুষ যাবতীয় উৎপাদনের উপায়-উপকরণের সামষ্টিক মালিক হবে না কেন? অতপর যদি একথা অস্বীকার করা হয়, তবে কিভাবে তার থেকে আবার ব্যক্তিগত মালিকানার সংজ্ঞা খুঁজে বের করা হয়? এই মুসলিম সমাজতো আকীদা-বিশ্বাস ও ইবাদাত-অনুষ্ঠানে কোন দিনই মাহমুদ ও আয়াজের (আমীর ও গরীব) মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেনি। অথচ অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমাদের জীবন ধারণের উপায়ে—এই মতদ্বৈততা ও পার্থক্য সৃষ্টি করা কোন্ দৃষ্টিতে বৈধ হতে পারে?

উত্তর ঃ আমরা মুসলমানরা আল্লাহ তাআলাকে শুধু সৃষ্টিকর্তা ও মালিক বলেই মনে করি না, আমরা তাকে আমাদের বিধানদাতাও মনে করি। এবং বিধানদাতা হিসেবে আমরা এটা বিশ্বাস করি যে, আমাদের জন্যে তৈরী প্রতিটি

জিনিস-পত্রের (যার মধ্যে আমাদের দেহ ও দৈহিক শক্তি প্রতিভাও শামিল রয়েছে) ব্যবহারের নিয়ম-নীতিও তিনি ঠিক করে দিয়েছেন। আমাদের এও বিশ্বাস রয়েছে যে, তিনি তার যাবতীয় বিধি-বিধান, তার কিতাব ও রাসূলের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এই বিধান যদি আমাদের এই শিক্ষা দিতো যে, যাবতীয় উৎপাদন-উপকরণকে সমাজের সামষ্টিক মালিকানায় ছেড়ে দিতে হবে এবং কোন মালিকানাই ব্যক্তির হাতে থাকতে পারবে না, তাহলে মুসলমান হিসেবে তার অনুসরণ করা আমাদের জন্যে ফরয হতো।

স্বয়ং রাসূল ও খোলাফায়ে রাশেদীন যদি তাদের গোটা অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে সমাজের মালিকানায় চালিয়ে দেখিয়ে যেতেন, তাহলে তা পরবর্তী বংশধরদের জন্যে নির্দেশ হয়ে থাকতো। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ভাল করে কুরআন-হাদীস পাঠ করে, তবে সে দেখতে পাবে, তাতে সামষ্টিক মালিকানার এই সংজ্ঞা কোথাও নেই। রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সংগী-সাথীরা খোলাফায়ে রাশেদিনের এ ব্যবস্থা কায়েম করে দেখিয়ে যাননি, বরং কুরআন-হাদীসের পাতা উল্টালে তাতে [কিছু শর্তাবলীর নিয়ন্ত্রণে] একটি অবাধ অর্থনীতির ছবিই ফুটে উঠে। এই স্বাধীন অর্থনীতিতে উপায়-উৎপাদনকে ব্যক্তির মালিকানায় রেখে তার আয়-ব্যয়ে ইসলাম হারামের পার্থক্যকরণ, যাকাত, সদকা, উত্তরাধীকারী আইন ও অসিয়তের কতিপয় নিয়ম-নীতি ঠিক করে দিয়েছে। তদুপরি কুরআন হাদীসে ইবাদাত অনুষ্ঠান (যাতে যাকাত ও হজ্জও রয়েছে) নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ব্যবস্থাও পেশ করা হয়েছে। তাও ইসলামের উপস্থাপিত ব্যক্তিগত মালিকানার সাথেই বেশী খাপ খায়। ব্যক্তির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি কখনো অবাধ ও স্বাধীন অর্থনীতি ছাড়া সম্ভব নয়। তাছাড়া কোন রকম আইনের নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই ব্যক্তি মনের ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে আল্লাহর পথে, দ্বীনের পথে, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, দীন-দুঃখী ও সমাজের সামষ্টিক কল্যাণের জন্যে ব্যয় করবে। ব্যক্তির যদি ব্যক্তিগত মালিকানাই না থাকে, তবে কি করে এই গুণ ও সুযোগ সৃষ্টি হবে?

এর সাথে আমরা এও দেখতে পাই, একদিক রাসূল (সাঃ)-এর যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত সমস্ত ফিকাহবিদ ও তাফসীরকাররা এই ব্যক্তিগত মালিকানার কথাই বলে আসছেন। অপরদিকে সমষ্টিগত মালিকানার এই নতুন থিওরী পাশ্চাত্যের এমন কিছু লোকই পেশ করেছে, যারা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে শুধু আল্লাহ-রাসূলের পথনির্দেশ কামনা করেনি, তাই নয়, বরং তাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে। শুধু অস্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়নি,

আরো এক কদম অগ্রসর হয়ে বলেছে যে, এক শ্রেণীর লোকেরা হামেশাই পুঁজিবাদী শোষণের জন্যে আল্লাহ, রাসূল ও ওহীর একটা কল্পিত কাহিনী রচনা করেছে। যাতে করে গরীব জনসাধারণকে ধর্মের আফিম দ্বারা নেশাগ্রস্ত রেখে যে উৎপাদন ব্যবস্থা নিজেদের জন্যে উপকারী, তার পক্ষে ধর্মীয় সার্টিফিকেট প্রদান করে। এখন কোন জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক এটা কি করে বুঝতে পারে যে, কুরআনের মূল উদ্দেশ্য কেবল তারাই বুঝতে সক্ষম হয়েছে, আর নবীর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত পুরো মুসলিম মিল্লাতই কুরআনের এ মর্ম অনুধাবনে ব্যর্থ হয়েছে?

প্রশ্ন ১৫ : গোপনে ও প্রকাশ্যে পাকিস্তানে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করছে, এমন লোকের সংখ্যা কত হবে?

উত্তর : আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্যে প্রয়োজন হচ্ছে, এদের প্রকাশ্য কর্মীদের নামধাম গণনা করা এবং গোপন কেন্দ্রসমূহের খোঁজ নিয়ে আরও সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা। যেহেতু এর কোনটাই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই আন্দাজ-অনুমান ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আমি মনে করি, খাঁটি সমাজতন্ত্রী যারা পড়াশোনা করে এ দর্শনের ওপর ঈমান এনেছে, এমন লোকের সংখ্যা আটার মধ্যে লবণের মতোই নগণ্য। তবে এদের সাথে প্রায় চার প্রকারের লোকই সাধারণত ভীড় জমায়। প্রথম দল, যারা শুধু ফ্যাসনের জন্যেই নতুন শ্লোগানের পেছনে ছুটে থাকে। দ্বিতীয় দল, যারা শুধু এটুকুই বুঝে নিয়েছে যে, বর্তমান পুঁজিবাদী ও সামন্তবাদী শোষণ থেকে মুক্তিলাভের অব্যর্থ মহৌষধ হচ্ছে অর্থনৈতিক সাম্যের শ্লোগানধারী সমাজতন্ত্র। তৃতীয় দল হচ্ছে, যারা নিছক ইসলামের নৈতিক অনুশাসন থেকে মুক্তি লাভের জন্যেই সমাজতন্ত্রের কথা বলে। আর চতুর্থ হচ্ছে, শ্রমিক-কৃষকদের এমন একটি দল, যাদেরকে সমাজতন্ত্রীরা এই কল্পনার বেহেশত দেখিয়েছে যে, তাদের নেতৃত্বে ভাংগন-বিপর্যয়, ঘেরাও ও শক্তিপ্রয়োগ করতে পারলে তারা এসব কারখানা ও জমি-জমার মালিক হতে পারবে। কিন্তু এই হতভাগারা তো জানে না যে, এই কল্পনার বেহেশতই একদিন তাদের জন্য বাস্তবের নরকে পরিণত হবে। এ চারটি দলের মিলিত সংখ্যাও সমাজে একটি সামান্য অংশমাত্র। দেশের সাধারণ মুসলমানদের জীবনে যত ভাংগন ও অনাসৃষ্টিই দেখা দিক না কেন, তারা এখনো সেই ধর্মীয় মূল্যবোধের ওপর ঈমান রাখে—যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তাদের কাছে পাঠিয়েছেন। ব্যাপক ক্ষেত্রে এই সংখ্যা থেকে দেশের কৃষক ও শ্রমিকরাও বাইরে নয়।

প্রশ্ন ১৬ : একথা কি সত্য নয় যে, দেশের প্রচারযন্ত্র, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রকাশণা সংস্থার উপর এই আল্লাহদ্রোহী লোকদেরই অধিকাংশ কর্তৃত্ব

রয়েছে? এবং এরাই আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের চিন্তাজগতে মানসিক বিশৃংখলা ও ধর্মীয় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

উত্তর ঃ আপনার কথাগুলোর সাথে আমিও সম্পূর্ণ একমত। তবে আমি এর সাথে আরও একটি কথা বাড়িয়ে বলতে চাই যে, দেশের আল্লাহহীন শিক্ষা ব্যবস্থাও এই ধর্মীয় বিভ্রান্তিতে সাহায্য করছে।

প্রশ্ন ১৭ ঃ আপনি কি মনে করেন, এদের কেউ এসব কাজের জন্যে বিদেশ থেকে কোন সাহায্য পাচ্ছে?

উত্তর ঃ আমার কাছে এটা জানার কোন উপায় নেই যে, এরা কোন বিদেশী সাহায্য পাচ্ছে কি পাচ্ছে না। নির্ভরযোগ্য সূত্র ছাড়া কারো উপর কোন অপবাদ চাপিয়ে দিতে আমি অভ্যস্ত নই।

প্রশ্ন ১৮ ঃ জামায়াতে ইসলামী বিদেশ থেকে সাহায্য পেয়ে থাকে—এই অপবাদের রচয়িতা কে বা কারা — এর উৎসাহ প্রদানকারীই বা কারা? এর পটভূমিকা ও মূল রহস্য সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ অনেকদিন আগে থেকেই আমাদের ওপর এসব অভিযোগ আরোপ করা হচ্ছে। এর রচয়িতা ও উৎসাহদাতা কোন এক ব্যক্তি নন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মহল থেকেই এটা উঠানো হয়েছে। এই অপবাদ তারাই দিয়েছেন, যাদের কাছে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে আমাদের ২৯ বছরের প্রচেষ্টা অস্বস্তিকর মনে হয়েছে। তারা যে কোন মিথ্যা অভিযোগও পেশ করতে পারেন। কারণ, তাদের তো এই মাথাব্যাথা নেই যে, কারো উপর কোন মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে কোন মহান শক্তির কাছে তার জবাবদিহি করতে হবে। অথবা কোন শক্তিশালী খোদা রয়েছেন, যার কাছে নিজেদের কথা ও কাজের পুংখানুপুংখরূপে হিসেব দিতে হবে। তাদের জন্যে এটা প্রকাশ্যই হালাল যে, কোন ব্যক্তি বা দলের মর্যাদা খাটো করার জন্যে যে ধরনের কথাই ফলপ্রসূ মনে হবে—তা যতো মিথ্যাই হোক, নির্বিচারে বলে দিতে হবে। এবং অভিযোগ দেয়ার সময় এটা চিন্তা করারও দরকার নেই যে, এর কোন ভিত্তি রয়েছে কিনা?

আজ থেকে কয়েক বছর আগে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন প্রকাশ্যভাবে এ অভিযোগ উত্থাপন করেন, তখন ঢাকার এক জনসমাবেশে যে কয়টি কথা বলেছিলাম, তার কিছু উদ্ধৃতি এখানে পুনরুল্লেখ করাই আমার মনে হয় যথেষ্ট হবে। আমি সেদিন বলেছিলাম

"দেশের একজন দায়িত্বশীল উজিরের পক্ষে এটা নেহায়াত লজ্জাকর ব্যাপার যে, তিনি একটি দল বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে এ ধরনের কোন অভিযোগ

পেশ করবেন, অথচ এ ধরনের অভিযোগের পেছনে কোন ভিত্তি নেই। আমি সবার কাছে চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি, কারো কাছে যদি এর সামান্যতম প্রমাণও থাকে, তিনি তা জনসমক্ষে নিয়ে আসুন এবং তার ইচ্ছেমতো দেশের কোন একটি আদালতে তা পেশ করুন।"

একথা কয়টি আমি ১৯৬৩ সালের ২৪ নভেম্বর ঢাকার ঐতিহাসিক পল্টন ময়দানে বলেছিলাম। ঢাকা জামায়াতে ইসলামী এই বক্তৃতা পুস্তিকা আকারেও প্রকাশ করেছে। সেদিন আমি এই ভিত্তিতেই কথাগুলো বলেছিলাম যে, দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মতৎপরতা নিয়ন্ত্রণের জন্যে Political Parties Act—নামক একটি আইন বর্তমান রয়েছে। এ আইন সেদিনও ছিল। এ আইন অনুযায়ী কোন রাজনৈতিক দলই বিদেশী সাহায্যপুষ্ট হয়ে দেশে রাজনীতি করতে পারে না। আর আমি সেদিন এই চ্যালেঞ্জ স্বয়ং স্বরাষ্ট্র উজীরকে এজন্য দিয়েছিলাম যে, অভিযোগ প্রমাণ করার মতো ভিত্তি একমাত্র তার কাছেই সবচেয়ে বেশী থাকতে পারে। অতপর আমি বলেছিলাম,

"আমি মনে করি, এ অভিযোগ শুধু লজ্জাস্কর নয়, বরং বিদেশে আমাদের দেশের মর্যাদাকে খাটো করার পক্ষেও যথেষ্ট। দুনিয়ার অপরাপর জাতিসমূহ মনে করবে, পাকিস্তানীরা সবাই বুঝি কাঁচামাল। বাইরের লোকেরা ইচ্ছা করলে এর যে কোন ব্যক্তি বা দলকে খরিদ করে নিতে পারে। এটা কি কোন দেশের মর্যাদা খাটো করার জন্যে যথেষ্ট নয়? এর দ্বারা আপনি সারা দুনিয়ার মানুষকে এই বলে দাওয়াত দিচ্ছেন যে, আমাদের দেশে সবাই খরিদযোগ্য। সুতরাং আপনারা আসুন, যাকে ইচ্ছা হয়, খরিদ করুন। আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, বাইরের লোকেরা যদি আমাকে অথবা জামায়াতে ইসলামীকে খরিদ করতে পারে, তাহলে আপনারাও একবার খরিদ করে দেখান না। গত ষোল বছরে (৬৩ সালের হিসেব মতে) কেউ একথা বলতে পারেনি যে, আমাকে অথবা জামায়াতকে কেউ খরিদ করতে পেরেছে। এ দেশে বহু বিক্রয়যোগ্য মাল রয়েছে। দেশবাসী ভাল করেই জানে যে, কারা মহল বিশেষের হাতে বিক্রি হয়েছেন। আল্লাহর মেহেরবানীতে জামায়াতে ইসলামীকে আজ পর্যন্ত কেউ খরিদ করতে পারেনি। যদি জামায়াতকে বাইরের লোকেরা এসে খরিদ করে নিতে পারে, তবে ঘরের লোকেরাই একবার খরিদ করে দেখান না কেন?"*

---

* আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যারা এ অভিযোগ প্রণেতা ছিলেন, তারা নিজেরাই অবশেষে কোন দলিল প্রমাণ দিতে না পেরে তা প্রত্যাহার করেছেন। সুপ্রিম কোর্টে জামায়াতে ইসলামীর আপীল শুনানীর সময় সরকারের তরফ থেকে কৌশুলী জনাব মনজুর কাদের এই অভিযোগটি প্রত্যাহার করেন।—অনুবাদক

যা কিছু আমি সেদিন বলেছিলাম, তা আমি আজও বলছি। কিন্তু আপনি জানেন, যাদের কাছে আল্লাহ ও তার বান্দাদের সামনে দাঁড়াবার মতো লজ্জা-শরম নেই, তাদের মুখ কে বন্ধ করতে পারে?

প্রশ্ন ১৯ ঃ আমাদের দেশে এমন কিছু সংখ্যক নেতা রয়েছেন, যারা হিংসাত্মক পন্থা ছাড়াও যে কিছু করা সম্ভব, এটা বিশ্বাস করতেই রাজী নন। তারা প্রকাশ্যভাবেই হিংসাত্মক কার্যকলাপের উস্কানী দিয়ে যাচ্ছেন, গৃহযুদ্ধের হুমকি দিয়েও বেড়াচ্ছেন। আমরা কিভাবে তাদের এ জঘন্য কার্যকলাপ থেকে বাঁচতে পারি?

উত্তর ঃ আমরা শুধু একটি উপায়েই এদের থেকে বাঁচতে পারি, আর তা হচ্ছে এই যে, আমরা দেশে শিক্ষিত লোক ও সাধারণ লোকদের চিন্তাধারা পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করবো, এবং তাদের সামনে এটা পরিষ্কার করে তুলে ধরবো যে, ইসলাম ও অনৈসলামে কি কি পার্থক্য রয়েছে?

প্রশ্ন ২০ ঃ জামায়াতে ইসলামীর কি এই শক্তি আছে যে, সে এর প্রতিরোধ করতে পারে?

উত্তর ঃ জামায়াতে ইসলামী কখনো নিজের দলীয় শক্তির ওপর ভরসা করেনি। জামায়াত সবসময়ই আল্লাহ ও তাঁর দীনের শক্তির ওপরই বিশ্বাস ও ভরসা রাখে।

প্রশ্ন ২১ ঃ দেশের ইসলাম দরদী শক্তিসমূহের মধ্যে কি ঐক্যের কোন সম্ভাবনা আছে?

উত্তর ঃ শুধু সম্ভাবনাই নয়, এটাতো অপরিহার্য প্রয়োজন। এ নাজুক অবস্থায়ও যদি তারা একত্রিত না হন, তবে আর কখন হবেন?

প্রশ্ন ২২ ঃ ঐক্যের কোন সম্ভাবনা থাকলে তার ধরন কেমন হবে?

উত্তর ঃ ঐক্যের ধরন অনেক রকমই হতে পারে। প্রয়োজন দেখা দিলে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে এটা ঠিক করে নেয়া যাবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত হচ্ছে, এই দেশে যারাই ইসলামের প্রতিষ্ঠা কামনা করেন, তাদেরকে আন্তরিকতার সাথে শুধু ইসলামের প্রাধান্যের জন্যেই একত্রিত হতে হবে। আল্লাহ, রাসূল ও তাঁর দীনের খাতিরে দলীয় হিংসা-বিদ্বেষ মন থেকে দূরে সরিয়ে দিতে হবে।

প্রশ্ন ২৩ ঃ একথা কি সত্য নয় যে, পাকিস্তানে ইসলাম দরদী লোকদের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন একতা নেই। এই

একতা না থাকার কারণ কি? আপনি কি মনে করেন, এদের কাউকে অন্য কোন শক্তি ব্যবহার করছে? না কেবল এদের দৃষ্টি খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপরই পড়ে আছে—অথবা এর অন্য কোন কারণ রয়েছে?

উত্তর ঃ এই একতা না থাকার বহুবিধ কারণ রয়েছে। কিছু লোক এমন আছেন, যাদের দৃষ্টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের ওপরই নিবদ্ধ রয়েছে। কিছু লোক আবার আছেন, যারা পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের রোগে ভুগছেন। আর কিছু লোক এমনও আছেন, যারা ইসলামের নাম নিলেও ইসলামের ব্যাপারে তারা খুব বড় একটা আন্তরিকতার পরিচয় দিতে পারেন না। এরা ইসলামের সাথে অনৈসলামী কিছু অংশকেও জুড়ে দিতে চান। আবার এটাও চান না যে, এ সত্য প্রকাশিত হয়ে পড়ুক।

এরপর আপনার প্রশ্ন—এদের কোন দলকে অন্য কোন শক্তি ব্যবহার করছে কিনা? এ সম্পর্কে আমার কথা হচ্ছে এই যে, এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য জানার কোন নির্ভরযোগ্য সূত্র আমার কাছে নেই। আমি কুরআনের ولا تقف ما ليس لك به علم "এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করো না, যে সম্পর্কে তুমি জান না"—এই নির্দেশের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস করি।

প্রশ্ন ২৪ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে এমন আড্ডা কোথায় রয়েছে, যেখান থেকে কমিউনিষ্টরা যাবতীয় নির্দেশ ও প্রেরণা লাভ করে। অর্থাৎ তাদের শক্তি প্রতিভার জন্যে প্রয়োজনীয় জলবায়ূ কোত্থেকে সরবরাহ করা হয়?

উত্তর ঃ এটা পরিষ্কার কথা যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে কমিউনিজম বাইরে থেকে এসেছে। এটাও কোন গোপন কথা নয় যে, এই কমিউনিজম দুনিয়ার কয়েকটি রাষ্ট্রেও বর্তমানে কায়েম রয়েছে। কমপক্ষে দু'টো রাষ্ট্র তো এমন আছে, যারা সারা দুনিয়ায় কমিউনিজমের প্রসারের জন্যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। একথাও কারো কাছে অজানা নয় যে, যেসব অকমিউনিষ্ট দেশে গোপনে বা প্রকাশ্যে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সংগ্রাম চলে, তাদের যাবতীয় মগজ (Brain) বাইরে থেকেই আমদানী হয়। এরি ভিত্তিতে তারা পরিকল্পনা তৈরী করে—প্রয়োজন বোধে আবার তা পরিবর্তন করে। এরপর আমি আপনাকে আর কি-ই বা বলতে পারি যে, এদের কাজের উৎস কোথায়? এবং প্রেরণা কোত্থেকে আসে?

প্রশ্ন ২৫ ঃ আপনি নিশ্চয়ই জানেন, কমিউনিষ্টরা যতদিন পর্যন্ত কোন দেশের সংখ্যালঘু থাকে, ততদিন তাদের কর্মসূচী এই হয় যে, তারা বিপ্লবের

জন্যে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে, দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, আকর্ষণীয় শ্লোগান দ্বারা যুবকদের নেশাগ্রস্ত করে, বড় রকমের সংঘর্ষ বাধায়, শাসকদের দ্বারা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোকে খতম করবার ষড়যন্ত্র করে, এদের ওপর ভয়াবহ আক্রমণ চালায়, এদের প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষতিসাধন করে, মিথ্যা কথা বলে, মিথ্যা প্রচার করে বেড়ায়, মিথ্যাকে সত্যের মুখোশ পরিয়ে একটা তুমুল হাংগামা সৃষ্টি করে, অতপর ক্ষমতা দখল করে নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এই বিভিষীকাময় সংখ্যালঘুরা দুনিয়ার সর্বত্র একই নিয়ম-নীতিতে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে। এভাবেই যখন নিজেদের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তখন সাধারণ মানুষকে পাইকারীভাবে এরা হত্যা করে।

আমাদের দেশেও গত কিছুদিন যাবত এই ধরনের পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা চলেছে। পাকিস্তানে কি এমন কোন শক্তিশালী নেতৃত্ব বা দল নেই, যারা এর স্বার্থক মোকাবিলা করতে পারে?

উত্তর : এদের মুকাবিলা করার মতো কোন নেতৃত্ব বা দল পাকিস্তানে আছে কি-না, সে সম্পর্কে আমি কিছুই বলতে চাই না। তবে আমার ধারণা, পাকিস্তানের সাধারণ মুসলমানদের মনে ইসলামের এত গভীর প্রভাব রয়েছে যে, এই দেশে কমিউনিষ্টদের ষড়যন্ত্র ইনশাআল্লাহ কামিয়াব হবে না।

প্রশ্ন ২৬ : সত্যিকারভাবে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করে, এমন ইসলাম দরদী বিপ্লবী শক্তিগুলোকে কিভাবে আল্লাহদ্রোহী শক্তির মোকাবিলা করা উচিত?

উত্তর : যে শক্তিসমূহ এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে, তাদের প্রকৃতি ইসলামসম্মত। আর ইসলাম যেহেতু জোর-জবরদস্তি অথবা গুপ্ত সংগঠন পছন্দ করে না এবং প্রকাশ্যে তবলীগ ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে গণ-মানুষের সংশোধনের প্রচেষ্টাই করে থাকে—তাই এদেরকেও আল্লাহদ্রোহী শক্তির মোকাবিলা ইসলামসম্মত পন্থায়ই করতে হবে। আমাদের এই বিশ্বাস রয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত এই পন্থায়ই সাফল্য লাভ হবে। যদি আমরা আমাদের দেশের শিক্ষিত সাধারণ মানুষের মতামতকে এ পর্যায়ে আনতে পারি যে, তাদের যাবতীয় সমস্যার উত্তম সমাধান ইসলামেই নিহিত রয়েছে—অন্য কোন ব্যবস্থা তাদের এসব সমস্যার তো কোন সুষ্ঠু সমাধান দিতেই পারেনি বরং অনেক ক্ষেত্রে তাকে আরো জটিল করে দিয়েছে। তাহলে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারবে না। এমন কি জোর-জবরদস্তি করেও তাদের বিপথগামী করতে পারবে না।

প্রশ্ন ২৭ ঃ কমিউনিষ্টদের মানসিক বিভ্রান্তির মোকাবিলায় পাকিস্তানের আদর্শ সম্পর্কে সচেতন এবং ইসলামের বৃহত্তর গন্ডীর মধ্যে আছে, এমনসব রাজনৈতিক দলের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কতটুকু সম্ভাবনা রয়েছে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, এর সম্ভাবনা নিশ্চয়ই রয়েছে। আর শুধু সম্ভাবনাই নয়, এ রকম হওয়া একান্তই জরুরী।

প্রশ্ন ২৮ ঃ দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেতার বিভাগ ও সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে কমিউনিষ্টদের বহিস্কার করার চেষ্টা করা কি জরুরী নয়, যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা এদের বিভ্রান্তি ও গোমরাহীর খপ্পর থেকে রেহাই পেতে পারে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই এর প্রয়োজন রয়েছে। এই গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাসমূহে এদের অনুপ্রবেশের মারাত্মক ফল আমরা বিগত দিনগুলোতে ভোগ করেছি। এরপরও যদি এই রোগের চিকিৎসা করা না হয়, তবে আমি বলতে পারি না যে, আমাদেরকে ভবিষ্যতে আরো কত ভয়ানক পরিণামের সম্মুখীন হতে হবে।

প্রশ্ন ২৯ ঃ কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ, গৃহযুদ্ধের হুমকি ও উস্কানীমূলক বক্তৃতা-বিবৃতির কিভাবে সমাপ্তি ঘটানো যায়? এবং এদের কিভাবেই বা দমন করা যায়? এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, কমিউনিষ্টদের কাছে তো নৈতিক বিধি-বিধানের কোন বালাই নেই। সত্যবাদিতাকে তো তারা একটি নিছক ধারণার বস্তু বলেই মনে করে।

উত্তর ঃ 'হিংসাত্মক কার্যকলাপের মোকাবিলা হিংসাত্মক পন্থায়ই করতে হবে'—একথায় আমরা বিশ্বাস করি না। কেননা এতেতো সেই গৃহযুদ্ধের উস্কানীদাতারাই লাভবান হবে। ইসলামী শক্তিগুলো এ অবস্থায় আত্মরক্ষামূলক কাজই করে যাবে। আর এটা করার তাদের সম্পূর্ণ অধিকারও রয়েছে। তাদের অন্যায়ের জবাব অন্যায় পন্থায় না দিয়ে ইসলামী শক্তিকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জনমতকে ইসলামের পক্ষে নিয়ে আসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে।

প্রশ্ন ৩০ ঃ দেশের বড় বড় শিল্পপতি ও ভূস্বামীদের সামগ্রিক মনোভাব সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর ঃ এটা নেহায়েত দুঃখের কথা যে, এদের সামগ্রিক মনোভাব খুব বড় একটা ইসলামের পক্ষে নয়। যে সমস্ত কারণে আমাদের দেশে ইসলাম বিরোধী মতাদর্শের প্রসার সম্ভব হয়েছে, তন্মধ্যে ভ্রান্ত নীতিও কম দায়ী নয়।

প্রশ্ন ৩১ ঃ আপনি কি মনে করেন যে, গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের মাধ্যমে দেশে যে নেতৃত্ব সৃষ্টি হয়েছে, তারা এ দেশের মুসলমানদের আদর্শিক সীমারেখা (ঈমান-আকীদা)-রও নিরাপত্তা বিধান করতে পারবে?

উত্তর ঃ এমন নেতৃত্বই জাতির আদর্শিক সীমারেখার নিরাপত্তা বিধান করতে পারে, যারা জ্ঞান ও অনুভূতির সাথে ইসলামের সত্যতার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে এবং এও বিশ্বাস করে যে, ইসলামই পাকিস্তান সৃষ্টির একমাত্র কারণ। আর এরই কারণে এক হাজার মাইল দূরবর্তি দু'টো এলাকা নিয়ে একই দেশের অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে। পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের মধ্যে এটাই হচ্ছে আসল সীমারেখা। এবং এই জীবনদর্শন ও সীমারেখার একচ্ছত্র প্রেরণায়ই ৬৫ সালের যুদ্ধে আমরা একটা বড় রকমের বিপদ থেকে এই পাক ওয়াতানকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি।

(সাপ্তাহিক চাটান, বর্ষ ২২, সংখ্যা ৯

১৪ এপ্রিল ১৯৬৯)

ইসলাম ডাকাতের মতো
ছোরা চালায় না
চিকিৎসকের মতো অস্ত্রোপচার করে

পয়লা সমস্যা

পাকিস্তানের মুসলমানদের ঈমান মজবুত করা এবং চরিত্র গঠন করা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ঈমান ও চরিত্রের দৃঢ়তা এবং সংশোধন ব্যতীত কোন সংস্কারমূলক পরিকল্পনাও সফল হতে পারে না। বাস্তবে সে পরিকল্পনা যত সুন্দরই পরিদৃষ্ট হোক না কেন। দেশের উভয় অংশকে এক রাষ্ট্রে পরিণতকারী শক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু নয়। দু'টি অংশে ইসলাম বিরোধী আন্দোলন যতটা জোরালো হবে, ততটাই তা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকবে। শুধুমাত্র ইসলামের বন্ধনই একে অখন্ড রাখতে সক্ষম।

অর্থনৈতিক সমস্যা

ইদানীং শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সমস্যাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে চরমপন্থী একটা আন্দোলন চলছে। মানুষকে সামগ্রিকভাবে জানবার চেষ্টা না করার কারণেই এই চিন্তাধারার উদ্ভব হয়েছে। অর্থনৈতিক সমস্যা মানব জীবনের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে একটি অন্যতম সমস্যা। এর সংগে অপরাপর সমস্যাগুলোর সুগভীর সম্পর্ক রয়েছে। ইসলামের প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে, তা মানুষের ওপর সামগ্রিকভাবে দৃষ্টি দেয়। তার জীবনে সকল ক্ষেত্রের জন্য ভারসাম্যমূলক বিধান পেশ করে। যদি শুধু অর্থনৈতিক সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যান্যগুলোকে তার আওতাধীন করে দেয়া হয়, তবে সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য বিঘ্নিত হবে। এ বিষয়টি মানুষের হৃদয়ংগম করা প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও ইসলাম

পুঁজিবাদের প্রকৃত শত্রু হচ্ছে ইসলাম। অপর কোন বিধান এর আসল শত্রু নয়। একমাত্র ইসলামই সেই কর্মপন্থা নির্দেশ করে, যা দ্বারা তা মূলোৎপাটিত হয়ে যায়। সমাজতন্ত্র এ সমস্যার সমাধান এমনভাবে করে যে, বহু সংখ্যক পুঁজিপতিকে নিশ্চিহ্ন করে এক বড় পুঁজিপতি সৃষ্টি করে। তার হাতে সকল জীবনোপকরণ অর্পণ করে জনগণকে তার গোলাম বানিয়ে দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মানুষ যতটা অসহায় হয়, এ ব্যবস্থায় তাকে তার চেয়েও বেশী অসহায় করে দেয়া হয়। সমাজতন্ত্রের স্বাদ যে জাতি আস্বাদন করেছে, তারা এ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। আর যে জাতি এর স্বাদ গ্রহণ করেনি, তারাই মিষ্টি মনে করে তা খাওয়ার জন্যে ব্যাকুল।

আমাদের প্রচেষ্টা এই লক্ষ্যে নিয়োজিত যে, আমাদের এ জাতির কাছে যখন নিজস্ব এমন উৎকৃষ্টতম বিধান বিদ্যমান, যার কেবল বাস্তবায়িত হওয়া

বাকী রয়েছে, তখন সে সমাজতন্ত্রের মায়াবী ফাঁদে পা দেবে কিনা এবং একবার এ ফাঁদে পা দিলে পুনরায় তা থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় থাকবে কিনা, তা আগেভাগে ভাল করে ভেবে দেখুন। আমি বুঝতে পারি না, এ ফাঁদে তাদের পা দেয়ার প্রয়োজনটা কি, যখন ইসলাম এমন জীবন ব্যবস্থা প্রদান করেছে, যেখানে ব্যক্তির স্বাধীনতাও পুরোপুরি সংরক্ষিত এবং পুঁজিবাদের যুলুম থেকেও মুক্তিলাভ করা যায়?

একনায়কতন্ত্র ও পুঁজিবাদ

আমাদের দৃষ্টিতে পুঁজিবাদ এবং জায়গীরদারী প্রথার প্রকৃত মদদদাতা হচ্ছে একনায়কতন্ত্র। আমলাতন্ত্রও বৃহৎ শিল্পপতিদের সাথে গাটছড়া বেঁধে এটি দেশের ওপর জেঁকে বসেছে। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত না হবে, এ যুলুম থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। যত ভাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই কাগজে কলমে তুলে ধরা হোক না কেন, তা পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারে না, যতোক্ষণ তাকে বাস্তব রূপদানের জন্য ইনসাফ ভিত্তিক রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিদ্যমান না থাকে। এ কারণে আমরা সর্বপ্রথম এ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছি।

এ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর আমাদের পয়লা কাজ হবে স্বীয় ঘোষণাপত্র পেশ করা, যেখানে আমরা এ দেশে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কি সংস্কার সাধন করতে চাই, তা উল্লেখ করবো। তার মধ্যে একটি দিক হচ্ছে অর্থনৈতিক। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক সংস্কার কখনোই সফল হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নৈতিক, সামাজিক, শিক্ষাগত ও আইনগত সংস্কারও সাধিত না হয়। জীবনে এ সমস্ত ক্ষেত্রের সংস্কারের পরেই অর্থনৈতিক জীবনে সংস্কার সম্ভব।

শ্লোগানের ধাপ্পাবাজী

আমি সেই লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে প্রস্তুত নই, যারা শুধুমাত্র প্রতারণাপূর্ণ শ্লোগান ও গলাবাজীর মাধ্যমে জনগণকে দলে ভিড়ানোর চেষ্টা করে। আমাদের জাতি দীর্ঘদিন যাবত শ্লোগানের ধোঁকা খেয়ে আসছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখনো যদি তাদের চোখ না খোলে, তবে আরো কিছুদিন ধোঁকা খাওয়ার পর ইনশাআল্লাহ খুলে যাবে।

সম্পদ পুঞ্জীভূত করণ

মাত্র বিশটি পরিবারের মধ্যে দেশের প্রায় সমস্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া হারাম উপায়ে ছাড়া সম্ভব ছিল না। এ সম্পদ ঐ সকল উপকরণ থেকে

সঞ্চিত হয়েছে, ইসলামের দৃষ্টিতে যা অবৈধ। তথাকথিত গরীব দরদীদের হাতে সঞ্চিত সম্পত্তিও হারামখোরীরই ফল। ইসলামী রাষ্ট্রের পয়লা কাজই হবে ঐ সমস্ত উপায়-উপকরণকে হারাম ঘোষণা দেয়া, যা দ্বারা সম্পদের পাহাড় গড়ে উঠে। ইসলামে পুঞ্জীভূত সম্পদের বিকেন্দ্রীকরণের বিধান বিদ্যমান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে আমরা কোন পাইকারী ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যাপারে আলাদাভাবে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখবো। হযরত ওমরের (রাঃ) যুগেও যাদের কাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ পুঞ্জীভূত হতো, তাদের ব্যাপারে যথারীতি অনুসন্ধান চালানো হতো। এ যুগেও ইসলামী সরকার এ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করবে। যে সমস্ত সম্পদ এবং উপকরণ উপার্জনের বৈধপন্থা প্রমাণিত হবে না, তা অবৈধ মালিকদের নিকট থেকে ফেরত নেয়া হবে। কিন্তু যতটুকু হবার, তা আইনসংগতভাবেই হতে হবে।

"ইসলাম ডাকাতের মত ছোরা চালায় না, চিকিৎসকের মত অস্ত্রোপচার করে। এখন যারা ডাক্তারের অস্ত্রোপচারকে সহ্য করার জন্য প্রস্তুত নয়, তাদের ডাকাতের ছোরার মুখোমুখি হওয়ার জন্য তৈরী থাকতে হবে।"

পরিমাণ নয়, পদ্ধতিগত সীমা

ইসলাম পরিমাণের ভিত্তিতে নয়, উপায়-উপকরণের ভিত্তিতে সম্পদের সীমা নির্ধারণ করে থাকে। হালাল উপায়ে যতখুশী উপার্জন করা যেতে পারে। কিন্তু অবৈধ পন্থায় এক পয়সাও উপার্জনের অনুমতি ইসলাম দেয়নি।

বিরাজমান জায়গীরদারী

ইমপীরিয়্যাল গেজেট অফ ইন্ডিয়া'তে সকল জায়গীরদার এবং তাদের অবদানের ফিরিস্তি সংরক্ষিত রয়েছে। ইসলামের নীতি হলো, কোন ব্যক্তিকে ভূমি উপঢৌকন প্রদানের অধিকার শুধুমাত্র ন্যায়পরায়ণ সরকারেরই রয়েছে। আর তাও সমাজের বৈধ অবদানের প্রতিদানস্বরূপ। ইসলামী সরকার একজনের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে অপরকে উপঢৌকন দেয়ার অধিকার রাখে না। সে শুধু রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি উপহারস্বরূপ প্রদান করতে পারে। এ ছাড়া সীমাতিরিক্ত উপঢৌকন প্রদানের অধিকারও ইসলামী সরকারের নেই। এই মূলনীতিসমূহের ভিত্তিতে বর্তমান জায়গীরদারীর সমস্যা সমাধান করা যায়। ইসলামী সরকার অবিচার রোধ করতে অস্থায়ী ভিত্তিতে ভূমি মালিকানার কোন সীমা নির্ধারণ করতে পারে।

জাতীয়করণ প্রসংগে

কোন শিল্প-কারখানা জাতীয়করণ করা হারামও নয়, ফরযও নয়। যদি নির্দিষ্ট কোন শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রতীয়মান হয় যে, তা ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালনার ফলে লোকসান হচ্ছে, তবে তা জাতীয়করণ করা যায়। যেখানে প্রয়োজন সেখানেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিল্পের ধরন ঠিক করা অর্থাৎ কোনটি জাতীয়কণ করা হবে এবং কোন্টি হবে না, এটা কোন দলের কাজ নয় বরং তা জনগণের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত পার্লামেন্টের কাজ। এখানে জাতীয়করণের সংগে সংগে আমলাতন্ত্রের সমস্যাও দেখা দেয় এবং সেটা লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত জরুরী। বর্তমানে আমলাতন্ত্রের যে চরিত্র ও ভূমিকা, তা সুবিদিত। সমগ্র জাতি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠেছে। আর যদি শিল্প অংগনের নীতি নির্ধারণের দায়িত্বভারও আমলাদের হাতে চলে যায়, তবে তার পরিণতি কি হতে পারে ভাবুন। বর্তমানে ওয়াপ্দা জাতীয় মালিকানাধীনে রয়েছে। এর কি দশা হয়েছে দেখুন।

সমাজতন্ত্র এবং সম্পদের কেন্দ্রায়ণ

একথা বলা সঠিক নয় যে, সমাজতন্ত্র এবং ইসলাম উভয় ব্যবস্থায় সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় না। সমাজতন্ত্রে তো এটা হয়ই। বরং একমাত্র ইসলামেই সম্পদ পুঞ্জীভূত হয় না। সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের হাতে সবকিছু অর্পণ করে। এমন কোন ক্ষেত্র, যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প-কারখানা এবং রাষ্ট্র একীভূত হয়, সেখানে যুলুমের কোন সীমা থাকে না।

চীন-রাশিয়ার প্রতি পরামর্শ

আমাদের দেশের অবস্থা হলো এই যে, বিভিন্ন প্রতিনিধি দল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সফরে যায়। এগুলো 'নিয়ন্ত্রিত সফর' হয়ে থাকে। এসব দেশের কর্তা ব্যক্তিরা যা দেখাতে চায়, তাই দেখায়। যা কিছু শুনাতে চায়, তাই শুনায়। যা কিছু বলতে চায়, তাই বলে। আর আমাদের 'সরলমতি' লোকেরা এর উপর বিশ্বাস করে স্বদেশে এসে চিৎকার শুরু করে যে, চীন ও রাশিয়ায় নাকি মধু আর দুধের নহর বয়ে যাচ্ছে। মাওলানা সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলোকে উপদেশ দিয়েছেন যে, তারা নিজেদের এবং বহির্বিশ্বের মধ্যকার লৌহ যবনিকা যেন সরিয়ে ফেলে। কেউ ঐ দেশগুলোতে ভ্রমণ

করতে চাইলে কোন বাধা বন্ধন ছাড়াই যেন তার পক্ষে সফর করা সম্ভবপর হয়। যা কিছু সে দেখতে চায়, তা যেন দেখতে পারে। যেসব বিষয়ে জানতে চায়, তা যেন জানতে সক্ষম হয়। যা কিছু জিজ্ঞেস করা প্রয়োজন, তা–ই যেন করতে পারে। এমনিভাবে সমাজতন্ত্রের বাইরের দেশের লোকেরা যখন এদের কথা ও কাজের সমন্বয় ঘটতে দেখবে, স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাবে, মজদুর ও শ্রমজীবী মানুষকে সুখে–শান্তিতে পাবে, তখন বাস্তবে সমাজতন্ত্রের সমর্থক হয়ে তার প্রচারক হতে পারে। সমাজতন্ত্রীরা বিদেশে বলে এক রকম, আর নিজের দেশে কাজ করে অন্যরকম। বাইরে তারা বক্তব্য ও লেখার স্বাধীনতার কথা প্রচার করে। অথচ নিজের দেশের জনগণের মুখ বন্ধ করে দেয়। তাদের বিরুদ্ধে শ্লোগান উচ্চারিত হতে দেয় না। এরা অন্য দেশে শ্রমিকদের অধিকারের জন্যে ঢাকঢোল পেটাতে থাকে, তাদের জন্যে হরতাল আহ্বানের অধিকার আদায় করতে চায়। কিন্তু পৃথিবীর কোন সমাজতান্ত্রিক দেশে শ্রমিকদের হরতাল ডাকার অধিকার নেই। এটা কি একটা সুস্পষ্ট বৈপরীত্য ও ধোঁকা নয়?

সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজম

কমিউনিজম হচ্ছে একটা চূড়ান্ত পর্যায়, যা সোস্যালিজমের মাধ্যমে অর্জন করার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু এটা কোথাও অর্জিত হয়নি। শ্রেণীহীন সমাজও (Classless Society) কোথাও অস্তিত্ব লাভ করেনি। এ স্তর পর্যন্ত কোন একটি সমাজতান্ত্রিক দেশও পৌছতে পারেনি। এভাবে সমাজতন্ত্রের নিজের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনেও সে ব্যর্থ হয়েছে।

সমাজতন্ত্র এবং সামাজিক সুবিচার

আমাদের দেশের অধিকাংশ ব্যক্তি স্বীয় দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আধিপত্যবাদী সভ্যতা ও চিন্তাধারা কর্তৃক মারাত্মকভাবে প্রভাবিত। এ কারণে পৃথিবীর বিজয়ী শিবিরগুলো থেকে যে ধ্বনি ওঠে, সংগে সংগে এখান থেকেও তার প্রতিধ্বনি হতে থাকে। যে যুগে ফরাসী বিপ্লব থেকে উদ্ভূত চিন্তাধারার প্রচলন ছিল, মুসলিম দেশগুলোতে প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি কারণে অকারণে সেই চিন্তাধারার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করতো এবং সেই ছাঁচে নিজেকে ঢেলে সাজানোকে নিজ কর্তব্য মনে করতো। কিন্তু যখন সে যুগ পেরিয়ে গেলো, তখন আমাদের আধুনিক শিক্ষিত লোকদের 'কিবলা'ও পাল্টে যেতে লাগলো। তারপর নতুন যুগ আগমনের সাথে সাথেই সামাজিক সুবিচার এবং

সমাজতন্ত্রের আওয়াজ উচ্চারণকারী আমাদের মাঝে সৃষ্টি হতে লাগলো। ঘটনা এ পর্যন্ত গড়ালেও তা গ্রহণযোগ্য হতো কিন্তু বিপদ হলো এই যে–

"আমাদের মাঝে এমন একটি গ্রুপ মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে, যারা নিজেদের কিবলা পরিবর্তনের সাথে চায় যে ইসলামও তার কিবলা পাল্টে ফেলুক। ইসলাম ছাড়া বেচারাদের যেন প্রাণই বাঁচে না। তাই ওটা তাদের সাথে লেগে থাকাটা খুবই জরুরী। তবে তাদের খায়েশ হলো, যার অনুকরণ অনুসরণ করে তারা উন্নতি সাধন করতে চায়, ইসলামও 'তারই' আনুগত্য করে ধন্য হোক এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের ধর্ম হবার অভিযোগ থেকে মুক্ত হোক।"

এরই ভিত্তিতে সর্বপ্রথম চেষ্টা করা হয়েছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা, উদার মনোবৃত্তি, পুঁজিবাদ এবং ধর্মহীন গণতন্ত্রের পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণাকে প্রকৃত ইসলাম সম্মত সাব্যস্ত করার। আর এ কারণেই বর্তমানে বলা হচ্ছে যে, ইসলামেও সমাজতান্ত্রিক মতবাদের অনুরূপ সামাজিক সুবিচার বিদ্যমান রয়েছে। যারা "ইসলামেও সামাজিক সুবিচার বিদ্যমান রয়েছে" একথা বলে, তারা একটি ডাহা মিথ্যা কথা বলে। সঠিক কথা হলো, "একমাত্র ইসলামেই সামাজিক সুবিচার রয়েছে।"

ইসলাম হচ্ছে সেই সত্য জীবন ব্যবস্থা, যা বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক মানুষের হেদায়াতের জন্যে নাযিল করেছেন। মানুষের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং কোন্‌টি তার জন্যে ন্যায়, কোন্‌টি অন্যায় তা নির্ধারণ করা মানুষের স্রষ্টা এবং বিশ্ব প্রতিপালকেরই কাজ। ন্যায়-অন্যায়ের মানদন্ড স্থির করার বৈধতা অন্য কারো নেই। আবার কারো মধ্যে প্রকৃত সুবিচার কায়েম করার যোগ্যতাও পাওয়া যাবে না।

সুতরাং এটাকে কোন বিবেকবান ব্যক্তি সামষ্টিক সুবিচার বলতে পারে না যে, একজন ব্যক্তি অথবা কতিপয় ব্যক্তি বসে নিজেদের মনগড়া একটা সামষ্টিক সিদ্ধান্ত রচনা করবে আর সরকারের সীমাহীন অধিকার কাজে লাগিয়ে এ দর্শনকে সারাদেশের কোটি কোটি জনতার উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেবে। জনগণের সম্পদ দখল করে, ভূমির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে গোটা দেশকে এমন এক জেলখানায় রূপান্তরিত করা হবে, যেখানে সমালোচনা, আপত্তি-অভিযোগ, মোকদ্দমা এবং ন্যায়বিচারের সমস্ত দরোজা জনগণের জন্যে বন্ধ থাকবে। দেশে কোন দল-সংগঠন থাকবে না, এমন কোন প্লাটফরমও থাকবে না, যেখানে জনগণ মুখ খুলতে পারে। কোন প্রকাশনা থাকবে না, যেখানে জনগণ চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে পারে এবং এমন কোন আদালতও থাকবে না, যার দরোজায় ইনসাফের জন্যে করাঘাত করা

যাবে। গোয়েন্দা ব্যবস্থা এতো গভীরভাবে প্রসারিত থাকবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে গোয়েন্দা ভেবে ভয় পায়। এমনকি নিজ ঘরেও একজন মুখ খুলতে চতুর্দিক দেখে নেয়, কোন কান তার কথা শুনছে কিনা এবং কোন মুখ সেকথা গুলো সরকারের কাছে পৌঁছানোর জন্যে ওঁত পেতে বসে আছে কিনা। অপরদিকে গণতন্ত্রের নামে ধোঁকা দেয়ার জন্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু এ দর্শন রচয়িতাদের সাথে ভিন্নমত পোষণকারী কোন ব্যক্তি সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো হয়। আর এমন কোন ব্যক্তিও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না যে নিজেই নিজস্ব কোন মতের ধারক এবং স্বীয় মতাদর্শ বিক্রয়কারীও নয়।

সমাজতন্ত্র যেখানেই গেছে, সেখানেই এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এ পরিবেশই গড়ে তুলেছে। একে কি সামাজিক সুবিচার বলে? এর নাম কি সামষ্টিক ন্যায়পরায়ণতা?

ইসলাম ও গণতন্ত্র

ইসলাম ও গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী নয়। গণতন্ত্র সেই সরকার পদ্ধতির নাম, যা জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতে গঠিত হয়, আবার জনগণের খেয়াল খুশী অনুযায়ী এর পরিবর্তন ঘটে এবং জনগণের মতামতের ভিত্তিতে তা পরিচালিত হয়। ইসলামের সরকার পদ্ধতিও অনুরূপ। পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের সাথে আমাদের গণতন্ত্রের কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। কারণ, পাশ্চাত্য গণতন্ত্র হচ্ছে লাগামহীন। এখানে জনগণের রায় হালালকে হারাম করতে পারে। যেরকম বৃটেনে হচ্ছে অথবা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামী গণতন্ত্র কুরআন ও সুন্নাহর বিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ। সমগ্র জাতি চাইলেও এ সীমারেখা পেরিয়ে কোন ফয়সালা গ্রহণ করতে পারবে না। এর বিপরীত সমাজতন্ত্র এক পরিপূর্ণ জীবন দর্শনের নাম। এর নিজস্ব আকীদা, দর্শন এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ রয়েছে। কোনভাবেই একে ইসলামের কোন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলানো যায় না, এক করা যায় না।

বৈদেশিক নীতি

পাকিস্তান একটি আদর্শবাদী রাষ্ট্র। এর দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতি অনিবার্যভাবে এর অবলম্বিত জীবন দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই এবং এর দাবীসমূহ পূরণে সহায়ক হওয়া আবশ্যক। আমাদের জীবন দর্শনের স্বাভাবিক দাবী হচ্ছে এটাই যে, আমরা পৃথিবীতে সত্য-ন্যায়ের পতাকাবাহী। যুলুম এবং অবৈধ শক্তি প্রয়োগের বিরোধী। আমরা ন্যায়পরায়ণতার সাথে নিজেরা যেমন কাজ করি, তেমনি অপরকেও তাই করতে উদ্বুদ্ধ করি।

নিজেরা ওয়াদা বা অংগীকার ও প্রতিশ্রুতি পালনে বদ্ধপরিকর এবং অন্যদেরকেও অংগীকার পালনের উপদেশ দিই। 'আমরা সাম্রাজ্যবাদী ও আধিপত্যবাদী ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক রীতিনীতির খেলাফ এবং সেই মৌলিক কারণগুলোর মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ মনে করি, যে কারণে পৃথিবীতে বিপর্যয় নেমে আসে। এ সাম্রাজ্য প্রাচ্যেরই হোক আর পাশ্চাত্যেরই হোক, মূলত তা ঘৃণার যোগ্য। আমরা এর মূল্যোৎপাটনে নিজেদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবো এবং আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা সর্বদা সেই মজলুম জাতির জন্যে নিবেদিত হবে, যারা এ বিপদের শিকারে পরিণত হয়েছে।

আমাদের চিন্তাধারায় আমরা কোন ব্লকের সাথে জড়িত হতে অথবা কোন ব্লকের সাথে নিজেদের সম্পর্ক খারাপ করতে চাই না। কিন্তু বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অর্থ কোন দেশের কোলে গিয়ে বসা নয়। তাদের সভ্যতা এবং দর্শন আমদানীর অনুমতি কোনভাবেই থাকা উচিত নয়। আমরা স্বাধীন, মুক্ত এবং নিজস্ব দৃষ্টিভংগি পোষণকারী জাতির মর্যাদা নিয়ে অপরাপর জাতির সাথে নিজেদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমরা অন্যের নিকট থেকে সাহায্য গ্রহণ করলে, তারাও আমাদের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হবে।

"আমাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত যে, আমরা শুধুমাত্র হাতপাতা জাতি নই।"

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা

গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নিকটবর্তী মনযিল মনে করতে হবে। আমাদের জাতি মুসলমান। তাই সে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই কামনা করবে। ভিন্ন মতবাদের ধারক ও বাহকরা যত চেষ্টাই করুক এবং যতই মাথা ঠুকুক, এখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবেই ইনশাআল্লাহ।

ছাত্র সমাজের হতাশা

যুবকদের মাঝে হতাশা সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। এর পরিবর্তন সাধন ছাড়া গত্যন্তর নেই। বর্তমান সংকট সে কথাই মনে করিয়ে দেয়। গোটা শিক্ষাব্যবস্থাকে এ মুহূর্তে ইসলামী মৌলনীতির আলোকে আগাগোড়া নতুনভাবে ঢেলে সাজানো অপরিহার্য। আমাদের জন্যে এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজন, যা একটি সদ্য স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্যে যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী, নেতা এবং নাগরিক গড়ে তুলবে এবং একটি উন্নয়নশীল দেশের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা পূরণে সক্ষম হবে।